# বিজ্ঞান নামের ব্যতিক্রমী মহাকাব্য

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিজ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে যতই দেখেছি ততই একে একটি ব্যতিক্রমী মহাকাব্যের মত মনে হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্যের মিলটি খুঁজে পাই উভয়টিতেই কল্পনার ও সৃষ্টিশীলতার গুরুত্ব থাকার মধ্যে– যদিও উদ্দেশ্য আলাদা। বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের উদাহরণে আমরা দেখবো বিজ্ঞান কেন মহাকাব্যিক। মহাকাব্যের পরিধি বড়, তার সবকিছুই বড়– বড় মানুষ, বড় নীতি, বড় সাধনা, বড় যুদ্ধ, বড় হতাশা, বড় ট্র্যাজেডি। নানা খণ্ডে এলেও বিজ্ঞানও আসলে একটানা একটিই কাহিনী, যার শেষ নেই। এক প্রান্তে ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণিকা ও অন্য প্রান্তে সর্ব-সমষ্টি প্রসারমান বৃহৎ মহাবিশ্বকে নিয়ে পরম বাস্তবতার এই কাহিনী, যার সবকিছুর সঙ্গে সবকিছু সাযুজ্যপূর্ণ হতে হয়। বিজ্ঞানীর ভাবনায় তৈরি তত্ত্ব আর বাস্তবের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা– এই দুইয়ের যুগলবন্দীতে ক্রমান্বয়ে চলে বিজ্ঞানের সঙ্গীত, যা প্রকৃতির চরম জটিলতার মধ্য থেকে সরল ও সুন্দর নিয়ম নিংড়ে আনতে পারে। বৈজ্ঞানিক কল্পনায় সৃষ্ট কণিকা, তরঙ্গ, চার্জ ইত্যাদির মত একই অদৃশ্য জিনিস যখন এক চাবিতে শত দরজা খোলার মত প্রকৃতির সব দিকের দৃশ্যমান বাস্তবের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তখন সেই কল্পিত চাবিকেও বাস্তব বই অন্যকিছু ভাবার সুযোগ রাখেনা। সেই সঙ্গে এই মহাকাব্য জীবনকে সচ্ছন্দ করার জন্য নিত্য নতুন প্রযুক্তিরও সৃষ্টি করছে। এই মহাকাব্যের লেখক-পাঠকদের নিয়ে বিশ্ব-বিজ্ঞান-সমাজই পারে সেই প্রযুক্তিকে কল্যাণকর রাখতে।

# বিজ্ঞান নামের
# ব্যতিক্রমী মহাকাব্য

# বিজ্ঞান নামের
# ব্যতিক্রমী মহাকাব্য

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

অনন্যা

**প্রথম প্রকাশ**
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

**প্রকাশক**
মনিরুল হক
**অনন্যা**
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© লেখক

**প্রচ্ছদ**
ধ্রুব এষ

**অক্ষর বিন্যাস**
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

**মুদ্রণ**
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ৪০০.০০ টাকা

ISBN 978 984 97313 7 5

**Biggan Namer Baticromi Mahakabbo** by Muhammad Ibrahim
Published by Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabayar, Dhaka-1100
First Published : February 2023, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 400.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udzog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

# উ|ৎ|স|র্গ

আমার সব বইয়ের সকল পাঠককে
যাঁরা লেখার শ্রমকে সার্থক করেছেন,
এর আনন্দকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

# ভূমিকা

বিজ্ঞানকে যতই সামগ্রিক ভাবে দেখেছি ততই একে একটি মহাকাব্যের মত মনে হয়েছে, তার ব্যাপ্তি ও মহাকাব্যিক অন্যান্য গুণের জন্য। অতীতের এবং একেবারেই সাম্প্রতিক নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞানের এই মহাকাব্যিক রূপটিকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে। মহাকাব্য তো দূরের কথা, কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের কী মিল, এ দুই তো দুই বিপরীত মেরুর জিনিস হবার কথা। এ প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা থেকেই ও আলোচনার শুরু। আমরা প্রায়ই বলি যে বিজ্ঞান প্রকৃতির অনুসন্ধান করে; যে কথা ভুলে যাই তা হলো এটি প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীর নিজেরও কল্পনার আর সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ। কাব্যের সঙ্গে মিল্‌টি সেখানেই। বিজ্ঞানী শুধু বিজ্ঞানকে কাজে লাগান্‌না, একে উপভোগ করে জ্ঞানের আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করেন, অনেকটা কবিতা উপভোগ করার মত। অতি পরিচিত বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটি বোঝানো যায়। যেমন বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কথা শুনলে তাতে রীতিমত রূপকথার আমেজ পাওয়া যায়। দেখেছি পশম-ঘষা কাচের রডের নড়াচড়া, আর তা ব্যাখ্যা করতে বলেছি চার্জ, ক্ষেত্র, বলরেখা ইত্যাদি অদ্ভুত অদৃশ্য জিনিসের কথা– যা মস্তিষ্কের কল্পনা, ব্যাখ্যায় সাফল্যই তাকে সত্যে পরিণত করেছে। এ যেন সাধারণ অভিজ্ঞতা অনুভূতিকে 'কাব্য' করে বলার মত 'বিজ্ঞান' করে বলা; শুধু এক্ষেত্রে আবেগ নয় সত্যকে লক্ষ্য করে বলা।

মহাকাব্যিক রূপটি বিজ্ঞানের মধ্যে দেখাবার জন্য উদাহরণগুলোতে আরো কিছু জিনিস লক্ষ্য করা হয়েছে। যে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এতকিছু বিজ্ঞান করছে সে প্রকৃতি কিন্তু অত্যন্ত জটিল– নিজের জটিলতাকে বিজ্ঞানীর কাছে তুলে ধরতে মোটেই ব্যগ্র নয়। তার মধ্যে যে আদৌ কোন নিয়ম আছে এমন গ্যারান্টিও সে দেয়না। ওটি বিজ্ঞানীর গরজ, তিনি চেষ্টা করেন তার থেকে একটি নিয়ম নিংড়ে বের করার– আর প্রকৃতির জটিলতা সত্ত্বেও সেই নিয়মটি যেন যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর হয়। সেজন্য তিনি নিজের মাথা থেকে বের করা সুন্দর গাণিতিক নিয়মের মধ্যে প্রকৃতিকে ধরতে চান; আর অদ্ভুতভাবে প্রকৃতি তাতে ধরা দেয়ও। আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও এই ধরা দেয়াটিকে রহস্যময়

মনে করেছেন, তাঁর কথা হলো– কেন যে বুঝি তাই বুঝিনা। ভাবনা থেকে যে তত্ত্ব দেয়া হলো তার থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা ফলাফলগুলো সকল খুঁটিনাটিতে বাস্তবের সঙ্গে এমন সূক্ষ্মভাবে মিলে যাওয়াটাই একটি রহস্য। সেই অদৃশ্য, কল্পিত চার্জ, ক্ষেত্র, ইলেকট্রন কণিকা ইত্যাদি দিয়ে বিদ্যুৎ-চুম্বক জগতের অনেক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করলো, এবং তা সত্যি সত্যি খুঁজে পাওয়া গেলো এবং সেগুলোর অনেক কিছুই একেবারে চেয়ার-টেবিলের মত দেখার, ছোঁয়ার জিনিস হিসেবে। আর শুধু বিদ্যুৎ-চুম্বক জগতের নয়– সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে হয়তো ভূতত্ত্বে, বা মহাজাগতিক ক্ষেত্রে, বা অণুজীববিদ্যায় ওই একই চার্জ, ক্ষেত্র, ইলেকট্রন ইত্যাদি একই কাজ করে সেই জগতেরও সত্যি ভবিষ্যদ্বাণী করছে; জিনিসগুলো বাস্তব সত্য না হলে তা কি করতে পারতো? এগুলো যেন মহাভারতের সেই গান্ডীব ধনুক। প্রকৃতি যতই জটিল হোক, লক্ষ্যভেদ সে করবেই, তবে ধীরে ধীরে পরতে পরতে, এক একটি আসন্ন সত্যের দিকে গিয়ে। আমাদের উদাহরণগুলো দেখিয়েছে এ যাত্রা মহাকাব্যিক, সবদিক থেকেই।

এতে দেখলাম বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্বগুলো যেন এক চাবি দিয়ে শত দরজা খোলার মত সক্ষমতা রাখে। এর কারণ বিজ্ঞান খণ্ডে খণ্ডে নানা ক্ষেত্রের সমাধানের জন্য এলেও আসলে এর কাহিনী একটিই– প্রকৃতি উন্মোচনের একটানা এক মহাকাব্য। প্রত্যেক খণ্ড যত ভিন্ন বিষয়েরই হোক না কেন তাদেরকে একই সুরে গাইতে হয়। এই মহাকাব্যের কোন গল্প অন্যটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারেনা, বরং প্রত্যেকটির ভেতরে যতই গভীরে ঢোকা যায় দেখা যায় যে অন্য খণ্ডের রাজ্যগুলোও তাতে সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে। সাহিত্যের বড় বড় মহাকাব্যের মত এখানেও রয়েছে গল্পের ভেতরে আরো গল্প– কিন্তু তাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূল গল্পের গতি ব্যাহত হয়না। সব মহাকাব্যেই সেই মূল গল্প বৃহতের গল্প, সবকিছুই তার বড় মাপের। মহাকাব্য তাই বৃহতের কাব্য– বড় রাজ্য, বড় মানুষ, বড় যুদ্ধ, বড় ভালবাসা, বড় হতাশা, বড় ট্র্যাজেডি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই বলা যায় এর মূল কাব্যটি 'পরম'কে নিয়ে। এর রচয়িতা মানুষ, কিন্তু এটি মানুষের নিজের দৈনন্দিন মাপের মধ্যে থাকেনা। একদিকে চলে যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরম কণিকার রাজ্যে, যা দিয়ে সবকিছু গড়া; আবার অন্যদিকে চলে যায় বৃহত্তমের রাজ্যে– মহাবিশ্বে, যার ভেতরেই সবকিছু। এই দুইটি পরম সীমান্তও আবার ক্রমে যার যার অভিমুখে প্রসারিত হয়ে চলেছে, উভয়ে মানুষের মাপ থেকে লক্ষ যোজন

দূরে। মানুষ তাকে বিজ্ঞান-মহাকাব্য ছাড়া আর কোথায়ই বা ধারণ করতে পারতো যদিও তার এই মহাকাব্যটি বড়ই ব্যতিক্রমী। ওই দুই চরম সীমান্তের ভেতরে যেখানেই কোন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানেই বিজ্ঞানী গড়ে তুলেছেন আর একটি নতুন স্থানীয় সীমান্ত, তারা প্রত্যেকটি নিজেই চমকপ্রদ এক রাজ্য, নিজের মত করে সে সীমানাও বাড়ছে।

বিজ্ঞানের স্বাদ নিতে গিয়ে যে কেউ লক্ষ্য করবেন তাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যুগলবন্দীর মত একটি স্বাদ আগাগোড়া পাওয়া যায়। এখানে সঙ্গত্ ঘটছে তত্ত্ব ও পরীক্ষার মধ্যে। এই দুইয়ের মধ্যে যেন একটানা এক আলাপ চল্ছে- ক্রমান্বয়ে একে অপরের জবাব দিয়ে চলেছে। পরীক্ষাকে ছেড়ে দিয়ে তত্ত্বের ঘুড়ি উড়তে থাকতে পারেনা, আবার তত্ত্ব তার কাঠামোটি ঠিক মত তৈরি করে না দিলে পরীক্ষার আয়োজনই হতে পারেনা। বিজ্ঞান মহাকাব্যকে ব্যতিক্রমী করেছে তাতে এই যুগলবন্দীর অপরিহার্যতাটি। নানা উদাহরণে আমরা দেখবো তত্ত্বে-পরীক্ষায় এই আলাপটি আগে কেমন করে চলেছে, আর আজই বা তার কী রূপ। তত্ত্ব জন্ম দেয় পরীক্ষার, সে পরীক্ষা আবার জন্ম দিতে পারে নতুন দিকে নতুন তত্ত্বের; এমনি ভাবে চলতে থাকে নিরন্তর। এমনি যুগলবন্দীর বড় বড় ফলশ্রুতি এসেছে বিশেষ বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে– বিশ্বকে জানা, নিজেকে জানা, বিশ্বের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে জানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দামী মুহূর্ত ছিল সেইগুলো।

এক একবার যখন সেই মুহূর্ত আসে তখন পরম প্রশ্নগুলোর অনেকটাই খোলাসা হয়ে আসে কিছু বিশ্বনিয়ম রূপে। অসংখ্য রকম সমস্যায় ওই নিয়ম যখন এক নাগাড়ে সাফল্য লাভ করে, তখনই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তা– অনায়াসে তাতে আস্থা রাখা যায়। এমনি একটানা দারুণ সাফল্য তিন শ' বছর ধরে পেয়ে এসেছিলো নিউটনের গড়া বিশ্বতত্ত্ব– এটি হয়ে পড়েছিলো বিজ্ঞানীর একান্ত আস্থার জিনিস যা ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁত ভাবে বিশ্বের সবকিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। দূর অতীতের ও কাছের অতীতের দুটি বেশ রোমাঞ্চকর উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে। ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার হওয়ার পর এর গতিবিধিতে কিছু অনিয়ম দেখা যাচ্ছিল। নিউটনের তত্ত্ব থেকে হিসেব করে এর যে কারণ দেখানো হলো তা একটি অজানা গ্রহের উপস্থিতি, যার আকর্ষণে ওই অনিয়ম। এই অজানা গ্রহ ঠিক যত বড় হলে আর যেখানে থাকলে ঠিক ওরকম অনিয়মটা হতে পারে তার এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে খোঁজ করে গ্রহটি ঠিক

সেখানেই পাওয়া গেলো– সেটি নেপচুন গ্রহ। অভাবনীয় এক সাফল্য! আর পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭১ সালের এপলো-১৩ মহাশূন্যযানের দুর্ঘটনায় নাটকীয় ভাবে তিন জনের জীবন রক্ষাটিও ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে নিউটনের নিয়মের চমকপ্রদ ব্যবহার। চাঁদে যাওয়ার মাঝপথে এপলো-১৩ এর মূল যানটি প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে তিনজন মহাশূন্যচারী খুবই সংকটময় অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু নিউটনের নিয়মের প্রয়োগ করে তার হিসেব থেকে নিখুঁত ব্যবস্থা নিতে পারাতে তাঁরা জীবন্ত ফিরে আসতে পেরেছিলেন– ওই নিয়মের ফলাফলে সামান্য একটু ভুল হলেই যা হতে পারতোনা। কয়েকদিন ধরে প্রতি মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায় সারা দুনিয়ার মানুষ রুদ্ধশ্বাসে তত্ত্বটির এই জয় দেখেছে। এসবের বিস্তারিত দেখলে বোঝা যায় বিজ্ঞান কেন মহাকাব্যিক।

তাই বলে এ মহাকাব্যের সর্বত্র শুধু বড়, মৌলিক, পরমের সন্ধানে ভাবনারাজ্য নয়। বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে সাধারণ মানুষের জীবনে আরাম-সাচ্ছন্দ্য আনার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজটিকেও সে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে– ছোট বড় নানা প্রযুক্তি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দুটি কথা এতটা মিশে গেছে যে আটপৌরে জীবনের কাছাকাছি থাকা প্রযুক্তিকেই মানুষ বিজ্ঞান বলে ভুল করছে। এখন বিজ্ঞানের প্রায় যে কোন আবিষ্কার থেকে আশা করা হয় যে এটি কোন না কোন রকম প্রযুক্তির জন্ম দিয়ে মানুষের জীবনে কাজে আসবে। অন্যদিকে মনে করা হয় যে বিজ্ঞানের মূলধারায় যেই বৃহৎ বা পরমের সাধনা তার থেকে এমন কোন প্রযুক্তি আশা করা ঠিক নয়– বিশ্বকে চেনার, তাকে অনুভবের আকাঙ্খাই ওখানে বিজ্ঞানীর প্রেরণা। তবে এরকম মনে করাটিও এখন ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মত বিমূর্ত এবং অদ্ভুত ভাবে দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে অনেক দূরের একটি তত্ত্ব থেকে এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মত প্রযুক্তি আসছে যা শিগ্‌গির একদিন হয়তো সবার হাতে হাতেও চলে যাবে নিত্য ব্যবহারে। তাতে কি তার মহাকাব্যিক চরিত্রের কোন হানি হয়েছে, মোটেই না। তবে দুঃখের বিষয় হলো নেতিবাচক দিক থেকেও এ কথা সত্য। বিজ্ঞানের থেকে আসা কিছু প্রযুক্তি ধ্বংসের পথেও চলেছে; পৃথিবীকে, প্রাণকে, মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে– নিউক্লিয়ার হুমকি, গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত মহাকাব্য তার লেখক-পাঠকের জন্যই। বিজ্ঞান নামের ব্যতিক্রমী মহাকাব্যে লেখনী চল্‌ছেই, এতে এমন একটি শেষ পৃষ্ঠা আসবেনা যেখানে 'সমাপ্ত' কথাটি লিখে দেয়া যাবে। আজকের পাঠকরাই আগামী দিনের লেখক হবেন, এমনকি সব সাধারণ পাঠকদেরও কিছু না কিছু অবদান তাতে থাকবে, মহাকাব্যটি এর নানা সংস্করণে যাঁরা পড়ে থাকেন। সাহিত্যে মহাকাব্যকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা সবাই এর ব্যাখ্যাকার পণ্ডিত নন্, অনেকেই রাতে আসর জমিয়ে সুর করে তার সহজ সংস্করণ পড়েন বা শোনেন। এমনিভাবে সর্বজনীন বিজ্ঞান সমাজটিও আজ অনেক বড়, প্রায় পুরো মানব সমাজকেই এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। তাঁদের সবাই কেউ পেশাদার, কেউ স্বেচ্ছাসেবী, কেউ ছাত্র, কেউ আন্দোলনকারী হয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বসমঝোতাকে আনতে সাহায্য করবেন। বিজ্ঞান-মহাকাব্যের বৃহৎ-নীতি অনুসরণে তাঁরা বাঁচাবার প্রযুক্তিকে গড়বেন, ধ্বংসের প্রযুক্তিকে নয়।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জানুয়ারী ২০২৩

## সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| এ কোন্ রূপকথ | ১৩ |
| কেন যে বুঝি সেটিই বুঝিনা | ৪০ |
| রান্নার রেসিপি এবং নিটোল গল্প | ৫৮ |
| একই চাবিতে শত দরজা খোলা | ৭৭ |
| একটানা একটাই মহাকাব্য | ১০৭ |
| তত্ত্বের ও পরীক্ষার ক্রমাগত আলাপ | ১৩৯ |
| মহাকাব্য প্রযুক্তিকেও জড়িয়ে নিয়েছে | ১৬৩ |
| মহাকাব্যটির লেখক-পাঠক | ১৮৬ |

# এ কোন্ রূপকথা

বিজ্ঞান কোন্ অর্থে মহাকাব্যিক?

বিজ্ঞানকে মহাকাব্য কেন বলছি, বা কোন কাব্যের সঙ্গেই বা এর কী মিল? বড় মিলটি হলো বিজ্ঞান মানুষেরই কল্পনাশক্তির সৃষ্ট, সৃজনশীলতা তার পরতে পরতে, যা কাব্যেরও প্রধান বৈশিষ্ট। কাব্যকে যেমন সুন্দর হতে হয়, নান্দনিক হতে হয়, বিজ্ঞানকেও হতে হয়। কেউ মনে করতে পারেন, বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ কাজের বর্ণনা; সুন্দর যদি হয়ে থাকে তাহলে তার মানে প্রকৃতির সেই কাজগুলোই সুন্দর, তাতে বিজ্ঞানের বাহাদুরিটি কোথায়? আমরা দেখবো বিজ্ঞান প্রকৃতির প্রতিফলন মাত্র নয়, এর অনেকটা এসেছে বিজ্ঞানীর সৃজনশীলতায়– প্রকৃতির ভেতর থেকে বিজ্ঞানী যেই কিছু সত্য তাঁর মত করে নিংড়ে আনতে পেরেছেন, তা। ওই যে 'নিজের মত করে' করা ওখানেই তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। আর মানুষ তা শুধু কাজে লাগান না তা রীতিমত উপভোগ করেন, তার মাধ্যমে অন্য জগতে চলে যান, জ্ঞানের আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করেন– অনেকটা কবিতা উপভোগ করার মত। আর কাজে লাগানোওটি একটি উপভোগ, নিজের বিশ্বদৃষ্টি বদলে দেবার যেমন আনন্দ তেমনি নিজের জীবনটিও বদলে দেবার আনন্দ। এসব কৃতিত্ব বিজ্ঞানীর।

আবার কেউ হয়তো বল্‌বেন কবির সৃজনশীলতার যে স্বাধীনতা আছে বিজ্ঞানীর তা নেই। যে কারণে এক কবি রবীন্দ্রনাথ অন্য কবিদের উদ্দেশ্যে অবলীলাক্রমে বলতে পেরেছেন– 'তাই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নয়'। বিজ্ঞানী তো একথা বলতে পারবেননা, কারণ তাঁকে বিজ্ঞানের নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম মেনে চল্‌তে হয়, প্রকৃতিতে যা সত্য তাই শুধু তিনি বল্‌তে পারেন। কিন্তু এই অমিলটিও যতখানি মনে করা হয় ততখানি নয়– কারণ কবিকে যতটা স্বাধীন বলা হয় ততখানি তিনি নন্, আর বিজ্ঞানীকে যতটা প্রকৃতির অধীন মনে করা হয় ততটাও তিনি নন্। কবিকে মানব মনের গ্রহণযোগ্য আর্টের ভেতর থাকতে হয়; নইলে সে কবিতা অন্য মানব মনকে উদ্বেলিত করবেনা। অন্যদিকে আগেই বলেছি বিজ্ঞানী নিজের সৃজন শক্তিতেই, নিজের মত করেই প্রকৃতির নিয়মকে নিংড়ে আনতে পারেন। প্রকৃতি সাধারণত অত্যন্ত জটিল, তাতে নিয়ম যদি সেভাবে থাকেও তা মানুষের কাছে প্রকাশ

করতে প্রকৃতি খুব আগ্রহী নয়। বিজ্ঞানী সেখান থেকে এমন বোধগম্য নিয়ম নিয়ে আসেন যা মানুষ উপভোগ করেন এবং যা প্রকৃতিও অস্বীকার করতে পারেনা। বিজ্ঞানীকে তাই মানব আর্ট আর প্রাকৃতিক আর্ট উভয়ের গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে সৃষ্টি করতে হয়। কবিতার সঙ্গে অমিল অবশ্যই আছে, তবুও আমরা এই মৌলিক মিলটির ওপরেই গুরুত্ব দিতে চাই; কারণ বিজ্ঞানের আলোচনায় এর কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। বিজ্ঞানের মধ্যে যে এত কিছু কল্পনা আছে, তা আমরা বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার, নানা সৃষ্টির কথা বলার মাধ্যমেই দেখাতে চাই।

এতো গেলো যেকোন কাব্যের সঙ্গে মিলের কথা, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ করে মহাকাব্যের মিলটি কোথায়? যদিও মনে হতে পারে বিজ্ঞান যেখানে যা সমস্যা পাচ্ছে সেখানে সেটি সমাধান করছে; তার আলাদা আলাদা শাখা, প্রত্যেকটির আছে নিজস্ব নিয়ম ইত্যাদি। কিন্তু পরে দেখবো আসলে পুরো বিজ্ঞানটিই একটি অভিন্ন কাহিনীর ধারাবাহিক গল্প সবই এক সূত্রে গাঁথা। এ এক অনবদ্য মহাকাব্যের মত। একটি বড় গুণ যা এর আছে তা হলো এর সব কিছুর অবয়ব খুব বড় মাপের– মহাকাব্যিক। মহাকাব্যে অর্জন, আনন্দ, উদযাপন ইত্যাদি সবই যেমন অতি বড় মাপের তেমনি হতাশা, ট্র্যাজেডি, ধ্বংস এসবও বড় মাপের। এর কারণ এর কাহিনী পরিকল্পিত হয় ওভাবেই, অনেক বড় পরিধিতে- আপাত দৃষ্টিতে একটি রাজ্য-সাম্রাজ্যকে নিয়ে হলেও, একটি পরিবারের বা বংশের সীমার মধ্যে হলেও, তার আসল বক্তব্য যেন বিশ্বকে নিয়ে, পুরো মানব জাতিকে নিয়ে, পুরো মানব-আকাঙ্খাকে নিয়ে। অনেক মহাকাব্য তাই মানুষকে ছাড়িয়ে, পৃথিবীকে ছাড়িয়ে দেবদেবী, স্বর্গ, সবাইকে জড়িয়ে নেয় ওই আপাত সীমিত কাহিনীর মধ্যেই। আমরা দেখবো বিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। বিজ্ঞান আপাতদৃষ্টিতে খুব খণ্ডিত, এমনকি খুবই ক্ষুদ্র জিনিসের ওপরো কাজ করে; কিন্তু তার ভেতরেই একটি পুরো জগত সৃষ্টি করে; তারপর সেই জগতকে যুক্ত করে মহাজাগতিক নিয়মের সঙ্গে, শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বই তার লক্ষ্য। মনে হতে পারে যে বিজ্ঞান বোধ হয় শুধু সাম্প্রতিক কালেই একীভূত তত্ত্বের কথা বলছে, থিওরি অফ্ এভরিথিং এর কথা। আসলে কিন্তু বিজ্ঞানী চিরকালই ওই একীভূত তত্ত্ব পাওয়ার স্বপ্নটি কোন না কোন ভাবে মনের ভেতর পোষণ করেছেন, যত অল্প কথায় সম্ভব বিশ্বকে ধারণ করতে চেয়েছেন। এজন্যই বিজ্ঞান মহাকাব্যিক।

মহাকাব্যের কথা শুনলেই আমাদের মনে পড়ে এমন দুটি অবিস্মরণীয় প্রাচীন মহাকাব্যের উদাহরণ নিয়ে আমরা একটু দেখতে পারি এর আর কী কী বৈশিষ্ট বিজ্ঞানের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই দুটির একটি হচ্ছে প্রাচীন ভারতের 'মহাভারত' আর অন্যটি প্রাচীন গ্রীসের 'ইলিয়াড'। দুটিই আপাত দৃষ্টিতে সীমিত রাজ্যের সীমিত রাজপুরুষদের নিয়ে– যদিও উভয়টির ব্যাপ্তি ও পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বিপুল। মহাভারত ইন্দ্রপ্রস্ত রাজ্যের দুই রাজন্য ভাই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের কাহিনী, ধৃতরাষ্ট্রের বহু সংখ্যক পুত্র কৌরবরা ও পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র পাণ্ডবদের মধ্যে বিবাদ নিয়ে। তাঁরা ও তাঁদের অসংখ্য আত্মীয়-অনাত্মীয় সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও একটি বিশাল যুদ্ধ 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে' কেন্দ্র করে কাহিনী এগিয়েছে। ইলিয়াডও একজন গ্রীক রাজা মেনেলিউজের সুন্দরী স্ত্রী হেলেনের ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের সঙ্গে ট্রয়ে পলায়ন এবং হেলেনকে উদ্ধারের জন্য ভ্রাতৃসম অন্যান্য গ্রীক রাজাদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ট্রয় আক্রমণ, দফায় দফায় যুদ্ধ এবং অবশেষে ট্রয়ের ধ্বংসের মাধ্যমে হেলেনকে উদ্ধারের ঘটনা।

উভয় ক্ষেত্রে মূল গল্পটির যতটুকু মানুষকে নিয়ে তা সেদিনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে অসম্ভব বা খুবই ব্যতিক্রমী কিছু নয়। কিন্তু এরা মহাকাব্য হয়ে ওঠেছে গল্পের ঘটনাবলীকে ছাড়িয়ে অনেকগুলো উচ্চ মাপের নীতি ও নৈতিক চিন্তা সেখানে বড় হয়ে ওঠেছে বলে, এবং তা হয়েছে মূল গল্পের অসামান্য বিস্তার, শাখা-প্রশাখায় সৃমদ্ধি ও জটিলতার মাধ্যমে। কাহিনীর ভেতরে কাহিনী - এটিই ছিল এ ধরনের মহাকাব্যের বড় বৈশিষ্ট, যার এক একটি অভ্যন্তর-কাহিনী এবং অভ্যন্তর-চরিত্রই এক এক পর্যায়ে নিজেই মুখ্য হয়ে পাখা মেলেছে। আর একটি বৈশিষ্ট এই প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে অন্তত খুবই লক্ষণীয়– তা হলো স্বর্গ ও মর্ত্যকে এক করে ফেলে মানব-দেবতা-দানব সবাইকে এর পাত্রপাত্রী হিসেব একই ভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। কাজেই যে রকম চরিত্রকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তারা যেমন ওখানে অংশ নিয়েছে, তেমনি যাদেরকে সামনে দেখছিনা, দেখা যায়না, তারাও সমান ভাবে এতে অংশ নিয়েছে। বিজ্ঞানে যে মহাকাব্য তাও কিন্তু আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন দেখা পাত্রপাত্রীদের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মধ্যে, সীমাবদ্ধ থাকেনা। সাহিত্যের মহাকাব্যের মত তা আমাদেরকে অন্যলোকে বিচরণ করতে শেখায় যেখানে

অনুভূতি আলাদা, নিয়ম আলাদা– যেমন অতিক্ষুদ্রের জগতে, আবার মহাকাব্যের মত বৃহতের জগতে, গাণিতিক চিন্তার জগতে।

এই বিষয়গুলো বেশ চোখে পড়ে যখন আমরা শুরু থেকে ওই উভয় প্রাচীন মহাকাব্যের একের পর এক পর্বের নামগুলো দেখি- দেখা যায় কীভাবে কাহিনীর মূল প্রবাহের থেকে পার্শ্ব-প্রবাহে, আবার মুল প্রবাহে আসা যাওয়া ঘটেছে; যেমন মহাভারতের পর্বগুলো যদি শুরু থেকে দেখি ১) আদি পর্ব, ২) সভা পর্ব, ৩) বন পর্ব, ৪) বিরাট পর্ব, ৫) উদ্যোগ পর্ব, ৬) ভীষ্ম পর্ব, ৭) দ্রোন পর্ব, ৮) কর্ণ পর্ব ইত্যাদি। অন্যদিকে ইলিয়াডের পর্বগুলো দেখলেও এই বৈশিষ্ট চোখে পড়ে- ১) প্রারম্ভ: দেবতার রোষ, দেবতাদের মধ্যে ঝগড়া, প্লেগ মহামারী ইত্যাদি; ২) গ্রীক ও ট্রজানদের মধ্যে যুদ্ধের নানা অংশ, নানা পরিস্থিতি; ৩) প্যারিস ও মেনেলিউজের মধ্যে সরাসরি দু'জনের লড়াই; ৪) দেবতাদের মধ্যে বিবাদ; ৫) ট্রজান যুবরাজ বীর হেক্টর আর গ্রীক বীর আজ্যাক্সের মধ্যে সরাসরি লড়াই ইত্যাদি। বিজ্ঞানের আলোচনায় এমন প্রাচীন মহাকাব্যের কিছু খুঁটিনাটি আনার একটিই কারণ– তা হলো বিজ্ঞানের যে আয়োজন এবং এর পেছনে যে মানব-আকাঙ্খা তা যে রীতিমত মহাকাব্যিক সেটি দেখানোর চেষ্টা। বিজ্ঞানের মূল কাহিনীও এভাবে নানা শাখায় বিস্তৃত হয়েছে মহাকাব্যের নানা পর্বের মত, কিন্তু সেভাবেই সেগুলো মূলধারায় আসা যাওয়া করেছে। যেমন জীবের কাহিনীতে বিস্তৃত হয়ে সেখানেও মূল অণু- পরমাণুকে কাজ করতে হয়েছে।

যদি ওই প্রাচীন মহাকাব্যগুলোর রচনা প্রক্রিয়া দেখতে চাই তার শিকড়কে অনেক প্রাচীন অতীতে মিশে যেতে দেখি। আমরা গ্রন্থবদ্ধ আকারে গ্রথিত করার কাজে ইলিয়াডের রচয়িতা হিসেবে কবি হোমারকে এবং মহাভারতের রচয়িতা হিসেবে ঋষি ব্যাসের নাম জানি। উভয়ে অনেক প্রাচীন ও মোটা দাগে সমসাময়িক হলেও এও মনে করা হয় যে রচয়িতা হিসেবে তাঁদের ভূমিকা কিছুটা রহস্যাবৃত– এ দুই মহাকাব্যের সৃষ্টি আরো প্রাচীন; বলা যায় নানা হাতে এর কাহিনী বিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞানের শিকড়ও অনেক প্রাচীন ও গভীর– এটিও মানব ইতিহাসে বিবর্তিত হয়ে লিপি উদ্ভাবিত হবার পর আমাদের জানা রূপ ধারণ করেছে। খণ্ড খণ্ড নানা অবদান এতে ক্রমে জড়ো হয়েছে একথা মহাকাব্যের ক্ষেত্রে যেমন বলা যায়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বলা যায়। তবে উভয়ের প্রেরণা ও দায়বদ্ধতা ছিল আলাদা। মহাকাব্য নির্ভর করেছে হীনতার প্রতি মানুষের বিরাগ আর মহতের প্রতি তার আকর্ষণের আবেগকে আশ্রয় করে। সে

আবেগ স্থায়ী ভাবে সৃষ্টি করতে পারলে, মানুষকে সেদিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, তার কল্পনা সার্থক হয়। বিজ্ঞান গড়ে ওঠেছে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে মানুষের কৌতূহল এবং এর বাস্তবাশ্রয়ী সত্যের প্রতি তার আকর্ষণের ওপর নির্ভর করে। প্রথমটিতে কবির কল্পনা ও কাব্যিক সৃজনশীলতা কাজ করেছে; দ্বিতীয়টিতেও কল্পনা ও সৃজনশীলতা কম কাজ করেনি, কিন্তু সেখানে মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নেয়ার একটি তাগিদ আছে, তাই কল্পনাশ্রয়ী হয়েও তাকে বাস্তবের কাছে নানা ভাবে জবাবদিহি করতে হয়েছে। সেই জবাবদিহি করতে সফল হলে এবং তা দিয়ে প্রাকৃতিক জগতের আরো ঘটনার সফল ভবিষ্যদ্বাণী সব ক্ষেত্রে করতে পারলে তবেই তার কল্পনা সার্থক হয়। উভয়েরই পরিধি কিন্তু প্রায় অসীম।

এমনি বৃহৎ পরিধি সত্ত্বেও এক এক সময় একটি মহাকাব্য এক এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে; এক এক পর্বে ছোট এক একটি নিজস্ব জগত সৃষ্টি করেছে। মহাভারতে মূলধারার কুরু-পাণ্ডবের রাজ্য যেমন আছে তেমনি আছে দীর্ঘ সময় পাণ্ডবদের বনবাসে থাকার অন্যরকম সীমিত জগত, অথবা সম্পূর্ণ আরেকটি আলাদা জগত 'বিরাট' নামক রাজ্য। এরকম প্রত্যেকটি ছোট জগতের ভঙ্গিটি হলো তার নিজস্ব রূপকথার মত- গল্পের ভেতরে গল্পের রূপকথা। রূপকথা এই জন্য যে এর পাত্রপাত্রীদের সাধারণত থাকে অশরীরী দৈব গুণ, বিশেষ ক্ষমতা। অনেক সময় তাঁরা মানুষও নন– সাধারণ মানুষ যাঁদেরকে দেখেননা সেই দেবতারা; আর আছে অনেক অবাস্তব, অসম্ভব দৈব অস্ত্র ও দৈব ঘটনা। কিন্তু যে সব আবেগের, যে সব চিন্তার কারণে এই রূপকথার আমেজ আনতে হয়েছে সেগুলো অবশ্যই মানুষের।

বিজ্ঞানেরও পরিধি পুরো জগৎ-জীবন এবং মহাবিশ্ব হলেও তার এক একটি পর্বের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে– তার প্রত্যেকটির নিজস্ব জগত আছে যার গল্পের মধ্যে সেও রূপকথার আমেজ সৃষ্টি করে। রূপকথা এজন্য যে বিজ্ঞানী তাঁর তত্ত্বে যে সব কথা বলেন তা প্রকৃতির দেখা যাওয়া ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে থাকেনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতি একেবারেই রহস্যময় হয়ে থাকে বলেই তাতে বিজ্ঞানীর ডাক পড়ে। বিজ্ঞানী ওই রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করেন নিজের কল্পনা শক্তি দিয়ে এক রকম তত্ত্বের রূপকথার সৃষ্টি করে। অবশ্য শেষ অবধি রহস্যের বাস্তব সমাধান করতে পারলেই তাঁর এই বিশেষ রূপকথাটি টেকে। তবে আমরা কখনোই এসবকে রূপকথা বলিনা, রহস্য সমাধানের আগে পর্যন্ত

বলি বিজ্ঞানীর কল্পতত্ত্ব, আর সত্যি সত্যি সমাধান যদি হয়ে যায়, ওই কল্পতত্ত্ব থেকে যুক্তিতে টানা সিদ্ধান্তগুলো যদি দেখা অভিজ্ঞতার (যেমন এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি) সঙ্গে মিলে যায় তখন বলি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। অবশ্য চিরকাল সেটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে এমন কথা নেই, অন্য কোন অভিজ্ঞতায় গিয়ে যদি দেখা যায় যে তার সঙ্গে তত্ত্বটি মিল্‌ছেনা তখন একে পুরো বা আংশিক বদলাবার প্রশ্ন ওঠে। এজন্য কল্পতত্ত্বের রূপকথাটিও বদলে যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু আবার প্রাসঙ্গিক সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল্‌ছে। তত্ত্বের ফলাফল বাস্তবতার সঙ্গে মিলে গেলেও তত্ত্ব নিজের মধ্যে রূপকথার আমেজ কিন্তু থেকেই যায়– কারণ ওখানে যা আছে তার অনেক কিছুকে সাধারণভাবে আমরা দেখিনা, অনেক কিছু বিজ্ঞানী নিজেও কখনো দেখবেন না। কিন্তু তার থেকে ক্রমাগত দেখতে পাওয়া সব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল ভাবে করতে পারলে ওই কল্পনাকে সত্যি বলে মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় বিজ্ঞানীর বা আর কারো থাকেনা।

তাই শেষ পর্যন্ত যদি জিজ্ঞেস করা হয় তার অনেক কিছুতে রূপকথার আমেজ সত্ত্বেও বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করা কেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো এটি ব্যতিক্রমহীন ভাবে সফল হয় বলে। একে সীমিত জগতের সীমিত রহস্যের ক্ষেত্রে যেমন সফল হতে হয়, তেমনি সেই তত্ত্বটি অন্য সব তত্ত্বের সঙ্গে সহায়ক হতে হয়, সাংঘর্ষিক হলে চলেনা। সব গল্প মিলে যেন একটি অখণ্ড সর্বব্যাপ্ত 'মহাকাব্য' গড়ে ওঠে, তাও নিশ্চিত করতে হয়। এর অর্থ হলো একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে বিজ্ঞানের সব অংশের মধ্যে একটি অভিন্ন সাযুজ্য থাকতে হয়। শুধু আলাদা আলাদা নিয়ম হলে চলেনা– সব কিছুকে কিছু বিশ্বনিয়মের অধীনে আসতে হয়। ওই বিশ্বনিয়ম যত কম ও সংক্ষিপ্ত ততই বিজ্ঞানী বেশি খুশি- কখনো নিউটনের ভাষায় একে বলেছেন বিশ্বনিয়ম, কখনো আইনস্টাইনের ভাষায় একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব, কখনো একেবারে সম্প্রতি স্টিফেন হকিংসের ভাষায় থিওরি অফ এভরিথিং। মহাকাব্যের মত চূড়ান্ত রূপে সব প্রশ্নের নিষ্পত্তি এখানে হয়না কিন্তু ক্রমাগত আরো ভাল নিষ্পত্তির সম্ভাবনাটি স্পষ্ট দেখা যেতে হবে, যেন এটি শেষ হবার নয়, ক্রমেই রচিত হয়ে চলেছে।

## বিদ্যুৎ-চুম্বকের রাজ্য

**বিদ্যুৎ-চুম্বক রূপকথাঃ**

প্রাচীন মহাকাব্যের এক এক পর্বে যেমন এক এক 'রাজ্য' আমরা দেখি, যা শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীতে শামিল হয়, তেমনি উদাহরণ স্বরূপ এখান ওখান

থেকে বিজ্ঞানের কিছু রাজ্য নিয়ে আমরা দেখতে পারি সেটি কী ভাবে এগিয়েছে। দেখবো ওখানে এমন কী আছে যার জন্য আমরা রূপকথার আমেজ অনুভব করতে পারি। আবার একই গল্প বিজ্ঞানের ভাষায় যখন বলি তখন কি রূপকথার সেই আমেজ একেবারে উধাও হয়ে যায়, না তখনো কিছুটা থেকে যায়? প্রথম যে রাজ্যটি বেছে নিলাম সেটি বিদ্যুৎ-চুম্বকের রাজ্য। একে প্রায় বিশুদ্ধ রূপকথার মত করে বলা যায়। তারপর বিজ্ঞানের মত করে একই জিনিসকে আবার বলা যাবে; তখন অবশ্য এটি আর বিশুদ্ধ রূপকথা থাকেনা বিজ্ঞানীর সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সব কথাকে মিল্‌তে হয়। ওই অভিজ্ঞতাগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যই রূপকথার মত জিনিসের অবতারণা– আর সেই ব্যাখ্যা সব ক্ষেত্রে সফল হতে হয়।

ধরা যাক্ দেশটির নাম বিদ্যুৎ-দেশ। সেখানে আছে দুই রকমের অদৃশ্য জিনিস– যারা একে অপরের বিপরীত। একটির নাম ধন চার্জ, অন্যটির নাম ঋণ চার্জ। কেন এই নাম তার কোন বিশেষ কারণ নেই যেমন গল্পের হোদল কুৎকুৎ আর কোদল কুৎকুৎ এই দুই বিপরীত চরিত্রের নামের কোন কারণ নেই। তবে দুজনেই যখন কুৎকুৎ তখন ধরে নেয়া যায় যে দুজনেরই কুৎকুৎ পারিবারিক কোন গুণ আছে। আমাদের ধন চার্জ আর ঋণ চার্জের উভয়েরও চার্জের গুণটি রয়েছে– একের ওই চার্জ অজানা বিশেষ এক প্রকারের যাকে বলছি ধন, আরেকের তা ওর বিপরীত ঋণের চার্জ। বিপরীত বলে এরা একে অপরকে নাকচ করে দিতে পারে, তাই এক সঙ্গে থাকলে ওই চার্জগুণ আর থাকেনা। চার্জের গুণটি হলো একই রকমের হলে তা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়, আর বিপরীত রকম হলে পরস্পরকে নিজের কাছে টেনে আনে। এর মানে ধনচার্জ ধনচার্জকে ঠেলে, কিন্তু ঋণচার্জকে টানে, ইত্যাদি। এটি সে কী ভাবে করে? তাদের প্রত্যেকের গা থেকে চিকন চিকন শজারুর কাঁটার মত সূতা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে– ওই সূতার বলের দিক অনুযায়ী এসব টানা বা ঠেলা ঘটে। সূতা যতদূর ভাবা যায় ততদূর চলে যায় বটে তবে যত দূরে যাবে তার টান-ঠেলার বলটি তত কমে যায়। ওই সূতা ছড়ানো পুরো জায়গাটিকে বলা হয় একটি ক্ষেত্র বা মাঠ। আরেক চার্জ ঐ ক্ষেত্রে গেলেই ওই সূতার কবলে পড়ে– নিজের সূতা ও তার সূতার আকর্ষণ-বিকর্ষণের বলের শিকার হয়। মাকড়সার বড়সড় জায়গা বা ক্ষেত্র জুড়ে পাতা সূতার জালে এসে পড়লে আরেকটা মাকড়সা যে রকম বলের শিকার হয় অনেকটা ওরকম। এখানে ক্ষেত্রটিকে বলা

হয় বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। তবে মনে রাখতে হবে এই চার্জ, সূতা, ক্ষেত্র সবই অদৃশ্য। নেহাৎ রূপকথা বলেই এদের কথা আমরা বলতে পারছি।

ওদেশের পাশে আরেকটি দেশ আছে যার নাম চুম্বক-দেশ। সেখানেও সেখানকার মত করে ওরকম অদৃশ্য জিনিসগুলো আছে– যাদের নাম হয়েছে চৌম্বক উত্তর মেরু ও চৌম্বক দক্ষিণ মেরু যারাও ধন চার্জ ও ঋণ চার্জের মত বিপরীত হলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং একই হলে বিকর্ষণ করে। তা ছাড়া তাদেরো আছে চৌম্বক বলের সূতা, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি অনেকটাই ওই বিদ্যুৎ-দেশের মতই, সবই অদৃশ্য।

দু'দেশের সবাই যে পরস্পরের আত্মীয় সে কথা কারোই জানা ছিলনা। দেখা গেলো এক দেশের এরা অন্যদেশের ওদেরকে চিনতে পারে? যেমন চার্জগুলো নড়লে বা প্রবাহিত হলে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। সেখানে ওই চুম্বক উত্তর মেরু ও চুম্বক দক্ষিণ মেরুরও সৃষ্টি হয়। আবার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে যে কোন ভাবে পরিবর্তন করলে, ওঠানামা করলে ওরকমই ওঠানামা করা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। একই কাজ চুম্বক ক্ষেত্রের ওপর করলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এতই তারা আত্মীয় যে একজন নড়াচড়া করলে অন্যজনকে তার মধ্যে নড়াচড়া করতে দেখা যায়; আর দ্বিতীয় জন নড়াচড়া করলে সে রকম করতে হয় প্রথম জনকে। সবাই বুঝতে পারলো বিদ্যুতের রাজ্য আর চুম্বকের রাজ্য আসলে একই রাজ্য। সেই থেকে দেশের নামটি পালটিয়ে দেয়া হলো আলাদা আলাদা বিদ্যুৎ-দেশ চুম্বক-দেশ না বলে প্রতিষ্ঠিত হলো একই দেশ বিদ্যুৎ-চৌম্বক দেশ। তাদের বল্‌টি হয়ে গেলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল, তাদের ক্ষেত্রটি হয়ে গেলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র- তবে আলাদা আগের দুই দেশের পরিচয়গুলো কিন্তু রইলো। যে কোন ক্ষেত্রকে ওঠানামা করালে বিদ্যুৎ-চৌম্বক একটি ঢেউ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পুকুরের পানিকে হাত দিয়ে নড়াচাড়া করলে যে রকম পানির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা সে রকম। পানির এই ঢেউতে যে রকম পানি নিজ নিজ একই জায়গায় থেকে ওঠানামা করে, বিদ্যুৎ-চৌম্বক ঢেউতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র আর চুম্বক ক্ষেত্র ওভাবে ওঠানামা করে। পানির ঢেউ দেখা যায়, তবে বিদ্যুৎ-চৌম্বক রাজ্যে সবই অদৃশ্য। ঢেউ অদৃশ্য হলেও অবশ্য তার ফলাফলগুলো খুবই বোঝা যায়। তার কিছু কিছু ফল দেখাও যায় যেমন আলো, আরেকটি এমন ঢেউ হলো রেডিয়ো তরঙ্গ যা দেখা না গেলেও তার ফলাফল রেডিয়ো, টেলিভিশনে বোঝা যায়। কাজেই বিদ্যুৎ-চৌম্বক দেশ অনেকটা অদৃশ্য

কল্পনার রূপকথার দেশ হলেও তার ফলাফলগুলো কিন্তু আমরা সত্যিকার দেশের মানুষরা বেশ টের পাই।

এমনি ভাবে আমরা বিদ্যুৎ-চুম্বকের কথাকে রূপকথার আমেজে বলে যেতে পারি। কিন্তু এরপর নিচে তাকে বিজ্ঞানের মত করেই বরং বলি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিজ্ঞানের ভাষায় বললেও রূপকথার মত কিছু কিছু জিনিস কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

**বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানঃ**

সতরো শতকের কথা, বেশ কিছুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা কতগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। দেখা যাচ্ছিলো কাচের দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে, এবং রাবারের শক্ত দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে এরপর উভয় দণ্ডে কিছু অদ্ভুত গুণ দেখা যায়। ওরকম ঘষার পর দুটি কাচের দণ্ডকে সূতায় ঝুলিয়ে পরস্পরের কাছে আনলে এরা একটি অন্যটিকে ঠেলে দেয়। ঘষা রাবারের দুটি দণ্ডকে তেমনি করলে তারাও পরস্পরকে ঠেলে দেয়। কিন্তু একটি কাচের ও একটি রাবারের দণ্ডকে কাছাকাছি আনলে তারা না ঠেলে দিয়ে বরং পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসে। এই সবকে তখন বলা হতো ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতের ঘটনা। ওই শব্দটি এসেছিলো প্রাচীন একটি গ্রীক শব্দ থেকে যেখানে এমন আকর্ষণ-বিকর্ষণের ব্যাপার বোঝানো হতো। এসব নিয়ে আমেরিকান বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ভাবছিলেন। কেন এমন হয় সেই প্রশ্ন নিয়ে সে সময় অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও ভাবছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন কিছু অদৃশ্য জিনিস কল্পনা করে ওই ঘটনাগুলোর পেছনে একটি কারণ খাড়া করলেন। তিনি বল্‌লেন সব বস্তুর মধ্যে চার্জ নামের অদ্ভুত গুণ সম্পন্ন কিছু জিনিস আছে অনেকটা অদৃশ্য তরলের মত। এই তরলটি যদি কোন জিনিসে বাড়তি থাকে তখন তখন বলা যায়– ওই জিনিসটি ধনাত্মক (পজিটিভ), আর তরলটি যদি ওই জিনিসে কমে যায় তাহলে তাকে বলা যায় ঋণাত্মক (নেগেটিভ)। কাচ জিনিসটিই এমন যে পশম দিয়ে ঘষা কাচের কিছু চার্জ পশমে চলে যায় কাজেই কাচের দণ্ডটি হয়ে পড়ে ঋণাত্মক। আবার রাবার জিনিসটি এমন যে পশম দিয়ে ঘষলে পশম থেকে কিছু চার্জ রাবারে চলে যায়, কাজেই চার্জ বাড়ে বলে রাবার হয়ে পড়ে ধনাত্মক। চার্জের একটি বিশেষ গুণ হলো তার কারণে ধনাত্মক জিনিস ঋণাত্মক জিনিসকে আকর্ষণ করে– যেমন এক্ষেত্রে কাচের দণ্ড রাবারের দণ্ডকে করে। কিন্তু ধনাত্মক জিনিস আরেকটি ধনাত্মক জিনিসকে বিকর্ষণ করে- যেমন রাবারের দণ্ড অন্য রাবারের দণ্ডকে।

একই ভাবে ঋণাত্মক জিনিস অন্য ঋণাত্মক জিনিসকেও বিকর্ষণ করে যেমন কাচের দণ্ড অন্য কাচের দণ্ডকে। এভাবেই ফ্রাঙ্কলিনের দেয়া তত্ত্ব সত্যি সত্যি দেখা অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে পারছিলো। শুধু তাই নয়, ফ্রাঙ্কলিন ব্যাপারটি কিছুটা মাপজোক করে দেখালেন। তিনি দেখালেন যে ওই চার্জ কিছু কিছু বস্তুর ভেতর দিয়ে নতুন জায়গায় চলে যেতে পারে- যাদেরকে তিনি বল্‌লেন পরিবাহী; ধাতুগুলো সাধারণত এপর্যায়ে পড়ে। অন্য বস্তু যার মধ্য দিয়ে চার্জ চলাচল করতে পারেনা তাকে তিনি বল্‌লেন অপরিবাহী– যেমন কাচ বা রাবার। পশম ঘষা রাবারকে বা এরকম ঘষে চার্জ জমা করা যে কোন জায়গাকে ধাতুর তার দিয়ে তিনি দুটি খুব কাছাকাছি কিন্তু স্পর্শ না করা অতি পাতলা ধাতুর পাতের উভয়টির সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। একই চার্জ এখন দুটি পাতে গিয়েছে বলে পাত দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে দেখা গেলো– তাতে পাত দুটি যেদিকে নড়াচড়ার জন্য খোলা আছে সেদিকে ফাঁক হয়ে যায়। এটি আসলে ইলেকট্রোস্কোপ নামের একটি যন্ত্রই হয়ে গেলো যেখানে চার্জের পরিমাণ মাপা যায়। যত বেশি ফাঁক হয় তার দৈর্ঘ মেপে চার্জের পরিমাণ যে কত বেশি তা বোঝা যায়। সে সময়ের মত বিদ্যুতের বিষয়ে যে সব ঘটনা সত্যি সত্যি দেখা যাচ্ছিলো ফ্রাঙ্কলিনের কল্পনায় গড়া তত্ত্বে তার সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা গেলো, কিন্তু এরপর আরো নতুন নতুন ঘটনা এর মধ্যে দেখা যাওয়াতে সেটিতে আর কাজ চল্‌লোনা।

এজন্য আঠারো শতকের এক পর্যায়ে গিয়ে চার্জকে আর তরল মনে না করে এক ধরনের কণিকা হিসেবে মনে করা হলো। কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ডুবানো পরিবাহীকে বিশেষ ভাবে সাজালে মনে হয় যেন এর মধ্য দিযে চার্জ এমন ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে যাতে তাকে কণিকা মনে করাটাই মানানসই। প্রবাহের রীতিনীতিতে বিশিষ্ট এমনি একটি কণিকার নাম দেয়া হলো ইলেকট্রন। আঠারো শতকের শেষের দিকে গিয়ে বোঝা গেলো এই ইলেকট্রন কণিকাগুলো সব বস্তুর ক্ষুদ্র উপাদান এটমেরই অংশ, কোন কোন পরিস্থিতিতে যেমন ধাতুকে উত্তপ্ত করলে তার থেকে এগুলোর দল বেরিয়ে আসে, অর্থাৎ এটম থেকে বের হয়ে আসে। কোন অবস্থাতেই একে দেখা যায়না বটে কিন্তু নানা সাক্ষ্য দেখে ওই প্রবাহে, বা ওভাবে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনগুলোর উপস্থিতি আন্দাজ করা যায়। শুধু তাই নয় এর ভর, চার্জের পরিমাণ এগুলো মাপাও গেলো। এও বোঝা গেল যে চার্জ জিনিসটি এক রকমের নয়, যদি এক রকমের হতো তা

হলে প্রত্যেক এটম ও প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চার্জের গুণ দেখা যেতো– তা কিন্তু দেখা যায়না। তাই ধরে নেয়া হলো যে ইলেকট্রনের চার্জটি একটি বিশেষ প্রকারের যাকে বলা হলো ঋণাত্মক, ওর ঠিক বিপরীত অন্য আর এক রকম চার্জ কল্পনা করা হলো– সেটি ধনাত্মক। এটমের মধ্যে দুটিই সমান পরিমাণে থাকে বলে একটি আরেকটিকে নাকচ করাতে এটম চার্জবিহীন হয়, সব বস্তুই সাধারণত এভাবে চার্জবিহীন। ওই কাচের দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষার মতো ঘটনায় অবশ্য এক রকম কিছু চার্জ বেরিয়ে গেলে উভয়ের সমতা নষ্ট হয়ে দণ্ডটি চার্জযুক্ত হয়ে পড়তে পারে। ওই যে নানা দণ্ডের আকর্ষণ-বিকর্ষণ তা এই কারণেই হয়েছে। কারণ ঋণাত্মক ও ধনাত্মক চার্জ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছু গুণও ধরে নেয়া হয়েছিলো– একই রকম চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, আর বিপরীত চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এর মধ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানী অভিজ্ঞতা থেকে আরো অনেক নিয়ম আবিষ্কার করে ফেলেছেন। যেমন কুলম্ব আবিষ্কার করলেন বিভিন্ন পরিমাণ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত দুটি বস্তুর মধ্যে জিনিসের আকর্ষণ বিকর্ষণ মেপে কুলম্বের নিয়ম। এটি অনেকটা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আদলে যার থেকে চার্জের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তিকে চার্জের পরিমাণ ও তাদের পরস্পর দূরত্বের থেকে পাওয়া যায়; একটি বিদ্যুৎ ধ্রুবক মানও এর থেকে পাওয়া গেলো যা সারা বিশ্বে বিদ্যুতের জন্য একেবারে অপরিবর্তনীয়। আরেকজন বিজ্ঞানী ওয়েরস্টেড আবিষ্কার করলেন বিদ্যুৎ প্রবাহ একটি চুম্বকের মত কাজ করে। বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা চুম্বক জিনিসটিকে লক্ষ্য করে আসছিলেন– প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া জিনিস যা ওরকম আরেকটিকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে; আবার লোহাকে আকর্ষণ করে। ওই ফ্রাঙ্কলিনের বিদ্যুৎ চার্জের আদলে এর জন্য প্রায় একই রকমের কিছু কল্পনা করা হয়েছিলো যা এই আকর্ষণ-বিকর্ষণকে ব্যাখ্যা করতে পারে। ওভাবেই কল্পনা থেকে এসেছিলো চুম্বক উত্তর মেরু, চুম্বক দক্ষিণ মেরু, চুম্বকত্ব, চুম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি। কুলম্বের নিয়মের মত একই রকম নিয়ম চুম্বক আকর্ষণ–বিকর্ষণের শক্তির পরিমাণ হিসেব করে বের করার জন্য আবিষ্কার হলো, যার মধ্যে এলো ওই বিদ্যুৎ ধ্রুবকের মতো আরেকটি বিশ্ব-ধ্রুবক যেটি চুম্বক-ধ্রুবক। ওয়েরস্টেডের আবিষ্কার দেখালো বিদ্যুৎ আর চুম্বকের মধ্যে একটি আত্মীয়তা রয়েছে– প্রাকৃতিক চুম্বক ছাড়াও যে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিজেও একটি চুম্বক, একে বলা হলো বিদ্যুৎ-চুম্বক। এর মধ্যে ভাল বিদ্যুৎ

প্রবাহ (কারেন্ট) পাওয়ার জন্য রাসায়নিক ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ-কোষ বা ব্যাটারি নামের বিদ্যুৎ উৎসও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের আত্মীয়তা আবিষ্কার এখানেই শেষ হলোনা। ফ্যারাডে দেখালেন বিদ্যুৎ চার্জযুক্ত কিছু বা বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে এমন ধাতু-তারের কুণ্ডলীকে নড়াচড়া করে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটালে সেখানে একটি চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়– অর্থাৎ ওটি চুম্বকের মত কাজ করে। আর একটি চুম্বককে নড়াচড়া করলে ঠিক উল্টোটা হয়– একটি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। চার্জ, চুম্বক মেরু, ক্ষেত্র ইত্যাদি কল্পনা থেকে এসেছে, অদৃশ্য বলে এগুলো আমরা দেখতে পারিনা; কিন্তু এই যে তারের কুণ্ডলী নড়াচড়া করে চুম্বক পাচ্ছি সেটি একেবারেই দেখা জিনিস। ওভাবেই তো কুণ্ডলী নড়াচড়ার বদলে চার্জ প্রবাহটিকে অন্যভাবে ওঠানামা করানো অল্টারনেটিং কারেন্ট থেকে পরিবর্তনশীল চুম্বক সৃষ্টি হয় বলে তা ঘুরতে পারে– যাকে বলা হলো বৈদ্যুতিক মোটর। তার ব্যাখ্যাটি কল্পনা হতে পারে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যা দিয়েই বৈদ্যুতিক মোটরের মত যে ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরি করা গেলো, তা একেবারেই বাস্তব। বিজ্ঞানী ফ্যারাডেই এর ঠিক বিপরীত জিনিসও তৈরি করলেন একই রকম ব্যাখ্যা দিয়ে। এবার চুম্বককে নড়াচড়া করে চুম্বক ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করা গেলো, যেটি কিনা বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করার জন্য আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায় হিসেবে খুবই কার্যকর হলো– বিদ্যুতের জেনারেটর। এসবের মধ্য দিয়ে বোঝা গেলো বিদ্যুৎ আর চুম্বক একই ব্যাপার, এদেরকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক এই একই নামে নিয়ে আসাই ভাল।

কুলম্ব, ওয়েরস্টেড, ফ্যারাডে প্রমুখরা হাতেকলমে কাজ করে যা দেখিয়েছেন, যেভাবে তত্ত্ব ও নিয়মগুলো খাড়া করেছেন, তাকে একসঙ্গে নিয়ে সুন্দর গণিতে বেঁধে ফেল্লেন ম্যাক্সওয়েল। সেই গণিত দাঁড়ালো একটি তরঙ্গের সমীকরণ রূপে। আসলে পানির তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ ইত্যাদি যে কোন তরঙ্গের জন্য এরকম তরঙ্গ-সমীকরণ খাড়া করা যায়। ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গটি হলো বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ কারণ বিদ্যুৎ আর চুম্বকের গুণগুলো এর মধ্যে আসলো, এবং এর যে ওঠানামা তা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ওঠানামা আর চুম্বক ক্ষেত্রের ওঠানামা। এই যে গণিতের পক্ষে কিছু ঘটনার বর্ণনা দিতে পারা, ঘটনাকে গণিতে বেঁধে ফেলতে পারা এও রূপকথা সৃষ্টির মতই মানুষের একটি অদ্ভুত

ক্ষমতা। পার্থক্য হলো অদ্ভুত একটি যুক্তিবাঁধা নিয়মে গণিত নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যায়, রূপকথা সেভাবে এগোয়না। অন্য তরঙ্গগুলোর যেমন একটি মাধ্যম আছে যেমন পানির তরঙ্গের পানি, বা শব্দ তরঙ্গের বাতাস, এখানে এরকম দেখা যাওয়ার মত কোন মাধ্যম রইলোনা। কিন্তু কল্পনায় বোঝা গেলো ওই অদৃশ্য ক্ষেত্র দুটি এখানে ওঠানামা করছে। তাছাড়া অন্য তরঙ্গের যার যার পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু ধ্রুবক যেমন তরঙ্গের সমীকরণে থাকে এখানেও রইলো এই বিদ্যুৎ-ধ্রুবক আর চুম্বক ধ্রুবক যার মান তো আগের বিষয়গুলো থেকে জানাই ছিলো। দেখা গেলো যে সমীকরণের থেকে তরঙ্গের গতিবেগ হিসেব করে বের করতে গেলে তাতে শুধু এই দুটি ধ্রুবকের মান জানলেই চলে। সেই মান থেকে যখন তরঙ্গটির বেগ বের করা হলো ম্যাক্সওয়েল অবাক হয়ে গেলেন দেখে যে এটি হুবহু আলোর বেগের সঙ্গে মিলে গেলো। আলোর বেগ সরাসরি পরিমাপ থেকে বহুদিন ধরে জানা ছিল। এমন মিল তো আর এমনি এমনি কাকতালীয়ভাবে ঘটতে পারেনা, ম্যাক্সওয়েল বুঝতে পারলেন যে আলো নিজেও একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ।

কিছুদিন পর হার্ৎস আরো এক রকম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন যেটি আলোর মত চোখে ধরা না পড়লেও অন্য ভাবে ধরা পড়ে– সেটি রেডিও তরঙ্গ। এরও সেই গতিবেগ মেপে আলোর গতির সমান ঠিক একই পাওয়া গেলো, যদিও তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘটি আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের থেকে অনেক বড়। পরে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের এমনি আরো বিভিন্ন রকমের বিদ্যু-চৌম্বক তরঙ্গ পাওয়া গেলো– এক্সরে, আলট্রাভায়োলেট, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি। এভাবে অদৃশ্য জিনিসের কল্পনা থেকে যা এসেছিলো তা সত্যি সত্যি এমন সব কার্যকর জিনিস জন্ম দিলো যেগুলোও অদৃশ্য হলেও তাদের নানা ফলাফল দৃশ্যমান। এরা এক এক দিকে এক এক রকম বিজ্ঞানের সৃষ্টি করলো যার মূল রয়ে গেলো সেই ইলেকট্রন, বিদ্যুৎ ক্ষেত্র, চুম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদির কল্পনার মধ্যে।

### বিজ্ঞানে রূপকথার আমেজটি কী রকমের?

আমরা একই কাহিনীকে দুভাবে বল্‌লাম– সেই বিদ্যুৎ-চুম্বক রাজ্যের কাহিনীটি। একবার বল্‌লাম একটি রূপকথা হিসেবে, আবার বল্‌লাম বিজ্ঞান হিসেবে। ওই বিজ্ঞান হিসেবে বলার সময় শুধু কিছু জিনিস রূপকথার আমেজে কল্পনাশ্রয়ী হয়ে এসেছে, বাকি সব খুবই বাস্তব, একেবারে চোখে দেখা, ধরা-ছোঁয়ার ভেতরেই রয়েছে। আসলে ওই বাস্তব ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনেই কল্পনাশ্রয়ী

বিষয়গুলোর প্রয়োজন হয়েছে। এর কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা ও সাধারণ মানুষ তেমন কোন কষ্ট না করেই দেখেছেন– যেমন প্রকৃতিতে খনিজ চুম্বক-পাথর, তার দুই রকম গুণের দুটি প্রান্ত থাকা এবং সেই প্রান্তগুলোর মধ্যে আকষণ-বিকর্ষণ, সেই চুম্বক-পাথরের লোহাকে আকর্ষণ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আকস্মিক ভাবে পশমে বা কাপড়ে ঘষা কাচ, রাবার বা এমনি আরো জিনিসের অদ্ভুত আচরণ। তবে এ সবের আচরণগুলো খুব স্পষ্ট ও প্রতিবার একই ভাবে পুনরাবৃত্তি হবার মত করে উদ্ঘাটন করতে বিজ্ঞানীদেরকে সুশঙ্খল ভাবে গবেষণা করতে হয়েছে। এভাবে আচরণের নিয়মগুলো জানা গেলো বটে কিন্তু সেগুলো কেন হচ্ছে তার কারণ জানা যায়না। এই কারণ আবিষ্কার করার জন্যই আন্দাজ করা কল্পতত্ত্বের প্রয়োজন হয় এবং সেই তত্ত্বকে বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। ওই তত্ত্ব দিতে গিয়েই কল্পনার প্রয়োজন হয়েছে, ওখানেই কারো কারো কাছে এর কোন কোন বিষয়কে রূপকথার মত মনে হতে পারে, যেহেতু এগুলো অদৃশ্য ও অদ্ভুত জিনিস নিয়েও হয়ে থাকে। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোকে বাস্তব কিছু বলে মনে না হয়ে চমকপ্রদ অদ্ভুত রূপকথার জিনিস মনে হওয়াটি স্বাভাবিক।

ওই গবেষণায় দেখা বাস্তব ঘটনা ও আচরণগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে এবং সেগুলো সফল ভাবে ব্যাখ্যা করতে না পারলে ওপরে দেয়া রূপকথা ও বিজ্ঞানের কথার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতোনা। ফ্রাঙ্কলিন যে সব জিনিসের মধ্যে চার্জ নামের অদৃশ্য তরল থাকার কথা বলেছেন সেটি মনের মাধুরি মিশিয়েই বলেছেন, কোথাও সে রকম কোন তরল তিনি বা আর কেউ পরোক্ষ ভাবেও অনুভব করেননি। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ অন্য রকম কল্পনাও করছিলেন– কাজেই এর সঙ্গে রূপকথার কল্পিত জিনিস যেমন ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাওয়া দৈত্য, ব্যাঙমা-ব্যাঙমী ইত্যাদির মিল আছে বৈ কি! শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কলিনের এই কল্পনা ধোপেও টেকেনি, কারণ বহু পরে বিজ্ঞানীরা চার্জকে তরল হিসেবে নয়, কণিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাও এক প্রকার নয়, দুই প্রকারের। তবে ফ্রাঙ্কলিনের কল্পনাটি অন্যদের পরবর্তী কল্পনাকে আরো সত্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, এবং এক পর্যায়ে ঘটনার ব্যাখ্যায় অবদান রেখেছে, যদিও পরের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এই দুই রকমের কণিকা ও তাদের মধ্যেই আকর্ষণ-বিকর্ষণের কল্পনাটি আরো বেশি ও সঠিক অবদান রেখেছে। তাই আজ পর্যন্ত সেটিই টিকে আছে।

আঠারো শতকে এসে ওই চার্জের কল্পনার সঙ্গে যোগ হয়েছে বলের সূতা, বিদ্যুৎ ক্ষেত্র এসব কল্পনা; একই ভাবে চুম্বক মেরুর সঙ্গেও বলের সূতা ও চুম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদির কল্পনা এসেছে– তাও দেখা আচরণগুলো ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনে। সব মিলিয়ে বিদ্যুতের ও চুম্বকের কল্পিত রাজ্যটাই বড় অদ্ভুত; আরো অদ্ভুত হয়েছে যখন বলা হলো বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওখানে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, আর চুম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। মোটর নীতিতে এবং জেনারেটর নীতিতে সত্যি সত্যি চুম্বক ঘোরার এবং বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি হবার যে ব্যাপারটি যখন হাতেনাতে ঘটতে দেখা যায় তার ব্যাখ্যা করতে ওই রকম অদ্ভুত ভাবে ক্ষেত্র সৃষ্টির অদৃশ্য বিষয়গুলো কল্পনা করা হয়েছে। তবে বলের রেখা যাকে আমরা সূতা বলেছি, এবং ক্ষেত্র ইত্যাদির যে চিত্র ফ্যারাডে খাড়া করেছিলেন তা অনেকটা ভৌত যান্ত্রিক একটি কল্পনা, পরে ম্যাক্সওয়েল তাঁর সমীকরণে এগুলোকে আর ওভাবে দেখেননি, দেখেছেন অনেকটাই গাণিতিক কিছু সত্বা হিসেবে যা চার্জ বা মেরুর চারিদিকের প্রতি বিন্দুতে বলের পরিস্থিতিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাঁর কাছে ফ্যারাডের যান্ত্রিক কল্পনাকে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য মনে হয়েছে– যেন যত কম কল্পনা করে পারা যায় তত ভাল। বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হলো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় মূল মর্মকথাটিতে চলে যাওয়া, বাহুল্যকে বাদ দিয়ে। গণিত বিজ্ঞানীর জন্য এমনি মর্মকথা।

বিজ্ঞানীর তত্ত্ব যে রূপকল্পের মাধ্যমে শুরু হয় তাকে বিজ্ঞানী বা অন্য কেউ কখনো রূপকথা বল্‌বেননা, কারণ যেই সুকুমার-কলার (আর্ট) প্রেরণা থেকে রূপকথা সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানের রূপকল্প সেই প্রেরণা থেকে হয়না, বরং একটি বাস্তব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রেরণা থেকে হয়। দৃশ্য জিনিসের পেছনে সত্যি সত্যি কী অদৃশ্য জিনিস থাকতে পারে সেটি উদ্ঘাটন করা তাঁর চেষ্টা। কাজেই তাঁর প্রথম রূপকল্প সফল না হলে, অর্থাৎ ওর থেকে যা যা হওয়া উচিত তার সব কিছু যদি বাস্তব পরীক্ষায় না পাওয়া যায়, তার ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবে না ফলে, তা হলে কল্পিত রূপকল্পটি গ্রহণযোগ্য হয়না। তখন ওটি বাদ দিয়ে নতুন কিছু কল্পনা করে এগুতে হয়। অন্যদিকে রূপকথার কল্পনাকে এরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়না। শৈশবে বা তারপরও যে সব রূপকথা আমরা শুনি তা একবার পরিচিতি লাভ করে গেলে আর তেমন বদলায়না। বদলাবার জন্য কোন চাপ থাকেনা, যেহেতু তাকে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন আগে পরে কখনো হতে হয়না, একই রূপকথা যুগ যুগ ধরে সকল শিশুদের জন্য একই থেকে

যেতে পারে। ওই রূপকথা নিয়ে কখনো তর্ক-বিতর্ক হয়না, মতবিরোধ হয়না, কারো রূপকথা অন্যের রূপকথার থেকে বেশি সঠিক কিনা সেই প্রশ্নও ওঠেনা। বিজ্ঞানের রূপকল্পের ক্ষেত্রে এগুলোর সবই হয়, এবং তা হতেই থাকে। ফলে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকার পরেও ওটি বদলে যেতে পারে।

তাই বলে বিজ্ঞানের রূপকল্প কি ছেলে ভুলানো রূপকথার থেকে কম অদ্ভুত বা কম চমকপ্রদ? বরং যুক্তিতে, গণিতে এবং সর্বোপরি বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত বলে এগুলো আরো বেশি চমকপ্রদ। এই শেষেরটি না হলে এটি গ্রহণযোগ্য হয়না এবং পরিণামে পরিত্যক্ত হয়। তবে কোন কোন সময় যুক্তির ও গণিতের সৌকর্যে ওগুলো এমন সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে যে বাস্তব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক দিন অপেক্ষা করতে রাজি থাকেন। তার কোন কোনটির কথা আমরা দেখবো। তবে সব রূপকল্পের এই সৌভাগ্য হয়না, বিজ্ঞানীরা চান যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারার আগে তাদেরকে বাস্তব পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তারপরও পরীক্ষার পালা কখনো শেষ হয়না; যতদিন তত্ত্ব হিসেব টিকে থাকবে তাকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে পরীক্ষা দিয়েই চলতে হবে। তার মধ্যে কোনটিতে ব্যর্থ হলে বহু দিন পরে হলেও সে তত্ত্বকে বিদায় নিতে হবে, বা অন্তত সীমিত হয়ে যেতে হবে।

তবে সাফল্যের ওপর কোন কথা নেই। যত অদ্ভুত রূপকথার মতই মনে থেকে না কেন আমাদের উদাহরণে যেই চার্জ, মেরু, ক্ষেত্র, তরঙ্গ ইত্যাদির কল্পনা করা হয়েছে সেগুলো আজ অবধি অত্যন্ত সফল। তাদেরকে ছাড়া অসংখ্য জিনিসের ব্যাখ্যা চলেনা। বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের, চৌম্বক বিজ্ঞানের, আলোক বিজ্ঞানের, ইলেকট্রনিক্সের, টেলিযোগাযোগের মত এমনি ধারার যত রকমের আধুনিক সত্যিকারের সব কিছু ঘট্‌ছে তার সব কিছু একমাত্র ওই কল্পিত জিনিসগুলোর ওপর নির্ভর করেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অন্য কোন ভাবে নয়। তাহলে রূপকথাই বলি, রূপকল্পই বলি, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই বলি তাদেরকে বিশ্বাস না করে উপায় কী? সব দেখা জিনিসের মত এগুলোকেও সত্য বলে মানতে হয়।

### রূপকথার আমেজের আরেকটি উদাহরণ–
### মহাদেশগুলোর ঘোরাফেরা

এই রূপকথাটি অন্য ধরনের রাজ্যের কাহিনী। গালিভারের গল্প দিয়ে চিন্তা করলে এটি ক্ষুদ্র লিলিপুটদের রাজ্য নয়, বরং বিশাল ব্রোবডিংনাগদের রাজ্য।

অর্থাৎ এটি বস্তুর ভেতরের অদৃশ্য কণিকার রাজ্য নয় বরং রীতিমত দৈত্যদের রাজ্য– গোটা সব মহাদেশকে নিয়ে। এই মহাদেশগুলো যার যার মত করে এক এক দিকে খেয়ালখুশি মতো চলেছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে দেখা পুরো কলকাতা শহরের চলার সঙ্গে তুলনায়:

চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে

• • •

লক্ষ লক্ষ লোক বলে "থামো থামো
কোথা হতে কোথা যাবে একী পাগলামো"

তবে কলকাতাতো একটি শহর মাত্র, এ রাজ্যে যারা চলে তারা আস্ত আস্ত মহাদেশ তো বটেই তার সঙ্গে সংযুক্ত মহাসাগর তলেরও এক অংশ সহ। আর রবীন্দ্রনাথের কলকাতার মত এটি হন হন করে এক রাতের মধ্যেই অনেক এগিয়ে যাচ্ছেনা, এত আস্তে যাচ্ছে যে তা অনেক বছরের যাত্রায় শুধু এদের গতি চোখে পড়তে পারে। কেউ এমন স্থান পরিবর্তন নিজে দেখেছে বলতে পারবেনা, তবে যাত্রার ভঙ্গিটি ওরকমই, কোথা থেকে কোথা যাবে কোন ঠিক নেই চল্‌ছে তো কোটি কোটি বছর ধরে চল্‌ছেই। এর মধ্যে হাজার মাইল দূরে চলে যায় ওই দৈত্যাকার জিনিসটি। আগে যদি থাকতো শীতের দেশে, এখন চলে এসেছে গরমের দেশে। সমুদ্রের তলায় দীর্ঘ সব ফাটল দিয়ে গলিত সব শিলা এত জোরে উঠছে যে দু পাশের দিকে তার ঠেলায় ওই দৈত্যের মত ভূমিগুলো সরছে একটু একটু করে- ওই ফাটলের দ্বারা ওটি দুভাগ হয়েছে বড় বড় দুই দৈত্যে। এসব মহাদেশের জগতের কথা, ওই দৈত্য সাইজের জিনিসের কথা। এদের এই ঠেলা খেয়ে দুইটি দুদিকে যাওয়া অতি প্রচণ্ড বলের ব্যাপার, এখানকার ভূমির গভীরকে উত্তপ্ত ও উতাল পাতাল করে ফেলার মত। তা সত্ত্বেও এই বিশাল দৈত্যের পুরুত্ব খুব বেশি নয় সে তুলনায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এত বিশাল যে একে এক রকম প্লেইট হিসেবে দেখা যায়। নাম প্লেইট হলে কী হবে এ বিশাল জগদ্দল জিনিস যার ওপর স্থলের সবাই আমরা আছি, সমুদ্রের পানিও আছে। প্লেইট কিন্তু দুটি নয়, এমনি বিশাল বেশ কয়েকটি।

এই কিনারায় দুটি এরকম বিশাল প্লেইট একে অন্য থেকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু এর ফলে উভয় প্লেইটের অন্য কিনারা হয়তো এমনি আরেকটির কিনারার কাছে চলে যাচ্ছে– যখন সত্যি সত্যি সেখানে পৌঁছে তখন কাছে আসা যে কিনারার ভার বেশি তা অন্যটির তলায় গিয়ে ঢোকে। এও কিন্তু দৈত্য সাইজের

বিরাট ঘটনা। তলায় ঢোকার গরমে এর পাথরও গলে যায়– কাজেই ওই গলন্ত উদগীরণ এখানেও ঘটতে পারে– আর দৈত্যের নড়ে চড়ে ওঠা বিশাল এলাকাকে কাঁপিয়ে তুলে, ভেঙ্গেচুরে, এমনকি সমুদ্রের কাছে ঘটলে সেখানে এমন অত্যন্ত উঁচু ঢেউ বিশাল জায়গা জুড়ে তোলে যে স্থলের কিনারারও অনেক খানি সাময়িক ভাবে ডুবে যায়। সেই দুই দৈত্যের কিনারার ভার যদি একই হয় তা হলে কেউ কারো নিচে না গিয়ে বরং প্রচণ্ড রকম ঠেলার চাপ সৃষ্টি করে একে অপরের ওপর– জাপানি দুই মস্ত মোটা সুমো কুস্তিগীর যেমন পরস্পরকে প্রচণ্ড ঠেলা দিয়ে ঠাঁই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে কেউ কাউকে নাড়াতে না পারার কারণে। কিন্তু ওই দৈত্যদের ক্ষেত্রে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেনি ঠেলার চোটে মাঝের জায়গাগুলো কাদার মত নরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। এও এক বড় ঘটনা– বিশাল পর্বতমালা সৃষ্টি। এই রূপকথার মহাদেশগুলোর জগতে যেন তাদের ওই খেয়ালখুশিতে নড়াচড়া ঘোরাফেরার মাধ্যমে অতি বড় বড় ঘটনার জন্ম ওরা দিচ্ছে। হ্যাঁ এর কিছু ঘটনা আমরা না দেখে উপায় নেই ভূমিকম্প, সুনামি বা আগ্নেয়গিরির মত এতই ধূম ধাম করে দ্রুত এগুলো হচ্ছে, হয়তো বহু মানুষ ও বহু সম্পদ নষ্ট করে। কিন্তু পর্বত সৃষ্টির মত ঘটনা এতো অল্প অল্প করে হচ্ছে যে সহজে খেয়াল করার উপায় নেই, যেমন উপায় নেই দৈত্যদের ওই চলা ফেরাটিও যখন ঘটছে তখন খেয়াল করার। তবে এই সবইতো বিজ্ঞান রূপকথার রাজ্য, তাই বহু বছরে যে অনেকখানি সরে যাচ্ছে মহাদেশ, আর অনেকখানি পর্বত গজিয়ে ওঠছে সে সব আমরা জানি।

বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে নিয়েই এই গল্পকে রূপকথার মত করে বলেছি। তবে বিজ্ঞানের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বছরে ঘটা ঘটনাগুলো রূপকথার মত এমনিতে জানি বলার উপায় নেই। বিজ্ঞানী শুধু তাঁর সামনে যা ঘটছে তাই দেখেন, বাকি কথা তাঁকে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলতে হয়। তবে সেই সঙ্গে তাঁকে জোরালো কল্পনারও পরিচয় দিতে হয় আগে কী হয়েছিলো তা আন্দাজ করতে এবং সেই আন্দাজের ফলাফলগুলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সামনে আনতে। ওইখানেই বিজ্ঞানেও রূপকথার আমেজ চলে এসেছে– ওই কল্পনার মধ্যে। মহাদেশের ঘোরাফেরা নিয়ে প্রথম এমন আন্দাজ করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী ভেগনার বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। খুব সাধারণ একটি জিনিস লক্ষ্য করেই তাঁর মনে এমন চিন্তার উদয় হলো– স্রেফ পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে, বিশেষ করে গ্লোবের ওপর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে। মহাদেশের কিনারাগুলো দেখে মনে হলো যে কাছাকাছি থাকা দুটি মহাদেশকে আরো কাছাকাছি এনে যদি একটার সঙ্গে

আরেকটি ফিট করানোর চেষ্টা করা হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটির সঙ্গে আরেকটি এমন নিখুঁত ভাবে মিশে যায় যেন এগুলো সব আগে কখনো একই অখণ্ড মহাদেশের অংশ ছিল, পরে কোন কারণে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে সরে গিয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। এ যেন বাচ্চাদের জিগ-স' পাজলের মত।

আইডিয়াটি মাথায় আসার পর তিনি আরো কিছু তথ্য লক্ষ্য করলেন– ওভাবে ফিট করা অখণ্ড মহাদেশে আজকের ভিন্ন মহাদেশের যে সব জায়গা তখন পাশাপাশি থাকার কথা আজ যদি সেখানকার শিলাস্তরের খবর নিই, দেখি যেন দুপাশের শিলাস্তর প্রায় একই; একই ভাবে ওই দুই জায়গার প্রাণী ও উদ্ভিদের খবর নিলেও যথেষ্ট মিল দেখা যায়। আজ এই দুই জায়গা পরস্পর থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, বহুকাল ধরে তারা বিচ্ছিন্ন; তারপরও অতীতে যেহেতু উভয়ে পাশাপাশি সংলগ্ন থেকে একই শিলা, উদ্ভিদ, প্রাণী ছিল আজ বিচ্ছিন্ন দু'জায়গায় ভিন্ন ভাবে নানা পরিবর্তনের পরেও মূল মিলটি যথেষ্ট বজায় রয়েছে। কাজেই এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ভেগনার কল্পনা করতে পারলেন অতীতে সব মহাদেশ এক মহাদেশ (নাম দেয়া হলো প্যানজিয়া) হিসাবে ছিল, ভেঙ্গে গিয়ে কয়েক টুকরা হয়ে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক সরে গিয়েছে। অল্প সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কল্পনা করলে সত্য নাও হতে পারে, সত্য বলে মেনে নিতে আরো নানা দিকের সাক্ষ্য মিলতে হবে। যেমন একটি প্রশ্নের ভাল উত্তর পেতে হবে- এত জগদ্দল যে অভিন্ন মহাদেশ তা ভেঙ্গে যাওয়ার আর এত জগদ্দল ভারী টুকরাগুলোর সরে যাওয়ায় প্রচণ্ড শক্তি কোথা থেকে আসলো। ভেগনার যে উত্তর দিতে পারলেন তা গ্রহণযোগ্য হলোনা, তাই আপাতত ওখানেই কল্পনার অবসান ঘটলো।

কিন্তু কয়েক দশক পরে গিয়ে নতুন সাক্ষ্য পাওয়া গেলো। ১৯৫০ এর দিকে এসে জাহাজে ও সাবমেরিনে চড়ে সমুদ্র তলের খুব বিস্তারিত জরিপে ওখানে পর্বতমালা, আগ্নেয়গিরি, খাদ, ফাটল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হলো। এবার মহাদেশের চলাফেরার পেছনের একটি যথাযথ শক্তির উৎস ওখানেই আবিষ্কৃত হলো, দেখা গেলো মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর দক্ষিণ বরাবর এক দীর্ঘ ফাটল দিয়ে ক্রমাগত লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়ে দু পাশে জমছে– এর উৎক্ষেপন শক্তি এত বেশি যে তাতে সমুদ্র তলের ওই ভূমি পুরোটাই ফেটে দুদিকে সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট, প্লেইটের আকৃতির পুরো ভূত্বককে নিয়ে। এমন ঘটা যে সম্ভব হিসেব কষে তা বোঝা গেল। পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের দিক বহু হাজার

বছর পর পর উল্‌টে যায় এমন প্রমাণ রয়েছে। গলন্ত লাভা যখন ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধে তখন তখনকার চুম্বক ক্ষেত্রের দিক ওখানে স্থায়ী হয়ে যায়। ওই দিক্‌গুলো দেখে বোঝা গেলো সমুদ্র তলের ফাটল দিয়ে ওঠা লাভা যেখানে যা জমেছে তা কবে জমেছে। দেখা গেলো এখন ফাটল থেকে যত দূরে শিলা তত পুরানো; ফাটলের কাছে সদ্য ওঠা যে লাভা তা ফাটলের কাছে জমছে, ওটিই কালক্রমে ফাটল থেকে দুপাশের দিকে দূরে সরে গেছে। এর মানে ভূত্বকের এই দুটি প্লেইট ক্রমাগত সরছে ওই লাভা উৎক্ষেপনের ফলে। এখানে মনে রাখতে হবে যে ভূত্বক, অর্থাৎ এই প্লেইটগুলো চটটটে এক রকম উত্তপ্ত তরলের ওপর ভাসে, তাই নড়াচড়া সম্ভব।

এভাবে নানা সাক্ষ্য যখন পাওয়া গেলো একটি প্লেইটের অংশ হিসেবে মহাদেশের ঘোরাফেরার কল্পনাটি এবার গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠ্‌লো। ওই কল্পনা থেকেই এলো আরো কল্পনা– প্লেইটের অন্য কিনারা আরেকটি প্লেইটের কিনারার কাছে পৌঁছে তার তলায় ঢুকে পড়া, ঢুকলে কী কী হতে পারে তারও কল্পনা। এসব শুধু কল্পনার ঘুড়ি উড়িয়ে নয় বরং একেবারে হিসেব নিকেষ করেই আন্দাজ করা হলো– মৌলিক যে বিজ্ঞানের নিয়মগুলো ইতোমধ্যে আছে তার ভিত্তিতেই হিসেব নিকেষ। এসব হিসেবের ভিত্তিতে ও আজকের পরিস্থিতি থেকে কল্পনা করা গেলো কয়টি প্লেইটে এভাবে বিভক্ত ভূ-ত্বক, কী কী সেই প্লেইট। আজকে ভূতাত্ত্বিক যে ঘটনাগুলো ঘটছে বা আগে যা ঘটেছে বলে স্পষ্ট চিহ্ন আছে সেগুলোকে এখন ওই প্লেইটগুলোর আচরণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই প্লেইটগুলো, তাদের ভাসা, তাদের চলা, তার অন্যান্য আচরণ এর সবই কল্পনা– কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে দু'এক মাইলের বেশি আমরা কখনো ঢুকতে পারিনি; ওখানে কী আছে, কী হচ্ছে সবই পরোক্ষ পরীক্ষা নিরীক্ষায় শুধু জানতে পেরেছি। কিন্তু ব্যাখ্যা ঠিকই করা হয়েছে দুই প্লেইটের মাঝখানের ফাটল দিয়ে লাভা উৎক্ষিপ্ত হওয়া, একটি কিনারা অন্যটির তলায় ঢুকে পড়া, একটি অন্যটিকে ঠেলা দেয়া, একটি অন্যটিকে ঘেঁষে চলে যাওয়া এই সবের ভিত্তিতে। যদিও তা সব কল্পনা, কিন্তু জানা তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি গাণিতিক মডেল তাতে সমর্থন দিচ্ছে। প্রত্যেকটির ফলাফল ভিন্ন– কিন্তু তাদের দ্বারাই বর্তমানে ও আগে ঘটা সব ভূতাত্ত্বিক ঘটনার নিখুত ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প, সুনামি, আগ্নেয়গিরি, গভীর খাদ সৃষ্টি, দ্বীপ সৃষ্টি, এটল-লেগুন (রিং এর মত দ্বীপ এটল, তার মাঝখানে হ্রদ লেগুন) সৃষ্টি, পর্বতমালা সৃষ্টি ইত্যাদি সব কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। এভাবেই গড়ে ওঠেছে শক্তিশালী

প্লেইট টেকটোনিক থিওরি। নতুন নতুন ঘটনাকেও এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এবং এসব বেশি ঘটার সম্ভাবনাগুলোর কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণীও করা যাচ্ছে বলেই তত্ত্বটি এত শক্তিশালী। শুধু তাই নয় অষ্ট্রেলিয়ার প্রাণী ও উদ্ভিদ কেনো অন্য সব মহাদেশ থেকে ভিন্ন সে রকম প্রশ্নের সমাধানও এর দ্বারা হলো।

প্লেইট টেকটোনিকের পেছনের গল্পে যে মহাদেশ যখন পৃথিবীর যে অঞ্চলে থাকার কথা সেখানেই থাকার সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া গেলো। উদাহরণ স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়া যে সময় আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল তখনো স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের আজকের রূপ লাভ করেনি- তার পূর্ব অবস্থায় ছিলো। ওদের থেকে পরে তিনটি আলাদা রকমের স্তন্যপায়ী বিকশিত হয়েছে– ডিম দেয়া স্তন্যপায়ী, অপরিপক্ক বাচ্চা দেয়া স্তন্যপায়ী এবং মায়ের গর্ভে সম্পূর্ণতা লাভ করা স্তন্যপায়ী। অষ্ট্রেলিয়ার আলাদা হয়ে যাওয়ার পর সেখানে যে স্তন্যপায়ীর বিকাশ ঘটেছে তাদের জন্ম হয় অত্যন্ত ছোট ও অপরিপক্ক অবস্থায়, তারা এর পর মায়ের পেটে একটি থলেতে আরো বহুদিন কাটিয়ে বাইরে চলার উপযুক্ত হয়। ক্যাঙ্গারু, কোয়ালা, ওয়াম্বাট ইত্যাদি অষ্ট্রেলিয়ার এমনি স্তন্যপায়ীকে বলা হয় মারসুপিয়াল। প্লাটিপ্লাসের মত ওখানকার দু'একটি স্তন্যপায়ী তো ডিম থেকেই জন্ম হয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া বিচ্ছিন্ন হবার পরই আফ্রিকায় ও এশিয়া-ইউরোপে স্তন্যপায়ীর বিকাশ ঘটেছে– এবং তা অন্যভাবে। এতে বাচ্চা মায়ের গর্ভেই যথেষ্ট বড় হয় নাড়ী ও ফুলের (প্লাসেন্টা) মাধ্যমে মায়ের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এবং পূর্ণাঙ্গ হয়েই পরে জন্ম নেয়, তাদেরকে বলা হয় প্লাসেন্টাল। আজকে প্রাণীদেরকে দেখে অতীতের তাদের পূর্বসূরীদের ফসিল দেখে প্রাণীর বিকাশের এই কাহিনীকে সম্পূর্ণতা দেয়া গেছে এবং মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হবার কাহিনীর সঙ্গে তার সাযুজ্য ঘটতে পেরেছে। এসব সাযুজ্য সুন্দর ভাবে ঘটতে পেরেছে বলেই ওই কাহিনী, ওই গল্প, ওই রূপকথার আমেজ যাই বলিনা কেন সেগুলো সার্থক হয়েছে– বিজ্ঞান হয়েছে।

দুই দৈত্যতুল্য মহাদেশের ঠোকাঠুকিতে হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে এমন কথাতো রূপকথাতে বলাই যায়– কিন্তু এখানে তা বিজ্ঞানেই বলা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য দুদিকের কত বিশাল চাপের মাঝখানে পড়লে শিলা কতখানি নমনীয় হয় সেই বৈজ্ঞানিক আচরণের প্রমাণ দরকার হয়েছে। হিমালয়ের আশেপাশে কোন সমুদ্র না থাকা সত্ত্বেও এখানে প্রাচীন সামুদ্রিক মাছের ফসিল পাওয়াটার সঙ্গে কখন ভারত প্লেইট ও এশিয়া প্লেইটের

মাঝখানের সমুদ্র উভয় প্লেইট সংলগ্ন হবার কারণে বুজে গিয়েছে তার সন-তারিখের হিসাব মিলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। এজন্যই রূপকথার মত শোনালেও, রূপকথার মত কল্পনার গুরুত্ব থাকলেও, বিজ্ঞান রূপকথা নয়। অনেক ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি রূপকথার মত কাহিনী মানুষের বিশ্বাসে থাকে। যেমন প্রাচীনকাল থেকেই বজ্রের গর্জনকে মনে করা হতো স্বর্গলোকে আকাশে দুই প্রচণ্ড শক্তিশালী দেবতার মল্লযুদ্ধের পরিণতি, আকাশে বিজলির চমকানিও সেই মল্লযুদ্ধের ফলে। পরে বিজ্ঞান এসে তার দৃষ্টিও ওখানেই রেখেছে মেঘে মেঘে ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে বজ্র ও বিজলি সৃষ্টি হচ্ছে। মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চার্জ জমা এবং এরকম চার্জের পার্থক্যের কারণে এসবকে ব্যাখ্যার ব্যাপারটি ওখান থেকে ধীরে ধীরে এগিয়েছে নানা কল্পনা ও পরীক্ষার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া এখনো ক্রমে সঠিকতর হচ্ছে, এর ওপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও। দুই দেবতার মল্লযুদ্ধের রূপকথার সঙ্গে দুই মেঘের চার্জ বিনিময়ের বিজ্ঞানকে তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় বিজ্ঞান কেন অন্যরকম মহাকাব্য।

### আরো একটি উদাহরণ- সন্তান কেন বাবা-মা'র মত

প্রশ্নটি অনেক পুরানো, তাই উত্তর দেবার চেষ্টাও হয়েছে প্রাচীন কাল থেকেই। সন্তান জন্মের পর তার সঙ্গে বাবা ও মা'র চেহারা, এমনকি স্বভাবেরও মিল দেখে গোড়া থেকেই মানুষ চমৎকৃত হয়েছে। একই রকম ঘটনা তারা অন্যান্য প্রাণীতে ও উদ্ভিদেও দেখেছে। কাজেই এর কারণ নিয়ে প্রচুর রূপকথার জন্ম হয়েছে। আগাগোড়া রূপকথার আদলেও অনেক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে– যদিও তাকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলে চালানো হয়েছে। আর সব প্রাণী আর উদ্ভিদের জন্য একই রকম ব্যাখ্যা দেয়ার কথাও তাঁরা খুব একটা চিন্তা করেননি, যদিও আসলে ঘটনাটি একই রকমের। কৌতূহল বেশি ছিল মানুষের নিজেকে নিয়ে, তার বংশধররা কীভাবে পূর্বপুরুষের বৈশিষ্টগুলো পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ এরিস্টোটল যখন বলেছেন যে এটি বাবার রক্ত থেকেই সন্তানরা পায়, মায়ের ভূমিকাটি নেহাৎ গৌণ তাঁর এসব তত্ত্ব রূপকথার অতিরিক্ত কিছু ছিলনা। কেন শুধু বাবা, কেন রক্তের মাধ্যমে, এসব নিয়ে তাঁর বক্তব্যে গল্পের আমেজ থাকলেও যুক্তি-প্রমাণ তেমন ছিলনা। পুরো বিষয়টিই রূপকথার মতই চল্‌ছিলো। আধুনিক যুগের মধ্যে এসেও কোন কোন বিজ্ঞানী যখন বাবার শুক্রকোষের ভেতরে সন্তানের পুরো দেহটারই একটি ক্ষুদ্র মূর্তি লুকিয়ে আছে মনে করেছেন সেটিও রূপকথার অতিরিক্ত কিছু ছিলনা। তাঁরা এমনকি ওই ক্ষুদ্র

সন্তানের মধ্যে তার শুক্রকোষে তারও সন্তান, এবং তারও শুক্রকোষে তারও সন্তান এমনি পর্যায়ক্রমে অসীমভাবে লুকানো আছে বলে মনে করতেন, এমনি সবই কল্পনার ফানুস ওড়ানো। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে কল্পনাও কিছু সংযত রূপ পেলো– সেটি সতরো শতক থেকে। তার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত কিছু তত্ত্ব এলো। এজন্য আমরা চলে যাই জিনের রাজ্যে।

এই নতুন গল্পটি বলে যে কোন জীবের বাবার জনন কোষে থাকে কিছু জিন নামের কণা; প্রত্যেকটি জিন সন্তানের দেহের বা স্বভাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্টকে নিয়ে। তেমনি মায়ের জনন কোষেও ঠিক ওই প্রত্যেকটি বৈশিষ্টের জন্য একটি জিন থাকে। একই বৈশিষ্টের জিনের দুই বা তার বেশি রূপ থাকতে পারে। সন্তান জন্মের সময় সন্তান একই বৈশিষ্টের দুটি জিন পায়– একটি বাবার থেকে ও একটি মায়ের থেকে। এই উভয় জিনের একই রূপও হতে পারে, ভিন্ন রূপও হতে পারে। দুটি রূপের মধ্যে একটির প্রাধান্য বেশি থাকে বলে সন্তানের মধ্যে সেটিই প্রকাশিত হয়– সন্তান ওটির বৈশিষ্ট পায়। প্রধান রূপটি যদি বাবা-মা কারো থেকে না আসে তা হলে সন্তান শুধু অপ্রধান রূপটিরই দুই কপি পায় বলে সেটিই প্রকাশ করে। এটি হবে অপেক্ষাকৃত কম সম্ভাবনার। কাজেই কোন বৈশিষ্টের একটি রূপ (প্রধান রূপ) বেশি দেখা যায়, অন্যটি কম দেখা যায়। এই প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের বংশগতি নিয়ে জিন জগতের এটিই মূল রূপকথা। ওই জিন কেউ কোনদিন দেখেনি, তার এক রূপ আর অন্য রূপের পার্থক্য দেখারও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। ধরেই নেয়া হয়েছে এগুলো অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য জিনিস। তবে তাদের কাজ সম্পর্কে এক রকম ম্যাজিকের মত ধারণা আছে। যেমন চুলের রঙের কথা ধরা যাক। একটি জিনের কাজ হচ্ছে সন্তানের চুলের রঙ ঠিক করে দেয়া। কোন গল্পে এর দুটি রূপ থাকতে পারে– একটি রূপ চুলকে কালো রং দেয়, আরেকটি রূপ খয়েরী রং। কালো হওয়াটার প্রাধান্য আছে। তাই বাবা ও মায়ের কোন্ রূপটি আছে সে অনুযায়ী সন্তানের কালো বা খয়েরী চুল হবে। কালো হবার সম্ভাবনা বেশি দুটি জিনই খয়েরী না হলে চুল খয়েরী হবেনা। গল্পের এই জিনের যেন এক রকম ম্যাজিকের মত ক্ষমতা আছে সন্তানের চুল ঠিক করে দেবার। জিন দেখা যায়না, কিন্তু তার সৃষ্ট চুলের রঙ দেখা যায়।

একই রাজ্যের বিজ্ঞানের কথায় যদি আসি মূল গল্পটি কিন্তু এখানে অন্য কিছু নয়। পার্থক্য হলো গল্পটি কী ভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার ওপর। এরিস্টটলের

রক্তের গল্পে অথবা জনন কোষে ক্ষুদ্র সন্তান থাকার গল্পে যেমন কোন সীমারেখা ছিলনা, জিনের গল্পেও তা না থাকতে পারতো, সেভাবেই গল্পটি চালু হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু এটি সত্যিকার বিজ্ঞান হিসেবে এসেছে বলে ওভাবে যেমন তেমন কল্পনা আর সম্ভব ছিলনা। ওটা শুরু করেছিলেন ম্যান্ডেল– মটরশুটির মত একটি সরল উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করে। তিনি তাঁর বাগানে এমন মটরশুটি গুলো আলাদা করলেন যাদের স্ত্রী-পুরুষের মিলনে মসৃণ বীজ ও কুঁচকানো বীজ উভয় রকম হতে পারে। তিনি দেখলেন গড়পড়তা চার ভাগের তিন ভাগ বীজ মসৃণ হচ্ছে, আর চার ভাগের এক ভাগ কুঁচকানো হচ্ছে। এর থেকেই তিনি তাঁর তত্ত্বটি আন্দাজ করলেন– ওই জিনের তত্ত্ব। জিন এক রকম কণা হবার কথা, এই বিশেষ জিনটির হয় মসৃণ, নয় কুঁচকানো এই দুই রূপের কথা, এই দুটি মিশে না যাবার কথা, মসৃণটির প্রাধান্য থাকার কথা ইত্যাদি তিনি কল্পনা করলেন। বাস্তবে মটরশুটির ক্ষেত্রে যা দেখ্ছিলেন সেটি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এমন কল্পতত্ত্ব। মটরশুটির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এসব আন্দাজ করলেও তিনি এবং পরে অন্যরা আরো বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে তাঁর তত্ত্বটি সফল ভাবে খেটে যেতে দেখলেন– বিভিন্ন গুণের এই রূপ কত সন্তানে আর ওই রূপ কত সন্তানে দেখা যাবে তা হিসেবের সঙ্গে মিলে গেলো। তিনি ওইটুকুই শুধু পেরেছিলেন– জিন জিনিসটি আসলে কিসের তৈরি, এটি কী ভাবে তার কাজ করে, জনন কোষের কোথায় সেটি থাকে এসব কিছুই তাঁর জানা হয়নি। সেগুলো বিজ্ঞান ধীরে ধীরে এরপর আবিষ্কার করেছে।

জিন দেখা না গেলেও পরে বোঝা গেলো এটি থাকে সব কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোমোজোম নামের কিছু সূতার মত বান্ডিলে বেশ কয়েকটি ক্রোমোজোমে। এই ক্রোমোজোমকে অনুবীক্ষণের তলায় দেখা গেলো। আরো কিছু আন্দাজ করার সূত্র পাওয়া গেলো সরল কিছু প্রাণীর নানা গুণ কী রূপে সন্তানের কাছে যায় তা দেখে। যেমন ফলের মাছির বাবার চোখ ও মায়ের চোখের মধ্যে কারটি কালো কারটি লাল, কোন্ সন্তান সেই রং পাচ্ছে– ওই সন্তান কি পুরুষ না স্ত্রী– এমন পর্যবেক্ষণ থেকেও অনেক কিছু আন্দাজ করা সম্ভব হলো। কিন্তু গল্পের আসল কথাটাই তো অজানা রইলো, জিন জিনিসটি কী? তা সত্ত্বেও কিন্তু বিজ্ঞানের গল্প থেমে রইলোনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সব চাক্ষুষ ঘটনা দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে আন্দাজ করে করে ওটি এগিয়ে গেলো। যেমন কোন প্রাণীতে কোন্ গুণের সঙ্গে কোন্ গুণ্ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক সঙ্গে

বাস্তবে দেখা যায় বা যায়না সে সম্ভাবনার ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের এক রকম মানচিত্রই তৈরি করে ফেলা গেল– কোন্ জিনগুলো ওখানে পরস্পরের পাশাপাশি, কোন্গুলো অল্প দূরে কোন্গুলো বেশি দূরে। মানচিত্র আছে, কিন্তু জিনের ছবি নেই। কারণ জিনিসটি যে কী তাই এখনো জানা নেই।

অবশেষে এই সেদিন ১৯৪৪ সালে এসে এমনি ভাবে চাক্ষুষ এক্সপেরিমেন্ট থেকে বোঝা গেল জিন আসলে ডিএনএ নামের ইতোমধ্যে পরিচিত একটি রাসায়নিক অণু যা সব জীবের সব কোষের নিউক্লিয়াসেই পাওয়া যায়। ওই নিউক্লিয়াসে মূলত থাকে দু'রকমের জিনিস– প্রোটিন আর ডিএনএ। তাই জিনকে হয় প্রোটিন হতে হবে, নইলে ডিএনএ। দেখা গেলো নিউমোনিয়ার জ্যান্ত জীবাণু থেকে কিছু একটা জিনিস এক সঙ্গে থাকা মরা জীবাণুতে যেতে পারে এবং তাকে মারাত্মক নিউমোনিয়া সৃষ্টিতে সক্রিয় করে তুলতে পারে। সে অবস্থায় এটি ইন্জেকশন করা ইঁদুরকে নিউমোনিয়ায় মেরে ফেলতে পারে। ওই কিছু একটাই তো জিন, কিন্তু সেটি কি প্রোটিন না ডিএনএ? জীবাণুর পুষ্টি দ্রব্যের সঙ্গে এমন তেজস্ক্রিয় জিনিস মেশানো যায় যা শুধু জীবাণুর প্রোটিনে যায়। আবার এমনো অন্য তেজস্ক্রিয় জিনিস মেশানো যায় যা শুধু ডিএনএ তে যায়। ইঁদুরের দেহে ছড়িয়ে পড়া ওই আগের মরা জীবাণু যা তখন মারাত্মক জীবাণুতে পরিণত হয়েছে, দেখা গেলো তাতে প্রোটিনের নয়, বরং ডিএনএ'র তেজস্ক্রিয় চিহ্নগুলোই ধরা পড়েছে। বোঝা গেলো আগের জ্যান্ত জীবাণু থেকে জিন রূপে মরা জীবাণুতে যা সঞ্চারিত হয়েছে তা ডিএনএ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ডিএনএ অণুর রাসায়নিক গঠন জানা থাকলেও তার সত্যিকার ছবির মত অর্থাৎ গঠন কাঠামোটি তো তখনো জানা নেই। সেটি আবিষ্কৃত হলো ১৯৫৩ সালে। ওই আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা– কারণ তার মাধ্যমেই গল্পটি তর তর করে অনেক দূর চলে গেলো। এই গঠন কাঠামোই বলে দিতে পারে ডিএনএ কেমন করে জিন হিসেবে কাজ করে, গুণের বার্তা বহন করে।

এটি আবিষ্কার হলো চাক্ষুষ পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে। এক ধরনের এক্সরে ছবি পরোক্ষ ভাবে বলে দিলো লম্বা অণুর দুটি সূতা পরস্পর পেচানো থাকে ওতে। প্রশ্ন হলো কয়টি সূতা? দুটিও হতে পারে, তিনটিও হতে পারে। তিনটি সূতা প্যাচানো আর তার বাইরে বাদবাকি সব এমন আন্দাজ করলেন ঝানু বিজ্ঞানী লিনাস পলিং, আবিষ্কারটি প্রকাশও করলেন– কিন্তু দেখা গেলো সেটি ভুল। শেষ পর্যন্ত যাঁরা এই মস্ত বড় আবিষ্কার সত্যি সত্যি করলেন সেই ফ্রান্সিস

ক্রিক, জেমস ওয়াটসন, মরিস উইলকিন্স, রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন। তাঁরা রোজালিন্ডের তোলা আরো নিঁখুত এক্স রে ছবির ভিত্তিতে আন্দাজ করতে পারলেন সূতা দুটিই, আর উভয়ে পরস্পর সাপের মত পেচানো। এর ভিত্তিতে টেবিলের ওপর অণুটির রসায়নের তথ্য অনুযায়ী ধাতুর পাত, তার ইত্যাদি দিয়ে মডেল খাড়া করে তা নানা দিক থেকে অদল বদল করে দেখলেন অণুর বাকি গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর জায়গা ওই দুই সূতার পেচের মাঝখানেই হয়ে যাচ্ছে। আর জিন হবার জন্য সব থেকে জরুরি জিনিস হলো A,T,C,G এই অদ্যাক্ষরের ডাকনামে ডাকা কিছু ক্ষুদ্রাংশ যাদেরকে বলা হয় বেইস। এই চারটি বেইসের ক্রমটি, অর্থাৎ সূতার সঙ্গে কোন্‌টির পর কোন্‌টি বসে সেটিই ঠিক করে দিচ্ছে জিন কী বার্তা বহন করছে তা। যেমন ওই মটরশুটির ডিএনএ'র যেই অংশ তার বীজ মসৃণ হবে নাকি কুঁচকানো হবে তা নির্ধারণ করছে তা একটি জিন, তাতে ATCG এর ক্রমে সামান্য এদিক হলে বীজ মসৃণ হবে, অন্য রকম হলে কুঁচকানো হবে– অর্থাৎ জিনের সেই দুই রূপ।

তার মানে ডিএন'এর উদ্ঘাটিত ছবিতেই পাওয়া যাচ্ছে ম্যান্ডেলের সেই মটরশুঁটি থেকে আন্দাজ করা গল্প, এখন কিন্তু সব কিছু সবিস্তারে। অথচ কিছুই দেখা যায়নি, না ডিএনএ'র একটি অণু, না তার গঠন, না তার ভেতর বেইসক্রম। কিন্তু যে সব জিনিস দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তিতেই ওসবকে কল্পনা করা হয়েছে– এক ভাবে রূপকথার মতই তো। এই যে ডিএনএ বিশ্লেষণের জন্য একের ওপর আরেক সরু-মোটা নানা রেখার মত ডিএনএ প্রফাইল প্রায়ই আমরা ফটোর মত দেখি সেই দাগগুলো তো একটি ডিএনএ নয়, বরং প্রত্যেকটি দাগে বলা যায় লক্ষ লক্ষ ডিএনএ টুকরা জমা হয়েছে– টুকরার ওজন অনুযায়ী এক এক জায়গায় জমা হয়ে দাগগুলো তৈরি করেছে। লক্ষ লক্ষ একত্র হয়েছে বলে দাগ হিসেবে তবুও কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। অথচ ওই দাগগুলো বিশ্লেষণ করেই আমরা বল্‌ছি কারো ডিএনএ আমরা 'পড়ে' ফেলেছি। কারণ সেগুলো থেকে ডিএনএতে বেইসের ক্রম আমরা অনেকটা প্রত্যক্ষ ভাবেই জেনে ফেলি। সেই মত অনেক বড় সিদ্ধান্তও নিয়ে নিচ্ছি। সব চেয়ে বড় কথা হলো সিদ্ধান্তগুলো সঠিক হচ্ছে। কাজেই এর পেছনে বিজ্ঞান যত গল্প তৈরি করেছে সবই সঠিক বলে মেনে নিতে হচ্ছে। তাছাড়া মনে রাখতে হবে গল্পের প্রত্যেকটি অংশ আন্দাজ করে করে তৈরি হলেও এর প্রত্যেকটি চাক্ষুষ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। ব্যাঙমা-ব্যাঙামীর বা জিয়ন কাঠির রূপকথা তৈরিতে এরকম

চাক্ষুষ কোন প্রমাণের বা এক্সপেরিমেন্টের প্রয়োজন হয়নি কোন পর্যায়েই। সত্যিকার কোন কিছুতে তাদেরকে সাফল্যের কৃতিত্বও দেখাতে হয়নি। এসব কারণেই কল্পনার গুরুত্ব থাকলেও, মহাকাব্যিক নানা বৈশিষ্ট থাকলেও বিজ্ঞান খুবই ব্যতিক্রমী একটি মহাকাব্য।

# কেন যে বুঝি সেটিই বুঝিনা

প্রকৃতি যে নিয়ম মানে সে কথা কি নিশ্চিত?

বিজ্ঞানীদের অভাবনীয় অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আমরা সবাই ধরে নিই যে প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম লুকানো রয়েছে আর বিজ্ঞানীরা সে নিয়ম উদ্ঘাটন করেন। নিয়ম যখন আছে, আর বিজ্ঞানীরা যখন এতই প্রতিভাবান তখন তাঁরা সে নিয়ম বুঝবেন, এটিই তো স্বাভাবিক। কাজটি কঠিন হতে পারে, অনেক সময়সাপেক্ষ হতে পারে, তবে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু কেউ কেউ তাতে বিস্মিত হন, আর মজার ব্যাপার হলো যাঁর সব থেকে কম বিস্মিত হবার কথা তিনিই কথাটি সবাইকে বলেছেন– আইনস্টাইনই বলেছেন– কেন যে প্রকৃতিকে তিনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন সেটিই তাঁর কাছে বড় রহস্য। বুঝতে পারার কথা ছিলনা, কারণ প্রকৃতিতে কিছুই সরল নয়, সবই জটিলতা আর ঘোরপেঁচে ভর্তি। প্রকৃতিকে বিজ্ঞানী কিছুটা বোঝেন কারণ তিনি যা জটিল ও অবোধ্য তার মধ্য থেকে এক রকম সারল্য ও বোধগম্যতা বের করে আনতে পারেন। এটি তাঁর মস্তিষ্কের কৃতিত্ব, যে মস্তিষ্ক বিজ্ঞান আর গণিত সৃষ্টি করতে পেরেছে। অন্তত বিজ্ঞানী নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করতে পেরেছেন যে বিশ্ব-প্রকৃতিকে তিনি বুঝেছেন, এটিই তাঁর বিস্ময়। শুধু নিজে অনুভব করেননি, অন্যদেরকে অনুভব করিয়েছেন; ওই বোঝার ওপর ভিত্তি করে সব কিছু হিসেব করে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন। কিন্তু তাতে বিস্ময়টি মোটেই কমেনা।

বিস্ময়টি আরো ঘনীভূত হয় যখন আমরা প্রশ্ন করি বিজ্ঞানী কী আবিষ্কার করেন। যে উত্তরটি স্বাভাবিক ভাবে আসে তা হলো প্রকৃতির লুকিয়ে থাকা নিয়মগুলোই আবিষ্কার করেন। কিন্তু নিয়ম যে তিনি আবিষ্কার করবেন, ওই নিয়ম আদৌ আছে কিনা সেই ব্যাপারে তিনি কি নিশ্চিত? প্রকৃতি যে কোন নিয়ম না মেনে খামখেয়ালি ভাবে চলেনা এই গ্যারান্টি তাঁকে কে দিয়েছে? সাধারণ মানুষ প্রকৃতির কিছু মোটা দাগের ঘটনা দেখেন– পূর্ব দিকে সূর্য ওঠা বা ঋতু-পরিবর্তন হবার মতো, কিংবা পানি উত্তপ্ত করলে গরম হবার মত; কাজেই তাঁদের পক্ষে এই বিশ্বাসে অটল হবার কথা যে প্রকৃতির সব কিছু নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু বিজ্ঞানীর পক্ষে এই বিশ্বাস এত সহজে হবার কথা নয়। কারণ তিনি যতই কোন ঘটনার মধ্যে মোটা দাগে নিয়ম দেখেন তেমনি ততই

তার মধ্যে আরো সূক্ষ্ম দাগে জটিলতা আর অনিয়ম দেখেন। চেষ্টা করে সেটির মধ্যেও যদি কিছু নিয়ম খুঁজে পান, তখন দেখেন তার চেয়ে আরো সূক্ষ্ম পর্যায়ে জটিলতা এসে দেখা দিয়েছে। এভাবে পরতে পরতে চল্‌তেই থাকে। অনেক সময় মনে হয় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে গিয়ে তিনি নিজেই যেন নিয়মটি আরোপ করছেন। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে গিয়ে বিজ্ঞানী যদি নিয়মের অস্থিত্ব নিয়েই সন্দিহান হোন তা হলে তাঁকে দোষ দেয়া যায়না। তবে যেহেতু নিয়মের আবিষ্কারই তাঁর কাজ, নীতিগত ভাবে প্রকৃতি মাত্রেরই নিয়ম একটা আছে এটি ধরে নিয়ে এগুনোই তাঁর জন্য ভাল। এটি ধরে নিয়ে তিনি অনেক সাফল্যের মুখ দেখেছেন, তাই সামনেও দেখবেন এটিই আশা।

সাধারণ মানুষ যে প্রকৃতিতে নিয়ম ছাড়া কিছু দেখতে পান্‌না তার একটি কারণ হচ্ছে তিনি নিয়ম বলতে বোঝেন একই ঘটনা একই ভাবে বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়াটিকে। কিন্তু যে কোন পুনরাবৃত্তিকে নিয়ম বলে মানা যায়না। অন্তত বিজ্ঞানীর সে ভাবে দেখলে চলেনা। নিয়ম হতে হলে ওই ঘটনার মধ্যে নিয়ম জাতীয় কিছু শর্ত থাকতে হয়, ওই শর্তের জন্যই আমরা তাকে নিয়ম বলতে পারবো, নেহাৎ পুনরাবৃত্ত হচ্ছে বলে নয়। অনেক কাকতালীয় কারণে ওরকম পুনরাবৃত্তি হতে পারে, যেমন বিশেষ একটি অতিথি পাখি আসলে তখন বীজ বপন করলে ভাল ফসল পাব এটিকে নিয়ম মনে করা। এমন পুনরাবৃত্তি বছরের পর বছর দেখা যেতে পারে, কিন্তু তা যে প্রকৃতির নিয়ম নয় তা বোঝা যায় অতিথি পাখি আসতে একবার দেরি করলে এবং তাকে দেখে দেরিতে বীজ বপন করলে। নিজের দেশে শীত কম পড়াতে পাখি দেরি করতেই পারে। এতদিন যে পাখি ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে এসেছিল সেই পুনরাবৃত্তিটি ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছিল। সেই পুনরাবৃত্তিকে প্রকৃতির নিয়ম মনে করাতে মানুষকে ঠকতে হয়েছে। আবার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও পুনরাবৃত্তি দেখা নাও যেতে পারে। যেমন পাঁচশ' বছর আগে গ্যালিলিও প্রতিষ্ঠিত করছিলেন প্রকৃতির একটি নিয়ম ভারী ও হালকা জিনিস এক সঙ্গে ওপর থেকে ফেল্‌লে এক সঙ্গে মাটিতে পড়ে। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ প্রকৃতিতে একটি ভারী ঢিল ও একটি পাখির পালক এক সঙ্গে ফেল্‌লে তা এক একবার এক এক ভাবে পড়বে, কোন বার পুনরাবৃত্ত হবেনা, প্রত্যেকবার ঢিল আগে পড়বে গ্যালিলিওর নিয়ম অমান্য করে। বিজ্ঞানীর কাছে অবশ্য তা সত্ত্বেও নিয়মটি ধরা পড়েছে– সেটি ওই নিয়ম জাতীয় শর্ত মানে বলেই। শর্তটি হলো কার্য-কারণ সম্পর্কের শর্ত, কোন্ কারণে কোন্ কার্য হচ্ছে তা বিজ্ঞানীর বুঝিয়ে বলতে পারার শর্ত। বাতাসের উর্ধ্ব গতির কারণে হালকা

পালক ভেসে থাকতে পারে, ভারী ঢিল তা পারেনা, এটি বুঝিয়ে বলতে পারা। বাতাস বের করে নেয়া কাচের পাত্রে একই কাজটি করলে ওটি ঠিক পুনরাবৃত্ত হয়, গ্যালিলিওর নিয়মও মানে– এও ওই কার্য-কারণ বুঝিয়ে বলতে পারার শর্ত মানছে বলেই। অন্যদিকে পাখি আসলে যে বীজ বপনের উপযুক্ত হয় তার মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, তাই ওটি নিয়ম প্রকাশ করেনা। গ্যালিলিওর নিয়মের উদাহরণে কার্যকারণ বুঝিয়ে বল্‌তে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানী এর থেকে অনেক জটিল, অনেক অবোধ্য ঘটনার মধ্যেও এরকম কার্য-কারণের যুক্তি স্থাপন করতে পেরেছেন, এবং সেখানে প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম দেখতে পেয়েছেন। এজন্যই তাঁর পক্ষে নিয়ম আছে ধরে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে।

কেন বুঝি তার অন্তত একটি প্রাথমিক কারণ খুঁজে পাওয়া গেলো– বোঝার মত নিয়ম আছে বলেই বুঝি। তবে নিয়ম থাকার পুরো কৃতিত্বটি প্রকৃতিকে দেয়া যায়না। এর কারণ নিয়ম যে আছে সেটি বোঝার জন্য যে কার্য-কারণ সম্পর্ক, অর্থাৎ যেই বিজ্ঞান তার অনেকটাই এসেছে বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক থেকে, শুধু আংশিক ভাবে তা প্রকৃতি থেকে এসেছে। ওই যে কল্প-তত্ত্বের কথা, আন্দাজ করার কথা, বা রূপকথার মত কিছু সৃষ্টির প্রসঙ্গ, ওসব তো মস্তিষ্কেরই সৃজনশীলতায় এসেছে; এরপরেই শুধু প্রকৃতির সঙ্গে মিলে কিনা দেখা হয়েছে। কাজেই প্রকৃতিতে নিয়ম যে আছে সে কথাটিও বিজ্ঞানীকে চেষ্টা করে আদায় করতে হয়েছে, প্রকৃতি চিৎকার করে ওকথা বিজ্ঞানীকে বলে দেয়নি।

অথচ এই নিয়ম ছাড়া বিজ্ঞানীর চলেনা। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই কিছু খুব মৌলিক নিয়মকে ধরে না রাখতে পারলে তাঁর কাজ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। যেমন পদার্থবিদ্যার নিত্যতার নিয়মগুলো। শুধু গতির ক্ষেত্রে তাকালে ভর-বেগের নিত্যতা, কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা, এবং শক্তির নিত্যতাকে পদার্থবিদের ধরে নিতে হয়। নিত্যতার মানে হলো একটি সিস্টেমের মধ্যে কিছু বস্তু থাকলে ওগুলোর নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ইত্যাদি যত ঘটনাই ঘটাক তাদের মোট ভরবেগ চিরকাল একই থাকবে, নিত্য থাকবে। যেমন পরস্পরের সংঘর্ষে তাদের প্রত্যেকের ভরবেগ বদলে যেতে পারে, কিন্তু মোট ভরবেগ কখনো বদলাবেনা। সিস্টেমটিকে অবশ্য এজন্য নিশ্ছিদ্র হতে হবে, অর্থাৎ তার বাইরে থেকে কোন কিছু এর মধ্যে যেতে পারবেনা, কিছু বাইরে আসতেও পারবেনা। এই নিত্যতার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বিজ্ঞানী বাকি কাজ করতে পারেন।

কৌণিক ভরবেগ আর শক্তির ব্যাপারেও এটি একই ভাবে প্রযোজ্য। যদি পুরো মহাবিশ্বকে আমরা একটি সিস্টেম হিসেবে নিই, তা হলে মহাবিশ্বের মোট ভরবেগ, কৌণিক-ভরবেগ, বা শক্তি সব সময় একই থাকবে– চৌদ্দশত কোটি বছর আগে জন্মের সময় যা ছিলো, এখনো তা। এর মধ্যে মহাবিশ্ব একটি বিন্দু থেকে আজকের ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর মধ্যে এটি অনেক ঘটনার জন্ম দিয়েছে– কিন্তু নিত্যতার নীতির কোন ব্যতিক্রম এখানেও হয়নি। তেমনি পদার্থবিদ্যায় আরো কিছু জিনিস নিত্য থাকে– যেমন মোট বিদ্যুৎ চার্জ।

কেন এই নিত্যতার নিয়ম? বেছে বেছে এই জিনিসগুলোকেই কেন প্রকৃতি সর্বদা সমান রাখছে? এর একটি উত্তর দিয়েছেন গণিতবিদ এমা নোয়েথার। গণিতের মাধ্যমে প্রকৃতির মধ্যে কতগুলো প্রতিসাম্যের কারণ উদ্ঘাটন করেছেন এই নারী-গণিতবিদ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। গাণিতিক ভাবে কোন কিছুকে একটি বিশেষ পরিমাণে পরিবর্তন করার পরও তার যা অভিন্ন থাকে তাকে একটি প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) বলা যায়। যেমন একটি বর্গক্ষেত্রকে যদি ৯০ ডিগ্রি কোণে ঘুরিয়ে দিই তা হলে বর্গক্ষেত্রের অবয়বটি অক্ষুণ্ন থাকে। সেজন্য বলা যায় যে বর্গক্ষেত্রের একটি ৯০ ডিগ্রি ঘূর্ণন-প্রতিসাম্য আছে। এর থেকে আরো ভিন্ন আরো জটিল পরিবর্তনেও কিছু কিছু জিনিস অভিন্ন থাকে– তার সেই প্রতিসাম্য আছে বলে। যেমন আমি যদি আয়নায় আমার প্রতিফলন দেখি সেই প্রতিফলনে আমার ডান-বাম প্রতিসাম্য বজায় থাকে। প্রতিসাম্যের মধ্যে একটি সাযুজ্য, সমতা বা সৌন্দর্য থাকে যেটি অবাক করার মত। এ হলো বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখেও বিজ্ঞানের নিয়মকে অভিন্ন পাওয়া।

গতির ওই যে তিনটি নিত্যতার নিয়ম– এর প্রত্যেকটি এক একটি প্রতিসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। নোয়েথার গাণিতিকভাবে এই ব্যাপারটি প্রমাণ করেছেন। প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যেই প্রতিসাম্যটি আছে বলেই নিত্যতাটি একটি অমোঘ নিয়ম। যেমন প্রকৃতির মধ্যে যদি জায়গা বদল করি তাতে পদার্থবিদ্যার নিয়মে কোন পরিবর্তন আসেনা, এতে বোঝা যায় প্রকৃতিতে স্থানের প্রতিসাম্য রয়েছে। গাণিতিক ভাবে দেখানো যায় যে এ কথার মানেই হলো ভরবেগের নিত্যতা। স্থানের প্রতিসাম্য আছে বলেই ভরবেগের নিত্যতা আছে। তেমনি প্রকৃতিতে দিকের প্রতিসাম্য আছে– কোন্ দিক বরাবর একটি ঘটনা ঘটছে তার ওপর পদার্থবিদ্যার আচরণ নির্ভর করেনা; এরই ফলে এসেছে কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা। এমনি ভাবে প্রকৃতির কাল-প্রতিসাম্যও আছে, যে কোন

সময়ে দেখলে পদার্থবিদ্যা অভিন্ন থাকে, কাল পরিবর্তনে তার কিছু আসে যায়না। আর এর ফলে এসেছে শক্তির নিত্যতা। অন্যান্য সব নিত্যতার নিয়মের পেছনেও থাকে এমনি এক একটি প্রতিসাম্য, যার মানে এক একটি পরিপ্রেক্ষিত-অভিন্নতা। এরকম বড় বড় প্রতিসাম্য ও নিত্যতার নিয়ম প্রকৃতি কখনো ভঙ্গ করেনি, এটি বিজ্ঞানীর একটি আশ্বস্থ হবার ব্যাপার; অন্তত কিছু জিনিসের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারেন তাঁর কাজ করতে গিয়ে।

কিন্তু ব্যতিক্রম একেবারে যে হয়নি তা নয়। কণিকাবিদ্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাতে প্যারিটি নামে পরিচিত একটি বহুলভাবে ধরে নেয়া প্রতিসাম্য ভঙ্গ হবার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, এবং পেয়ে প্রকৃতির এই আচরণে স্তম্ভিত হয়েছেন। প্রকৃত আমি ও আয়নায় আমার যে প্রতিফলন দেখি এই দুইয়ের জগতে কোন পার্থক্য নেই শুধু  ডানটি বাম হয়ে যাওয়া ছাড়া। কণিকার ক্ষেত্রেও তার প্রত্যেক বিক্রিয়ার সঙ্গে আয়নায় তার প্রতিফলনের দেখানো বিক্রিয়া এই উভয়েই একই ভাবে থাকার কথা– যাতে তার ডান-ঘূর্ণনটি বাম-ঘূর্ণন মনে হবে। এমন কণিকার সাম্যকে বলা হয় প্যারিটি। এটি বজায় থাকা জরুরী, কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কৃত হলো এটি বজায় থাকেনা। ১৯৫৬ সালে ইয়াং আর লী এই দুই আমেরিকান পদার্থবিদ এটি আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতকে নিরাশ করেছেন। কাজেই প্রকৃতি খামখেয়ালী হতে পারেনা, এটি একেবারে নিশ্ছিদ্র, এমন কথা বলা যায়না। প্যারিটি-প্রতিসাম্য ভঙ্গের ব্যাপারটি ছিল মূল অমোঘ নিয়মগুলো ওপর দারুণ আস্থাবান সকল বিজ্ঞানীদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত।

এর মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে আজকের যে মহাবিশ্ব এটি চিরকাল এ রকম ছিলনা– বরং চৌদ্দ শত কোটি বছর আগে একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন বিন্দু হিসেবে জন্ম নিয়ে এটি ক্রমেই প্রসারিত হয়েছে। সেই জন্ম মুহূর্তটিকে বিগ ব্যাং (বড় আওয়াজ) নাম দিয়ে পুরো তত্ত্বটিকে বলা হয়েছে বিগ ব্যাং তত্ত্ব। এটিও এক রকম খুবই বেখাপ্পা একটি ঘটনা– এই কিছুই ছিলনা, হঠাৎ সব হয়ে গেলো। এর জন্য মস্ত বড় কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হলেও তার সবেরই সাক্ষ্য-প্রমাণ হাতের মধ্যে চলে এসেছিলো। সেই জন্মকালের সুদূর অতীতে আরো একটি জরুরি প্রতিসাম্য ভঙ্গের ঘটনা কিন্তু তখন পরিস্কার হয়ে গেলো। ওই  মহাবিশ্ব গড়েছে যে সব মৌলিক কণিকা তার প্রত্যেকটির বিপরীতে একটি যে প্রতি-কণিকা আছে সেটি আবিষ্কৃত হয়েছিলো। কণিকায়

আর প্রতি-কণিকায় দেখা হলে দুটিরই বিনাশ ঘটে। প্রতিসাম্য অনুযায়ী মহাবিশ্বে যত কণিকা থাকার কথা ঠিক ততগুলোই তার প্রতি-কণিকা থাকার কথা; তেমন যদি হতো তা হলে বহু আগেই উভয়ে মিলে মহাবিশ্ব বস্তুহীন হবার কথা, অথচ আজ প্রকৃতিতে অসংখ্য শুধু কণিকা আছে, কোন প্রতি-কণিকা নেই। এটি এবং আরো নানা সাক্ষ্য থেকে বোঝা গেলো অতীতে এক সময় কণিকা ও প্রতি-কণিকার প্রতিসাম্যটি ভঙ্গ হয়েছিলো যার ফলে প্রতি-কণিকার থেকে সামান্য কিছু সংখ্যক বেশি কণিকার সৃষ্টি হয়েছিলো। যত প্রতি-কণিকা সবই তার কণিকার সংযোগে বিনাশ হয়েছে– কিন্তু ওই বাড়তি ক'টা রয়ে গেছে। ওই বাড়তিগুলো দিয়েই আজকের মহাবিশ্ব। এখানেও প্রতিসাম্য ভঙ্গ হয়েছে, আর তা হয়েছিল বলে মহাবিশ্ব টিকে আছে।

ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ, এর প্রতি-কণিকা পজিট্রনের চার্জ পজিটিভ। প্রতিসাম্যটি ভঙ্গ হয়ে এখন শুধু ইলেকট্রন আছে। এখানে চার্জ-প্রতিসাম্যটি ভঙ্গ হয়েছে, প্রকৃতির আর একটি খামখেয়ালি চরিত্র ধরা পড়েছে। তারপরও একটি আশা ছিল ওই যে প্যারিটি প্রতিসাম্য ভঙ্গ, আর চার্জ- প্রতিসাম্য ভঙ্গ এই দুটি মিলে হয়তো একটি প্রতিসাম্য দাঁড়ায় পরস্পর কাটাকুটি হয়ে, মোট ফলাফলে প্রতিসাম্য হয়তো বজায় থাকে। প্রকৃতি হয়তো এভাবেই প্রতিসাম্যের সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু হায় সে আশায়ও গুড়ে বালি, অন্য কিছু মৌলিক কণিকা নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে প্রকৃতি জানিয়ে দিয়েছে সেই মোট প্রতিসাম্যও রক্ষিত হয়না। কাজেই বিজ্ঞানীর আস্থা মাঝে মাঝে এভাবে চিড় খেয়েছে– কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতিজোড়া বহু প্রতিসাম্য তাঁকে একরকম এগুবার পথ-রেখা যুগিয়েছে। তুষারঝড়ের মধ্যে পর্বতারোহণের সময় নানা আরোহীর হাতে যেমন একই একটি দড়ি ধরা থাকে, প্রতিসাম্যগুলো প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কারে সে রকম দড়ির কাজ করছে। কিন্তু এই পথ-রেখা এলো কী ভাবে; পথের দিশা যে কী ভাবে পাওয়া গেলো তাও এক রহস্য।

### প্রকৃতি কেন বিজ্ঞানীর কল্পিত গল্পে সাড়া দেয়?

কেন যে বুঝি সেই কথাটি না বোঝার সব চেয়ে বড় একটা কারণ হলো বিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত তত্ত্ব প্রধানত বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃতির কথা সবকিছু জানার পরে নয়। অথচ এই তত্ত্বের থেকে পাওয়া সব জিনিস আবার যথেষ্ট খুঁটিনাটিতে প্রকৃতির সঙ্গে সুন্দর মিলে গিয়েছে। পদার্থবিদ্যার মত বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক প্রায়ই গণিতের মাধ্যমেই তত্ত্ব সৃষ্টি

করে– সেই গণিতও মানুষেরই সৃষ্টি। এর মূলে যে জিনিসগুলো আছে যেই সংখ্যা, বিন্দু, রেখা, ফাংশান, সেট ইত্যাদি গণিতের মূল উপাদানগুলো থেকে ধাপে ধাপে যৌক্তিক পদক্ষেপে গণিতের অতি সৌকর্যময় প্রাসাদটি গড়ে ওঠেছে তার সবই বিমূর্ত জিনিস, মস্তিষ্কের সৃষ্টি– প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়তো হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে আসেনি। তা হলে এ গণিত কী ভাবে এতো সুন্দর করে কড়ায়-গণ্ডায় মিলিয়ে প্রকৃতির কথা বলে দেয়? এতো সেই রহস্যের অংশ– কেন যে বুঝছেন তা বুঝতে না পারা। যে গল্প বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করেছেন তাতে প্রকৃতিতে কিছু কিছু জিনিস দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ওভাবে তার সঙ্গে সব কিছু মিলতে থাকাটি তাঁকে বিস্মিত করবে বৈকি।

গত অধ্যায়ে আমরা যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের রাজ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের চার্জ ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ইত্যাদি যা যা কল্পনা করতে দেখেছি একে একে তার সবই প্রকৃতিতে খুঁজে পাওয়া গেছে– কল্পনায় যা ছিল তা বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওই দেখা দেয়ার প্রক্রিয়াটিও আমার সামনের চেয়ার-টেবিলটি দেখে ফেলার মত নয়, সেখানেও ওই কল্পনার ধারাবাহিকতাটি অব্যাহত ছিলো। অবশ্য তাই বলে জিনিসটির অস্থিত্ব মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি, চেয়ার টেবিলের মত না দেখলেও। এভাবে দেখেছি, বুঝেছি বলে সবাইকে আশ্বস্থ করার কাজে বিজ্ঞানের সাফল্যটিও কম অবাক করার মত নয়। এখান থেকেই একটি উদাহরণ দিই। বিদ্যুৎ চার্জ বলে সে জিনিস কল্পনা করা হয়েছে ইলেকট্রন নামে একটি কণিকার মধ্যেই তার ক্ষুদ্রতম পরিমাণটি আছে সেটিও কল্পনা করা হয়েছে। ইলেকট্রনে থাকছে সব থেকে ক্ষুদ্র একটি ঋণাত্মক চার্জ, তাই একে বলা যায় চার্জের একক।

আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট মিলিকান ১৯০৯ সালে একটি এক্সপেরিমেন্ট করলেন ইলেকট্রনের চার্জ মাপার জন্য। আমরা গায়ে সুগন্ধদ্রব্য ছিটিয়ে দেয়ার জন্য যে স্প্রেয়ার ব্যবহার করি তাতে সুগন্ধি তরলটিকে খুব ক্ষুদ্র ফোঁটায় পরিণত করে অসংখ্য ফোঁটার একটি কুয়াশা সৃষ্টি করি। মিলিকান তাঁর এক্সপেরিমেন্টে সেটি ব্যবহার করলেন। ওরকম স্প্রেয়ারের মত যন্ত্র দিয়ে তিনি একটি কাচের জারের উপরের প্রান্তে অসংখ্য তেলের ফোঁটার সৃষ্টি করলেন। জারের পাশ থেকে অনুবীক্ষণের সাহায্যে ওই ফোঁটার এক একটিকে দেখা যায়, তার গতিপথ অনুসরণ করা যায়। ওই জারের ভেতর ওপরে ধনাত্মক বিদ্যুৎ চার্জ দেয়া একটি পাত আর নিচে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ চার্জ দেয়া আরেকটি পাত

আছে। ওপরের পাতের একটি ছিদ্র দিয়ে কিছু কিছু ফোঁটা নিচে পড়ছে। শুরুতেই ওখানে এক্সরের মত শক্তিশালী বিকিরণ দিয়ে বাতাসের অণুর থেকে ইলেকট্রন নির্গত করার ব্যবস্থা হয়েছে যাতে ওই ফোঁটাগুলোতে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন গিয়ে জমে– ইতস্তত কোনটিতে একটি, কোনটিতে দু'টি, কোনটিতে বেশ কটি, এমনকি কোনটিতে বড় কোন সংখ্যায়। যেহেতু ফোঁটার সংখ্যা অনেক তাই ইতস্তত সব রকম সংখ্যায় ইলেকট্রন থাকা ফোঁটা প্রচুর থাকবে ওখানে। প্রত্যেক ফোঁটা তার ভারে নিচে পড়ে তবে বাতাসে বাধা পায় বলে খুব ধীরে ধীরে পড়ে। ওসময় ওপরে ধনাত্মক পাতের ভোল্টেজ (চার্জ) এমন ভাবে বাড়ানো-কমানো যায় যাতে বিশেষ একটি ফোঁটার মাধ্যাকর্ষণে নিচে যাওয়া আর ওপরের পাতের আকর্ষণে ওপরে যাওয়া উভয়ে সমান হয়ে ফোঁটাটি একদম স্থির হয়ে যায়। তাহলে ঠিক সে অবস্থায় ওপরের পাতের চার্জ ও নিচে যাওয়ার মাধ্যাকর্ষণের জানা হিসেব থেকে তেলের ফোঁটাটির মধ্যে ইলেকট্রন জমার কারণে কতটুকু ঋণাত্মক চার্জ আছে নির্ণয় করা যায়। ওই ঋণাত্মক চার্জের কারণেই তো ওটি ওপরের ধনাত্মক পাতের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। এরকম অনেক ফোঁটার প্রত্যেকটির চার্জ নির্ণয় করা হলো। মনে করি একটি ইলেকট্রনের চার্জ e। এটিই তাহলে চার্জের ক্ষুদ্রতম একক। সেক্ষেত্রে ইতস্তত কোন ফোঁটায় e, কোন ফোঁটায় 2e, কোন ফোঁটায় 3e, আবার এমনি করে কোন ফোঁটায় 12e, 33e বা যে কোন সংখ্যক e চার্জ পাওয়া যাবে। এবার এসব সংখ্যার সবগুলোকে কোন্ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় সেটিই বলে দেয় e এর মান।

ওভাবে e এর মান অর্থাৎ ওর মধ্যে ক্ষুদ্রতম চার্জের মান বের হয়ে পড়ে যা ইলেকট্রনের চার্জ। পরীক্ষাটি বহুবার করে যখন সব সময় e এর একই মান পাওয়া গেলো তাকে ইলেকট্রনের চার্জের পরিমাণ বলে বিশ্বজনীন একটি ধ্রুবক সংখ্যা হিসাবে মেনে না নিয়ে কোন উপায় থাকলোনা। আমরা বল্‌ছি মিলিকান ইলেকট্রনের চার্জের মান বের করেছেন। কিন্তু তিনি কি ইলেকট্রন দেখেছেন? তাতে চার্জ দেখেছেন? তিনি তেলের ফোঁটা ছাড়া কিছুই দেখেননি। ফোঁটার বাইরে সব কিছু কার্য-কারণের যুক্তি দিয়ে বলে গেছেন। কিন্তু এতে যে ইলেকট্রনের চার্জ মাপা গেছে তাতে বিজ্ঞানীদের কোন সন্দেহ নেই; এরপর অন্যান্য পদ্ধতিতেও ইলেকট্রনের চার্জ মেপে একই মান পাওয়া গেছে– তাঁরা তাতে আরো নিঃসন্দেহ হয়েছেন। অথচ এই নিঃসন্দেহ হওয়া জিনিসের পেছনে

আছে বৈজ্ঞানিক কল্পনার হাত, চার্জের কল্পনা তো বটেই, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদিরও। পেছনের বৈজ্ঞানিক সব গল্পকে সত্য জেনেই বিজ্ঞানীরা এরকম নিঃসন্দেহ ইলেকট্রনে ও তার চার্জে পৌঁছতে পারলেন। ওই গল্প একটি গল্পে সীমাবদ্ধ থাকেনি- একের সঙ্গে আরেক মিলে এটি একটি মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব ও ইলেকট্রনিক্সের মহাকাব্য– ইলেকট্রন যার একটি বড় চরিত্র। এতে পদে পদে বৈজ্ঞানিক কল্পনাকে যেমন ব্যবহার করতে হয়েছে তেমনি মস্তিষ্ক-উদ্ভাবিত গণিতকেও ব্যবহার করতে হয়েছে। অথচ এসবই কী সুন্দর ভাবে আমাদেরকে অদৃশ্য পুরো জগতটিকে প্রায় চেয়ার-টেবিল দেখার মতই জাজ্বল্যমান করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর সেই বোঝার ওপর ভিত্তি করে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছি, সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে যাচ্ছে। বিস্ময়টি ওখানেই।

এখানে 'মিলিকানের তেলের ফোঁটা এক্সপেরিমেন্ট' নামে পরিচিত এক্সপেরিমেন্টের ভেতর দিয়ে দেখলাম বিস্মিত হবার জায়গাটি কোথায়– এক্ষেত্রে অবশ্য বেশ সহজ একটি পরিসরে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কোন এক্সপেরিমেন্টে যাওয়ার আগেই কল্পনায় আর গণিতে মেশানো তত্ত্বের ভেতরেই সব কিছু এমন ভাবে মিলে যেতে দেখা যায় যে বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। এমনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি হলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের সাধারণ তত্ত্ব। সেখানে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব মিলে যাওয়া আরো বিশাল বিস্ময়। ওই আপেক্ষিক তত্ত্বেরই বিশেষ তত্ত্বে আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে স্থান ও কাল এই দুটির আলাদা কোন পরম অস্থিত্ব নেই- এগুলো নির্ভর করে এক পর্যবেক্ষকের প্রেক্ষিতে আরেক পর্যবেক্ষক কী ভাবে সরল রেখায় সমগতিতে চলছে তার ওপর। দর্শকের প্রেক্ষিতে যে স্থির আছে তার তুলনায় যে চল্‌ছে তার দৈর্ঘ বা স্থানকে পাওয়া যাবে সংকোচিত অবস্থায়, আর কালকে পাওয়া যাবে দীর্ঘায়িত অবস্থায়। এই চলাচলের মধ্যে শুধু আলোর গতিবেগটি অপরিবর্তিত একই থাকবে– সব দর্শকের কাছেই তার প্রেক্ষিতে আলোর উৎস স্থির থাকুক বা চলন্ত থাকুক। চলাচল জিনিসটিও আপেক্ষিক ব্যাপার। রাস্তার একটি গাড়ি পাশের ভবনের প্রেক্ষিতে এক বেগে চল্‌ছে আবার অন্য একটি গাড়ির প্রেক্ষিতে অন্য বেগে। এমনি আপেক্ষিকতার কারণে স্থান আর কালকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই– দুটি মিলে একই চার-মাত্রিক স্থান-কালেরই শুধু একটি মানে হয়। মহাবিশ্ব স্থান-কালে গড়া– এতে সব বস্তু ও শক্তি স্থান-কালেই আছে, আসলে

বস্তু ও শক্তিকে এক করেই দেখা যায়, একটিকে অন্যটিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এই সব আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের কথা।

এরপর বিশেষ তত্ত্বের সমগতির তত্ত্বটিকে আইনস্টাইন চেয়েছিলেন সব রকম গতিতে নিয়ে যেতে– সরল রেখায় সমগতির বদলে যেখানে গতি-পরিবর্তন থাকে, মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব থাকে। তিনি অবশ্য দেখলেন তাঁর কাছে যা মাধ্যাকর্ষণ তা গতির ত্বরণ অর্থাৎ গতি পরিবর্তনের হার ছাড়া কিছু নয়।

আইনস্টাইনের গাণিতিক চিন্তা তাঁকে বলে দিলো মাধ্যাকর্ষণ অর্থাৎ ভরের উপস্থিতিতে স্থান-কালের জ্যামিতিটি বদলে যাবে। যেমন খুব সহজ উপমায় বলতে গেলে ধরা যাক শিশু পার্কে থাকা ঘুরন্ত প্লাটফর্মের বা চাকতির ওপরে দাঁড়িয়ে তার পরিধির মাপ আর ব্যাসের মাপ নিলাম। উভয়ের অনুপাত হবে 'পাই' নামে পরিচিত সংখ্যা স্কুলে শেখা স্বাভাবিক পাইয়ের মান এর থেকে পাওয়া যাবে– যা সমতলের ওপর আঁকা সাধারণ জ্যামিতিতে আমরা দেখি। কিন্তু ঘুরন্ত প্লাটফরমটির বাইরে থেকে কোন স্থির পর্যবেক্ষক ওই ঘুরন্ত চাকতিটির পরিধি মাপলে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী সেটি কম পাবে কারণ তার প্রেক্ষিতে গতির কারণে ওটি সংকোচিত হবে, কিন্তু ব্যাস ঘুরন্ত প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে মাপা ব্যাসের মত একই পাবে কারণ ব্যাসের দিকে কোন গতি নেই; তাই বাইরে স্থির মানুষের মাপে ব্যাসের সঙ্গে পরিধির অনুপাত অর্থাৎ পাইয়ের মান সামান্য ছোট হয়ে যাবে। এমনটি দেখা যায় গোলকের তলের মত বাঁকানো কাগজের ওপর বৃত্ত আঁকলে। এ যেন চাকতিটির ঘূর্ণনের ফলে এর জায়গাটিতে একটি ভাঁজ পড়ে গেছে, গোলকের তলের আকার নিয়ে। যদিও কাগজের ভাঁজের মত এই স্থানের ভাঁজ দেখা যাচ্ছেনা, তবুও পাইয়ের মান ছোট হওয়াতে ওই স্থানের মধ্যে ওরকম ভাঁজ যে পড়ছে তা ধরে নেয়া যায়। আইনস্টাইনের গণিত খুব সাধারণভাবে এই ব্যাপারটিই দেখিয়ে দিল ঘূর্ণনের মত বা অন্য যে কোন রকম ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণ থাকলেই ওখানকার স্থান-কালে ভাঁজ পড়বে– যত বেশি ভরের জিনিস থাকবে তত বেশি ভাঁজ। অন্য কোন ভর এই ভাঁজ অনুসরণ করতে বাধ্য বলেই ভর দুটি পরস্পরের সংলগ্ন হবে বা একটির চারিদিকে অন্যটি ঘুরবে। নিউটনের বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের মত একই ঘটনা– কিন্তু কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। নিউটনের ব্যাখ্যায় এটি ছিল দুই ভরের পরস্পর আকর্ষণ। আইনস্টাইনের ব্যাখ্যায় এটি ঘট্‌ছে স্থান-কালে ভাঁজ পড়ার কারণে।

আইনস্টাইনের এই চিন্তাকে সূক্ষ্ম ভাবে গাণিতিক প্রকাশে আনলে বোঝা যেতো এসব কল্পনার কোন অর্থ হয় কিনা। উপযুক্ত গণিত পেতে আইনস্টাইনের একটু সময় লাগলো– দেখা গেলো গণিতবিদরা নিজের খেয়ালে ঠিক এমনি গণিত উদ্ভাবন করে গেছেন যার নাম টেনসর ক্যালকুলাস। এ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গাণিতিক চিন্তায় ছাড়া ওটি কোন কাজে আসেনি, আইনস্টাইন কাজে লাগালেন। ভরের উপস্থিতিতে স্থান-কালের ভাঁজের প্রকাশ যে ফিল্ড ইকোয়েশনগুলো তিনি টেন্সরে দাঁড় করালেন– সেগুলোই এত সুন্দর ভাবে তাঁর ওই চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করলো যেন আগ বাড়িয়ে সেগুলোই সব কথা বলে দিলো– যেখানে ঠিক যেমনটি হওয়া দরকার ঠিক সে রকম ফলাফল দিলো।

স্থান ও কাল একীভূত হওয়া চার মাত্রিক স্থান-কাল জিনিসটিই একটি গাণিতিক কল্পনা, মানুষের মাথা এটি চিত্রায়িত করার মত করে তৈরি হয়নি। তার মধ্যে আবার ভাঁজ, এ সবের চিত্র মাথায় ধারণের তো প্রশ্নই ওঠেনা– এর গাণিতিক-প্রকল্প মাথায় আসে, কিন্তু চিত্র-কল্প আসেনা। কারণ তিন মাত্রার বেশি কিছুর চিত্র আমরা মাথায় ধারন করতে পারিনা। কিন্তু গাণিতিক সৌকর্য, গাণিতিক ভাবে চিন্তার সব কিছু সুন্দর মিলে যাওয়া ওটি তত্ত্বটিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুল্‌ছিলো। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণে যে ফলাফল আসছিলো নিখুঁত ভাবে, এই সমীকরণগুলো ওই ভাঁজের চিন্তা থেকেও একই ফলাফল দিলো। শুধু তাই নয় যে অল্প কিছু পর্যবেক্ষণ অনেক দিনের চেষ্টা সত্ত্বেও নিউটনের তত্ত্বের সঙ্গে মিলছিলোনা এটি সেগুলোর সঙ্গেও মিল্‌লো। এর পর এটির ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণীও করা গেলো যে পূর্ণ সূর্যগ্রহণে সূর্য থাকা দিনের বেলাতে যখন আঁধার হয়ে আকাশে তারা ফুটে ওঠে তখন তারার আলো সুর্যের কারণে সামান্য বেঁকে যাবে। আইনস্টাইনের আবিস্কারের তিন বছরের মধ্যে এমন সূর্যগ্রহণে তা হুবহু প্রমাণিত হলো– যেটি ঘটার প্রশ্ন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণে ওভাবে আসেইনি।

ওই সূর্যগ্রহণ পরীক্ষার আগেই আইনস্টাইনের গাণিতিক সমীকরণ তাঁর একেবারেই অভিনব ওই স্থান-কাল ভাঁজের কল্পনা সহ পুরো আপেক্ষিক তত্ত্বটিকে এতই অনিবার্য করে তুলেছিলো যে সবাই বুঝছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে এটি সফল না হবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু এতসব অদ্ভুত কল্পনা সত্যিকার প্রকৃতির কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটি এভাবে অনিবার্য হয়ে উঠ্‌লো কেন? আইনস্টাইনের কাছেও সেটি একটি রহস্য মনে হয়েছিলো।

ওই তত্ত্বের মাধ্যমে সবকিছু বোঝার ব্যাপারে তিনি এবং সব বিজ্ঞানীরা এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আইনস্টাইনের আবিষ্কারটির পর এক শ' বছরের মধ্যে বাস্তবে প্রমাণিত না হলেও এটি যে কোনদিন হবে এ নিয়ে তখন তাঁর মনে যেমন কোন সন্দেহ ছিলনা, পরবর্তী অন্যদের মনেও কোন সন্দেহ ছিলনা। এতই সুন্দর ও শক্তিশালী ছিল তাঁর গাণিতিক যুক্তির অর্জন। ওই ভবিষ্যদ্বাণী হলো কোন ভর গতি পরিবর্তন করলে স্থানকালে একটি মহাকর্ষ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে আলোর গতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। ওই তরঙ্গকে অবশ্য পরিমাপযোগ্য হবার মতো হতে হলে ওই ভরকে অতি বড় বা ঘনীভূত হতে হবে– যেমন সেটি খুব অল্প জায়গায় বিশাল ভর সংকোচিত হওয়া ব্ল্যাকহোল হতে পারে। আর পৃথিবী থেকেই তা মেপে পেতে হলে যে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় তা পৃথিবীতে পৌঁছবে তা ধরতে পারার মত সংবেদনশীল যন্ত্র থাকতে হবে। এটি ছিলনা বলে ওই ভবিষ্যদ্বাণী এতদিন পরীক্ষা করা যায়নি। অবশেষে ভবিষ্যদ্বাণীর একশ' বছর পর ২০১৬ সালে 'লিগো' নামক যন্ত্রের অত্যন্ত সংবেদনশীল আয়োজনে এটিও বাস্তবে পৃথিবীতে পাওয়া গেছে। মহাকর্ষ তরঙ্গ পাওয়া যে একদিন যাবে সেই আস্থা আবার সার্থক হলো।

## শুধু আসন্ন নিয়মেই প্রকৃতিকে মাথায় আনা যায়

প্রকৃতির থেকে যে নিয়ম বিজ্ঞানীরা নিংড়ে আনার চেষ্টা করেন, তা সাধারণত খুব জটিল আকারেই দেখা দেয়। প্রকৃতির আচরণ সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে তাতে এত জটিলতা ধরা পড়ে যে আদৌ তার ভেতর কোন নিয়ম আছে কিনা সেটিই সন্দেহজনক। কিন্তু বিজ্ঞানী তাতে হাল ছাড়েননা, তিনি ওর মধ্যেই নিয়ম আরোপের সৃষ্টি করেন, প্রয়োজনে তাঁর কল্পনাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করে যে সার্বিক মোটা দাগের নিয়মটি খুঁজে পাওয়া যায় সেটিই উল্লসিত হবার মত। মোটা দাগে সব বাস্তব ফলাফল এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়– কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যায়ে গেলে এই তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে বাস্তব ফলাফলের সামান্য তফাৎ থেকে যেতে পারে, পরিমাপের পদ্ধতি যত উন্নত হবে এরকম তারতম্য তত বেশি চোখে পড়বে। অনেক ক্ষেত্রে এই তারতম্যকে তুচ্ছ করা যায় অধিকাংশ কাজে। কিন্তু তারতম্য যতক্ষণ আছে বিজ্ঞানীর শান্তি নেই। তিনি তাই তাঁর তত্ত্বটিকে বরং আরো একটু বাড়তি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হয়তো এই তারতম্যের মধ্য দিয়ে মূল ব্যাখ্যার ভেতর আরো একটি নতুন কল্পনার সুযোগ

আছে, প্রয়োজনও আছে। এখন পুরো তত্ত্বটিকে ধাপে ধাপে দেখার চেষ্টা করা হয়– প্রথম ধাপে প্রকৃতির আচরণের মূল অংশটিই বিবেচনায় আসে; ওতে নিয়মটি হয়তো বেশ সরল প্রকৃতিতে আসে, হয়তো যাকে বলা যায় সরল-রৈখিক– ওতে দুটি বিষয়ের মধ্যে এমন আনুপাতিক সম্পর্ক যে তার গ্রাফ আঁকলে তা সরল রেখায় দেখানো যায়। পুরো গল্প যদি ওখানে শেষ করা যেতো তা হলে কথা ছিলনা। কিন্তু বিজ্ঞানী এটিকে শুধু আসন্ন তত্ত্ব হিসেবে নিতে পারেন; তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করতে হলে এর পরবর্তী পর্যায়গুলোতে যেতে হবে যেখানে ওই সূক্ষ্ম বিবেচনাগুলো আসে। এর পরের ধাপটি তত্ত্বকে প্রকৃতির আরো কাছে নিয়ে যাবে। এমনি ভাবে ধাপে ধাপে এগুনো যায়, যেন প্রকৃতি নিজে এত জটিল যে তাকে কোনদিনই পুরো নিয়মে আনা যাবেনা। যত ভেতরে ঢুকছি ততই নতুন সূক্ষ্মতর পর্যায় উন্মোচিত হচ্ছে। এই ধাপগুলো থেকে আসন্ন ব্যাখ্যা যে পাওয়া যাচ্ছে তা বিজ্ঞানীর কল্পনার কৃতিত্ব, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গণিতের কৃতিত্ব।

গণিতের ওই আসন্নের ব্যাপারটি আমাদের কারো অজানা নয়। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত হিসেবে 'পাই' এর মান যখন বলতে বলা হয় একে 3.14 নিলেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ চলে। কিন্তু ওটি একেবারেই আসন্ন একটি মান। এর আসল মান কিন্তু না ফুরোবার মত একটি সংখ্যা অংক করে গেলে নিজেরাই দেখি সেটি 3.141592653589... এভাবে চল্‌তেই থাকে। যদি খুব সূক্ষ্ম কাজের জন্য 3.14 এর পর আরো কিছু সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করতে হয় যতগুলো পর্যন্ত প্রয়োজন, আসন্ন মান হবে ততটাই।

প্রকৃতির আচরণকে আসন্ন ভাবে দেখার একটি সহজ ও সাধারণ উদাহরণ নেয়া যাক। যে কোন একটি মামুলি স্প্রিং এর আচরণ আমরা কী রকম আশা করি? একে যত জোরে চাপ দেবো তত বেশি এটি দেবে যাবে। চাপ দ্বিগুণ করলে দেবে যাবার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে, তিন গুণ করলে দেবে যাওয়াও তিন গুণ হবে– এটিই আশা করবো; সাধারণ ভাবে তাই হতে দেখি, অর্থাৎ এই দুটি ব্যাপার পরস্পর সমানুপাতী। গণিতে একে আমরা বলি এদের মধ্যে সম্পর্কটি সরল-রৈখিক। আসলে সব কিছুর মধ্যে আমরা ওরকম সরল রৈখিক সম্পর্ক দেখলে খুশি হই; মনে করি এটি বেশ সরল নিয়ম মানা জিনিস। দৈনন্দিন কাজে স্প্রিং এর এমন আচরণ ধরে নিয়ে আমাদের কাজ চলে যায়– কাজেই প্রকৃতির বাড়তি জটিলতাগুলো সাধারণ মানুষ দেখতে পান্‌না। কিন্তু একটি

মামুলি স্প্রিংও কিন্তু এরকম সরল-রৈখিক আচরণ করেনা। যেমন চাপটি যদি একটু বেশি দেয়া হয় তা হলে যত চাপ পড়ে স্প্রিং ততো টাইট হতে থাকে এবং আগে যত চাপে যত দেবে যেতো এখন তত দেবে যায়না, তার সমানুপাতিক বা সরল-রৈখিক চরিত্রটি আর থাকেনা। ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে আগে যার স্থিতিস্থাপক বস্তুগুণ ছিল এখন তাতে আরো কিছু ব্যাপার উচ্চকিত হচ্ছে। চাপটি যদি একটি ন্যূনতমের মধ্যে রাখতাম তা হলে এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হতোনা- আসন্ন ওই সরল-রৈখিক আচরণ ধরে নিতে পারতাম, কিন্তু চাপ তার বাইরে গেলে আর পারবোনা। তখন চাপের সঙ্গে দেবে যাওয়ার গ্রাফ আঁকলে আর সরল রেখা পাবনা, এক রকমের বক্র রেখা পাব। আরো নতুন নতুন জটিলতা পরবর্তী ধাপগুলোতে আস্‌লে ওই যে রেখা তা আরো জটিল রকমের বক্র হবে।

ওই রেখাটির যদি একটি সমীকরণ দাঁড় করাই যাতে বামে চাপটি থাকবে আর ডানে দেবে যাওয়ার পরিমাণ $x$ রয়েছে এমন কিছু রাশি, তাহলে বক্র রেখার জন্য সেই সমীকরণে ডানে একাধিক রাশির যোগফল থাকে। এর থেকে শুধু প্রথম রাশিটা যদি রাখি তা হলে দেখবো তাতে আছে দেবে যাওয়ার পরিমাণের $(x)$ প্রথম পাওয়ারটি $x^1$, সঙ্গে একটি ধ্রুবক সংখ্যা $A$ দিয়ে গুণ করে, অর্থাৎ সেটি $Ax$। এটি সরল রেখার সমীকরণ, এই আসন্ন হিসেবে স্প্রিং সরল-রৈখিক। কিন্তু সত্যিকার ফল পেতে এই প্রথম রাশিটির সঙ্গে আরো কিছু রাশি যোগ করতে হয়। এভাবে দ্বিতীয় রাশিটি $Bx^2$ যেখানে $x$ এর দ্বিতীয় পাওয়ার $x^2$ এসেছে, তৃতীয়টি $Cx^3$, এমনি ভাবে হতে পারে একটি সহজ গাণিতিক প্রকাশে। $B$, $C$ ইত্যাদি বিভিন্ন ধ্রুবক আর $x$ এর পাওয়ার প্রত্যেক পরবর্তী রাশিতে বাড়তে থাকে। এটি একটি সাধারণ সহজ গাণিতিক ব্যবস্থা, আমরা স্প্রিং বা এরকম অনেক কিছুর ওপর আরোপ করে থাকি এবং তা বাস্তবের সঙ্গে মিলেও যায়। দ্বিতীয় রাশির মান প্রথমটির থেকে অনেক কম– অর্থাৎ এর দ্বারা যেটুকু যোগ (অথবা বিয়োগ) হচ্ছে তা বড় কিছু নয়, তার পরেরটি আরো ছোট, তার পরেরটি আরো। এতে ক্রমাগত আমরা একটি স্প্রিং এর আসল বাস্তব আচরণের কাছাকাছি যেতে থাকবো বটে কিন্তু বিজ্ঞানী প্রকৃতির থেকে যে সারল্য চান তা আর সেখানে থাকেনা, তার মধ্যে সরল নিয়ম বলে কিছু পাওয়া যায়না। তবে তিনি এভাবে তাঁর মত করে শুধু প্রথম দু'একটি ধাপ নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে যথাসম্ভব সরল নিয়ম আরোপ করেন। এগুলো কতটা

আসল প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনা হচ্ছে এনিয়ে তাঁর সন্দেহ থেকে যায় বলেই নিজের বোঝার ভঙ্গিটি নিয়ে চিন্তিত হন।

স্প্রিং জিনিসটি দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত, এর আচরণের বিজ্ঞানটিও আমাদের বহুকাল পরিচিত চিরায়ত পদার্থবিদ্যার একটি সহজ উদাহরণ। কিন্তু আসন্ন পদ্ধতির ব্যবহার পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সর্বত্র রয়েছে। আধুনিকতম পদার্থবিদ্যা সেই চিরায়ত পদার্থবিদ্যা থেকে বের হয়ে যেই কোয়ান্টাম তত্ত্বে এসেছে সেখানেও বিজ্ঞানীকে আসন্ন প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হতে হয়। অণু-পরমাণুর আকারের অতি ক্ষুদ্র জিনিসকে বুঝতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া উপায় নেই। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এমন ক্ষুদ্র বস্তুকে এক ধরণের তরঙ্গ হিসেবে দেখতে হয়। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ পানির তরঙ্গকে পানির ওঠানামা হিসেবে যেভাবে নেয়া যায় এই বস্তু-তরঙ্গকে যে রকম কিছুর ওঠানামা হিসেবে নেবার উপায় নেই ওটি শুধু একটি গাণিতিক ওঠানামা- তরঙ্গ-ফাংশান নামে পরিচিত গাণিতিক রাশির, যা কিনা ওই ক্ষুদ্র বস্তুটির যাবতীয় অবস্থার সম্ভাবনাগুলো বলে দিতে পারে। কাজেই কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি কণিকার আচরণ বুঝতে হলে তার ওই তরঙ্গ-ফাংশানটি গণিতের মাধ্যমে বের করতে হয়। তখনো অবশ্য আমরা কণিকাটি এক মুহূর্ত থেকে পরের মুহূর্তে, স্থানের এক বিন্দু থেকে পরের বিন্দুতে কী ভাবে যাচ্ছে তা অনুসরণ করার মত বর্ণনা পাইনা। যা পাই তা হলো এক এক বিন্দুতে বা সময়ে তাকে পাওয়ার সম্ভাবনাটি শুধু– অর্থাৎ ধরা যাক ১০০ বার ওখানে তার উপস্থিতি নির্ণয় করার জন্য পরিমাপ করলে কতবার তাকে সেখানে পাব, সেই তথ্যটি। কিন্তু এই জানাটিই ওই ক্ষুদ্র কণিকার জগতের ব্যাখ্যা নিখুঁত ভাবে দিতে পারে– একমাত্র এভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বই শুধু তা দিতে পারে।

সমস্যা হলো ওই তরঙ্গ-ফাংশানটি নির্ণয়ের জন্য একটি সমীকরণ খাড়া করতে হয় ও তার সমাধান করতে হয়। তা একেবারে পূর্ণ শুদ্ধ ভাবে করা সম্ভব হয় শুধু একটি কণিকার জন্য; যার খবর জানার চেষ্টা করছি সেটি যদি একের বেশি দুটি কণিকাও হয় তাহলেও সমীকরণটির পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয়না। যেমন সব চেয়ে হালকা এটম হাইড্রোজেনের জন্য এমন সমাধান সম্ভব কারণ নিউক্লিয়াস বা এটম-কেন্দ্রে রয়েছে একটি মাত্র প্রোটন কণিকা, এবং আর রয়েছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। কিন্তু এর পরের এটম হিলিয়ামে গেলে সেটির নিউক্লিয়াসে দুটি প্রোটন ও বাইরে দুটি ইলেকট্রন থাকে বলে তার সমাধান সম্ভব

নয়, অর্থাৎ তরঙ্গ-ফাংশানের সমীকরণ সমাধান করে কোয়ান্টাম তত্ত্ব হিলিয়ামের খবর দিতে পারেনা। আরো বেশি কণিকা যেখানে জড়িত যেমন এর থেকে ভারী এটম, বা এটম দিয়ে গড়া অণু, বা এটমের সমন্বয়ে তৈরি বস্তুর টুকরা ইত্যাদির বর্ণনা ওভাবে পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। ব্যাপারটি এমন দাঁড়ালো যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব হাইড্রোজেন এটমের মধ্যে তার একটি মাত্র ইলেকট্রনের অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলেও আর কোন কিছু ইলেকট্রন পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হয়না।

এই সমস্যাকে বিজ্ঞানীরা এড়িয়ে যেতে পেরেছেন ওই আসন্ন হিসেবে সন্তুষ্ট থেকে। তবে ওই আসন্ন সমাধানও এমন নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী দিতে পারে যে তাতে সব কিছুর চমৎকার ব্যাখ্যা মেলে। হাইড্রোজেন ছেড়ে শুধু তার থেকে সামান্য জটিল পরের এটম হিলিয়ামে গিয়ে আমরা ব্যাপারটি দেখতে পারি। এখানে একটির বদলে দুটি ইলেকট্রন হওয়াতেই সরাসরি সমাধান অসম্ভবের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। হাইড্রোজেন এটমে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কাজটি হলো ধনাত্মক চার্জের নিউক্লিয়াসের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তার একটি মাত্র ইলেকট্রনের জন্য তরঙ্গ-ফাংশানের সমীকরণ দাঁড় করানো। কিন্তু হিলিয়ামের দুটি ইলেকট্রনের প্রত্যেকটিকে থাকতে হয় তার ধনাত্মক নিউক্লিয়াস এবং অন্য ইলেকট্রনটির সৃষ্ট মিলিত ক্ষেত্রের মধ্যে। দুই ইলেকট্রনের পরস্পর বিকর্ষণ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত জটিল করে তোলে। একে তাই আসন্ন হিসেবে নেয়া ছাড়া উপায় থাকেনা, সেটি করার একটি উপায়কে বলা হয় 'পারটারবেশন' পদ্ধতি– যার মানে খানিকটা 'নাড়িয়ে দেয়ার' পদ্ধতি।

এতে হিলিয়ামের জটিলতার কথা প্রথমে সম্পূর্ণ ভুলে থেকে সরল হাইড্রোজেন এটমের মত করেই সমীকরণটি খাড়া করা হয়। ধরে নেয়া হয় যে এতে প্রত্যেক ইলেকট্রন শুধু নিউক্লিয়াসের দুটি প্রোটনের ক্ষেত্রের মধ্যেই আছে, অন্য ইলেকট্রনটির উপস্থিতির কথা এটি জানেইনা। তরঙ্গ-ফাংশানের জন্য যে সমীকরণ তার সমাধান করে তরঙ্গ-ফাংশান যেমন পাওয়া যায় তেমনি ইলেকট্রনের শক্তিমাত্রাও পাওয়া যায়। আপাতত হাইড্রোজেনের মত ধরে নেয়া হিলিয়ামের প্রত্যেক ইলেকট্রনের তরঙ্গ ফাংশান ও শক্তিমাত্রা ঠিক হাইড্রোজেনের মত করেই জানা যায়, যেন অন্য ইলেকট্রনটি ওখানে আদৌ নেই। পরে এভাবে পাওয়া দুটি ইলেকট্রনের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে পাওয়া দুটি শক্তিমাত্রা যোগ করে নিলে আপাতত হিলিয়ামের পুরো শক্তিমাত্রাটি পাওয়া

যায়। আর পুরো হিলিয়ামের তরঙ্গ-ফাংশানও আপাতত পাওয়া যায় অন্য ইলেকট্রনের উপস্থিতি ভুলে থাকা অবস্থায় প্রত্যেক ইলেকট্রনের জন্য যে তরঙ্গ ফাংশান পাওয়া গেল, সেই দুটির গুণফল হিসেবে।

আপাতত ওই যা করা হলো সেটি প্রকৃত হিলিয়ামের জন্য নয়, বরং বলা যায় প্রত্যেকবার দ্বিতীয় ইলেকট্রনের কথা ভুলে থেকে হিলিয়ামের একটি আসন্ন পরিস্থিতির জন্য। একে প্রকৃত হিলিয়ামের ফলাফলের কাছে আনতে হলে তার সঙ্গে একটি সংশোধনী যোগ করতে হবে। তা করলে এটি ওই আপাতত পাওয়া ফলাফলকে কিছুটা নাড়িয়ে দেবে, সে জন্যই এই যোগ করা বাড়তি অংশটি একটি 'পারটারবেশন'। সংশোধনী যোগ করার আগে আপাতত যেই ফল তাতে কোন পারটারবেশন যোগ করা হয়নি বলে তাকে বলা যায় শূন্য মাত্রার পারটারবেশন। তারপর ওই প্রথম সংশোধনীটিকে বলা হয় প্রথম মাত্রার পারটারবেশন। সংশোধনীটি হিসেব করা হয় খুবই সুন্দর গাণিতিক কৌশলে। কিন্তু তারপরও প্রকৃত হিলিয়ামের সঙ্গে তার এখনো কিছুটা ফাঁক থেকে যায়। এই ফাঁক আরো কমাবার জন্য দ্বিতীয় মাত্রার আর একটি পারটারবেশন যোগ করতে হয়। মূল আপাত ফলের তুলনায় প্রথম মাত্রার পারটারবেশন ছিল অনেক ছোট। কাজেই কোন সংশোধনী যোগ না করলেও ফলাফলের আপাত একটি ধারণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মাত্রাটি আরো অনেক ছোট, সহজে তুচ্ছ করা যায়। তবে এই বাড়তি সংশোধনী করতে চাইলে তুলনামূলক ভাবে আরো কঠিন কৌশলে সেই পারটারবেশনও হিসেব করা যায়। এভাবে পর পর আরো পারটারবেশন এনে হিলিয়ামের প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব, পরপর সংশোধনীগুলো অবশ্য ছোট থেকে ছোট হতে থাকে এবং তুচ্ছ করা সহজ হয়। তবে এর দ্বারা এও বোঝা যাচ্ছে হিলিয়ামের মত সাদামাটা সরল এটমের জন্যও একেবারে প্রকৃত সমাধান কখনো আসবেনা। স্পষ্টত বিজ্ঞানী এখানে প্রকৃতির হিলিয়ামের আচরণের নিয়মটি নিংড়ে বের করছেন, ধাপে ধাপে একটু একটু করে তার কাছে যাবার চেষ্টা করছেন; কিন্তু তিনি বরাবর জানেন তুলনামূলক ভাবে সরল এই হিলিয়ামটুকুও অনেক জটিল– কখনো হুবহু ধরা দেবেনা।

এসব কারণে বিজ্ঞানী মনে করতে পারেন তাঁর যে জীবন-সাধনা প্রকৃতির পরম সত্যের নাগাল পাওয়া তা তাঁর কাছে এক রকম অধরা থেকে যায়। এই পরতে পরতে প্রকৃতির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে তাঁর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে

প্রকৃতিতে তাঁর নিজের মনের সন্তুষ্টি জাগার মত কোন নিয়ম আদৌ আছে কিনা। হ্যাঁ তিনি প্রকৃতিতে অনেক নিয়ম আবিষ্কার করেছেন বটে কিন্তু প্রায়শ তা এসেছে তাঁর ধরে নেয়া কিছু সীমার মধ্যে মানা নিয়ম রূপে। ওই সীমার মধ্যে বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে অত্যন্ত সুন্দর, অনেক সময় বেশ সরল নিয়মে উপস্থাপিত করতে পারেন। ওই সীমার বাইরে তা কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়। অবশ্য বিজ্ঞানী সেখানেও আরো একটি সূক্ষ্ম সীমার ভেতরে তাকে এখনো কিছু নিয়মে আনতে পারেন। এভাবে প্রকৃতি একেবারে অধরা থাকেনা, অনেকটা চতুরার মতো একটু একটু করে নিজেকে নিয়ম মানা সত্ত্বা হিসেবে তুলে ধরতে পারে; তবে তার জন্য বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কের কল্পনা প্রয়োজন।

আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীও বুঝতে পারেন যে প্রকৃতির সব কিছু বোঝার সংকল্প করে বিজ্ঞানী একটি খুব বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। সে চ্যালেঞ্জটি যে কত বড় সেটি বিজ্ঞানীই বুঝতে পারেন, ব্যাপারটির অসম্ভব জটিলতাও তিনিই বোঝেন ভাল। সে জন্যই প্রকৃতিকে ধরা দিতে দেখে তিনিই বিস্মিত হন সব চেয়ে বেশি।

# রান্নার রেসিপি এবং নিটোল গল্প

বর্ণনার তত্ত্ব

আমরা রূপকথা, কাব্য, মহাকাব্য ইত্যাদি নিয়ে যত কথা বলেছি– বিজ্ঞান কোন কোন ক্ষেত্রে এমন উপভোগ্য সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠতে পারেনা, প্রকৃতিকে খোলাসা করার মত তত্ত্ব তখনো খুঁজে পায়না বলে। যুগে যুগে সেটি ঘটেছে, এখনো ঘট্ছে। বিজ্ঞান তখন নিজেকে নিছক অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তখন তার লক্ষ্য থাকে অভিজ্ঞতা থেকে একটি ফর্মুলা বানিয়ে প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা। প্রকৃতির ঘটনার মধ্যে একটি ব্যাপারের সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক সেই ফর্মুলায় ধারণ করা হয়, যা মূলত ওই বার বার পুনরাবৃত্তি হওয়া দেখে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পাওয়া যায়। একবার যদি ওই ফর্মুলার সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, তা হলে জানা উপাত্তগুলো ফর্মুলার মধ্যে দিয়ে অজানা উপাত্তগুলো তার থেকে হিসেব করে পাওয়া সম্ভব। ওভাবেই এর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতাটি আসে। এটি অনেকটা রান্নার রেসিপির মত- কিসের সঙ্গে কী দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে তার ফলস্বরূপ কী পাব সেটিই বলে দেয়। একে অনুসরণ করলে ওই ফল সব সময় আশা করবো, কারণ রেসিপিটি অতীতে ওভাবে বহুবার অনুসরণের অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। এতে কোন কিছু আন্দাজের ব্যাপার নেই, কল্পনার বিষয় নেই, তাই কোন সৃষ্টিকর্মও নেই, এসব নেই বলে এর সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহও কম। এমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আমরা বল্তে পারি অভিজ্ঞতা বর্ণনামূলক তত্ত্ব।

এখানে আবিষ্কারটি হলো সেই ফর্মুলা বা সূত্রটির আবিষ্কার। এর জন্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন বাস্তব ব্যাপারগুলোর খুঁটিনাটি পরিমাপ করতে হয়। এসব উপাত্তের মধ্যে কোন প্যাটার্ন দেখা যায় কিনা এবং সেই প্যাটার্ন সব সময়ই একই ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে কিনা এটি বুঝতে পারাই বড় কথা। কোন কোন বিজ্ঞানে এই প্যাটার্ন গাণিতিক ফর্মুলার আকারে আসতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে তা নয়। অবশ্য গাণিতিক মডেলিঙের প্রয়োজনে সব ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভাবে তাকে কম্পিউটার প্রসেসিঙের উপযুক্ত করে নেয়া আজকাল সম্ভব হয়। তবে বর্ণনামূলক তত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রাচুর্য প্রাচীন বিজ্ঞানে বেশি ছিল– বিশেষ করে হাজার পাঁচেক বছর আগে লিপি উদ্ভাবনের পর থেকে সেই আদি লিপিতে লেখা

দলিলে আমরা ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও চৈনিক সভ্যতার আবিষ্কৃত জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে এমনি বর্ণনামূলক তত্ত্ব দেখেছি। যেমন চাঁদ, সূর্য, গ্রহ ইত্যাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ থেকে ক্যালেন্ডার, পঞ্জিকা, ক্যাটালগ ইত্যাদি রূপে। গতিবিধির উপাত্তের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্যাটার্ন দেখা গিয়েছে বলেই ওসব সম্ভব হয়েছে– যার থেকে জোয়ার-ভাটা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য দীর্ঘ সময় ধরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আকাশ পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, পরস্পরের পরিমাপের তুলনা, সব উপাত্তের ক্যাটালগ তৈরি ইত্যাদি করতে হয়েছে। ভাল পরিমাপ পদ্ধতি ও তার গণিতেরও প্রয়োজন হয়েছে। কাজেই বর্ণনামূলক তত্ত্বের ইতিহাস খুবই প্রাচীন এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য সেকালে অধিকাংশের কাছে এটিই যথেষ্ট মনে করা হলেও, এরকম তত্ত্ব এখন বিজ্ঞানীর আসল লক্ষ্য নয়। ওই প্রাচীন গুরুত্ব আমরা চমৎকার বুঝতে পারি তখনকার পাওয়া লিখিত দলিল থেকে। যেমন কাদার পাটার ওপর একই ছোট্ট সীল নানা ভাবে মেরে যে কিউনিফর্ম লিপি পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে (বর্তমান ইরাক) লেখা হতো। উদাহরণ স্বরূপ 'ভেনাস ট্যাবলেট' বা শুক্রগ্রহ পাটা নামে পরিচিত শ' খানেক লিখিত পাটা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে এবং তার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। এতে শুক্র গ্রহের গতিবিধির রেকর্ড রাখা হয়েছে– বছরের পর বছর প্রতি রাত এই গ্রহ পর্যবেক্ষণ করে। এমনি ভাবে সেখানে আরো বহু কাদার পাটার লিপিতে, এবং মিশরে প্যাপিরাস নামের প্রাচীন কাগজের ওপর হিরোগ্লীফ অর্থাৎ চিত্রলিপিতে লেখা দলিলে আমরা এমনি বর্ণনামূলক তত্ত্ব দেখতে পাই– বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে। এগুলোকেই আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগের বিজ্ঞান গ্রন্থ বলা যায়।

তারপর থেকে আজ অবধি এরকম অভিজ্ঞতা বর্ণনামূলক তত্ত্ব বিজ্ঞানের সব শাখায় প্রচুর রয়েছে– অনেক সময় আপাতত এরকম তত্ত্বের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকেনা। এতে অনেকটা কাজ চলে যায়, কারণ তাত্ত্বিক হিসেব নিকেষে অথবা ব্যবহারিক কাজে এর ফলাফলের চমৎকার প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এরকম তত্ত্বে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়– সেটি হলো কেন ঘটনাগুলো ওভাবে ঘট্‌ছে। যেমন ওই প্রাচীন জ্যেতির্বিদ্যায় চাঁদ-সূর্য সব কী ভাবে চল্‌ছে, কখন সেগুলোকে কোথায় দেখা যাবে ইত্যাদি সব প্রশ্নের উত্তর ছিল বটে কিন্তু কেন সেগুলো ওভাবে চলে, কেন ওই নিয়মগুলো মেনে চলে তা জানার কোন

চেষ্টা এমন তত্ত্বের মধ্যে নেই। অর্থাৎ এতে 'কী' 'কীভাবে' ইত্যাদি প্রশ্ন করা হলেও 'কেন' এই প্রশ্নটি তার মধ্যে ছিলনা, কখনো বর্ণনামূলক তত্ত্বগুলোতে তা থাকেনা। এর মানে অবশ্য ধরে নেয়া উচিত হবেনা যে কেন প্রকৃতি ওভাবে আচরণ করছে সেই ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের কোন কৌতূহল ছিলনা। হয়তো প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান বলতে যেই পর্যবেক্ষণের ওপর তাঁদেরকে প্রধানত নির্ভর করতে হতো শুধু ওই পদ্ধতির মধ্যে সেই কৌতুহল মেটাবার, সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপায় ছিলনা। তাঁরা হয়তো সেই সময় এ নিয়ে নানা কল্পনা করেছেন, যেমন হয়তো ওগুলোকে দেবদেবীর কাজ হিসেবে দেখেছেন– যেমন আকাশে বজ্রের গর্জন ও চমক কেন হচ্ছে বলতে দুই দেবতার মল্লযুদ্ধে বজ্রের সৃষ্টি হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু সে সব কোথাও কোথাও উল্লেখিত হলেও তা পরে বিজ্ঞানের রাজ্যে ধোপে টেকেনি।

আজকের বিজ্ঞানীরা অবশ্য ওভাবে বিজ্ঞানের হাল ছেড়ে দেননা – তাঁরা অবশ্যই 'কেন' প্রশ্নটিরও বৈজ্ঞানিক জবাব দেবার চেষ্টা করেন এবং প্রায়ই তাতে সফল হন; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর সময় লেগে যায় এতে। তাই প্রাচীন কালের মত তাঁদেরকেও কখনো কখনো এই বর্ণনামূলক তত্ত্বেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এতে অবশ্য বিজ্ঞানীর মন ভরেনা– বিজ্ঞান নামের ওই অনবদ্য মহাকাব্যের মধ্যে সুন্দর খাপ খাইয়ে যাওয়ার মত কার্য-কারণের যুক্তি বিস্তার করা তাতে হয়ে ওঠেনা- যা বিজ্ঞানীর আসল লক্ষ্য। আপাতত কাজ সারার মত করেই বর্ণনামূলক তত্ত্বের ওপর তাঁদেরকে নির্ভর করতে হয় যতদিন পর্যন্ত কারণ ব্যাখ্যা করে নিটোল একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব না পাওয়া যাচ্ছে। ওই যে মন না ভরা সেটির দিকে লক্ষ্য করে অনেকে বর্ণনামূলক তত্ত্বকে মজা করে 'কুক্ বুক সায়েন্স' বা রান্নার রেসিপির মত বিজ্ঞান বলে থাকেন। রান্নার রেসিপিটি খুব কাজে দেয়, কোন্ জিনিস কতখানি নিয়ে কতক্ষণ কী রকম তাপ দিলে কেমন মজাদার খাবার আমরা পাব তার বর্ণনা ওখানে থেকে পেয়ে কার্যক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হয়। কিন্তু কেন এসব হয় তার কোন ব্যাখ্যা থাকেনা বলে এই রেসিপিও বর্ণনামূলক তত্ত্বের মত।

## ব্যাখ্যার তত্ত্ব

যে রকম তত্ত্ব পেলে বিজ্ঞানীরা খুশি হন তা রান্নার রেসিপির মত তত্ত্ব নয় বরং একটি নিটোল গল্পের মত তত্ত্ব। এই গল্প নিটোল কারণ এতে সব ঘটনার

ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। সেই ব্যাখ্যাটিকে কল্পগল্প বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তার পেছনের যুক্তির প্রমাণ ও বাস্তব পরীক্ষার প্রমাণ তাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত করে। আগের অধ্যায়গুলোতে সে সব তত্ত্বের কথা আমরা দেখেছি তা তেমনি বিজ্ঞানীদের সন্তুষ্টি জাগাবার মত ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব। ওই প্রাচীন ব্যবিলন বা প্রাচীন মিশরে প্রথম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে আমরা এরকম ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব বেশি খুঁজে পাইনি বটে, কিন্তু তার দু'তিন হাজার বছর পর প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেই তা যথেষ্ট ছিলো। বল্‌তে গেলে গ্রীক দার্শনিকদের মানসিকতাটিই ছিল এমন যে একেবারে আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা একটা খুঁজে বের করতে না পারলে তাঁদের মন মোটেই ভরতোনা। এর আগের বিজ্ঞান প্রধানত পর্যবেক্ষণ নির্ভর হলে গ্রীক দার্শনিকরা তার সঙ্গে একটি খুবই শক্তিশালী নতুন পদ্ধতি যোগ করে, তা হলো 'থিওরি'। তাঁরাও যে পর্যবেক্ষণ করেননি বা বর্ণনামুলক তত্ত্ব দেননি তা নয়, বরং তাঁরা সেগুলোও আগের থেকে অনেক ভালভাবে করেছেন। তবে তাঁদের আসল পরিচয় ছিল থিওরি দেয়া তাত্ত্বিক হিসেবে। কিসের কারণে কী ঘটেছে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য আন্দাজ করে কল্পতত্ত্ব দেয়াটাই থিওরি।

ওরকম কল্পতত্ত্ব দেবার ব্যাপারে আরো একটি পদ্ধতিকে তাঁরাই তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন যেটি এ কাজে খুব সহায়ক হয়েছিলো, সেটি হলো এ্যাবস্ট্রাকশান– অর্থাৎ সবকিছুকে বিমূর্ত জিনিসে রূপান্তরিত করার একটি প্রবণতা। বিমূর্ত করে দেখার বিষয়টি গ্রীকরাই যে শুরু করেছেন তা নয় তারও বহু হাজার বছর আগে যাঁরা সংখ্যা ব্যবস্থা, গণিত ইত্যাদি প্রবর্তন করেছেন তাঁরাও সেগুলোকে বাস্তবতার উর্ধ্বে বিমূর্ত জিনিস হিসেবেই করেছেন। গ্রীকরা একেই আরো অনেক দূর নিয়ে গেলেন সবকিছুকে গাণিতিক, বিশেষ করে জ্যামিতিক আইডিয়া হিসেবে দেখার একটি জোরালো দর্শন প্রবর্তন করে। বিভিন্ন যুগের গ্রীক দার্শনিক পীথাগোরাস, প্লেটো প্রমুখের প্রবর্তিত এই মতবাদকে বলা হয় আইডিয়ালিজম। যেমন প্লেটোর প্রায় সমসাময়িক ইউক্লিড যখন বহু কালের গ্রীক জ্যামিতিকে একটি সুন্দর যৌক্তিক পরম্পরায়ে বদ্ধ করে তাঁর 'ইলিমেন্ট' নামক বিখ্যাত জ্যামিতির গ্রন্থটি লিখলেন তার মৌলিক উপাদানই ছিল আইডিয়ালিজম এবং বিমূর্ত জিনিস। এই জ্যামিতিই আমরা সবাই স্কুলে কিছুটা পড়েছি, ইউক্লিডের বিভিন্ন থিওরেম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছি। যেমন শুরুতেই বিন্দু কী এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে 'যার অবস্থান আছে কিন্তু আয়তন নেই'। কোন সত্যিকারের জিনিস আয়তন-বিহীন হতে পারেনা তা সে যত ছোট আয়তনই হোক। একমাত্র কাল্পনিক বিমূর্ত বিন্দুর পক্ষেই তা সম্ভব। প্লেটো

আপ্ত বাক্যের মত বলেছেন যে ধরাছোঁয়ার জিনিসের কোন গুরুত্ব দর্শনে নেই, আছে শুধু তার আইডিয়ার গুরুত্ব। প্লেটোর এই চরম আইডিয়ালিজম তখনকার সব বিজ্ঞানীও গ্রহণ করেননি, তাঁর ছাত্র এরিস্টোটলও নয়। তবে তা যে তখনকার ও পরবর্তী বিজ্ঞানের ওপর, বিশেষ করে আজকের আধুনিকতম বিজ্ঞানের ওপর দারুণ প্রভাব রেখেছে তা স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞান তখন থেকেই থিওরি দেবার জন্য একে মুক্ত হস্তে ব্যবহার করেছে।

গ্রীকরা তাঁদের কল্পতত্ত্বকে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন দার্শনিকের ভঙ্গিতে যুক্তি-তর্ক দিয়ে। সেই যুক্তির বিদ্যাটি মানুষের মস্তিষ্কে সব সময় থাকলেও লজিক নামে গ্রীকরাই তাকে পূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন– বিশেষ করে এরিস্টোটলের 'লজিক' গ্রন্থে। তাঁরা যে গণিত ব্যবহার করেছিল তাও খুবই সৌকর্যময় লজিক ছাড়া কিছু নয়, সব গণিতই তাই। এই যুক্তির গুণে তাঁদের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ওপর অন্য বিজ্ঞানীদের দৃঢ় আস্থার সৃষ্টি হতো, কোন কোনটিতে আস্থা আরো দু'হাজার বছর টিকে ছিলো– যদিও এর অনেক তত্ত্বই ছিল ভুল। ভুল তত্ত্ব দেয়া সহজ হয়েছে তার কারণ অধিকাংশ গ্রীক বিজ্ঞানী তাঁদের নিজেদেরই দেয়া আর একটি পদ্ধতিকে অবহেলা করেছিলেন সেটি হলো এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ, সেটি আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অবশ্যকরণীয় পদ্ধতি। তা সত্ত্বেও গ্রীকদের অনেক ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব আজকের আধুনিক তত্ত্বগুলোর ওপর নিঃসন্দেহে প্রচুর প্রভাব রেখেছে। গ্রীকদের এসব তত্ত্ব বর্ণনামূলক তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে গিয়েছে, সুন্দর নিটোল গল্প হিসেবে বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে। এমনি একটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রাচীন তত্ত্ব হলো গ্রীক এটমিক থিওরি, চমৎকার কল্পতত্ত্ব, যা মূলত ওই আইডিয়ালিজমেরই একটি প্রকাশ।

আজ থেকে ২,৩০০ বছর আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমেক্রিটাসকেই এটমিক থিওরির প্রধান প্রবক্তা মনে করা হয়। যাবতীয় বস্তু কী ভাবে গড়া তার উত্তর দিতে তিনি বল্‌লেন সব বস্তুর মধ্যে তার একেবারে মৌলিক উপাদান এটমটিই একমাত্র বাস্তবতা। বস্তুর বাকি সব রূপ যা আমরা দেখি তার সবই ওই এটমের নানা বিন্যাস মাত্র। কোন বস্তুকে ক্রমাগত কেটে কেটে ভাগ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এমন একটি পর্যায় আসবে যাকে আর কাটা যাবেনা- সেটিই হলো ওই মৌলিক উপাদান এটম। এটম শব্দটার মানেই গ্রীক ভাষায় 'কাটা যাবেনা' অর্থাৎ অবিভাজ্য। এই সব কিছু কিন্তু ডেমেক্রিটাসের কল্পনা মাত্র সত্যি সত্যি

কেটে দেখার ব্যাপার নয়। তাঁর কল্পনা ওখানেই থামেনি– তিনি এক এক বস্তুর এটমের জন্য এক একটি আকৃতিও কল্পনা করলেন ওই বস্তুর নিজের গুণাগুণের কথা মাথায় রেখে। যেমন লোহা শক্ত ও নিরেট কঠিন জিনিস, তার এটমগুলো পরস্পরের সঙ্গে একেবারে আঁটসাট হয়ে থাকাটি স্বাভাবিক। এটি করতে পারার জন্য লোহার এটমে আংটা হুড়কা ইত্যাদি আছে। অন্যদিকে পানির এটমকে হতে হবে মসৃণ যেটি পানিকে করে তুলবে প্রবহমান ও পিচ্ছিল। তবে মূল কথাটি হলো এটমকে আর ভাগ করা যাবেনা। সেই সঙ্গে ডেমোক্রিটাসের এটমের তত্ত্বে আরো একটি মূল কথা কল্পনা করতে হলো। দুটি এটম আলাদা দুটি জিনিস– এরা কখনো দুটি মিশে যেতে পারেনা। তাদের মাঝখানে যে ফাঁক সেখানে আর কোন বস্তু থাকতে পারবেনা, কারণ বস্তু মানে তো আবার সেই এটম। ফাঁকটুকু তাই শূন্যস্থান– ভ্যাকুয়াম। এটমিক থিওরির সঙ্গে তাই শূন্যস্থানের অস্থিত্বটি অনিবার্য ভাবে চলে এসেছে। এটমের ধারণার মত তখন এটিও ছিল খুবই অভিনব একটি কল্পনা।

ডেমোক্রিটাস যখন এটম সম্পর্কীয় এই তত্ত্ব দিয়েছেন সে সময় এটি এবং গ্রীক দার্শনিকদের অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও শুধু মাত্র যুক্তি-তর্কের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতো। কল্পতত্ত্বকে বা সেখান থেকে যুক্তির মাধ্যমে গৃহীত ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণ করার কোন গরজ ছিলনা। কাজেই বিপরীত যুক্তি দিয়ে তত্ত্বকে বিরোধিতা করার সুযোগও বেশি ছিল। এটমিক থিওরির পক্ষে অনেক দার্শনিকের প্রচুর সমর্থন যেমন ছিল, তেমনি এর বিরোধী পক্ষও প্রবল শক্তিশালী ছিল। এটি এত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ছিল যে তখনকার দার্শনিকরা 'এটমিস্ট' ও 'এন্টি-এটমিস্ট' এই দুটি দলেই বিভক্ত ছিল এবং মূল আবিষ্কর্তা ছাড়াও পক্ষের অনেকে যেমন নতুন নতুন যুক্তি দিয়ে একে সমর্থন জানিয়েছেন, বিপক্ষেও তাই হয়েছে। ডেমোক্রিটাসের সমসাময়িক এরিস্টোটল ছিলেন বিপক্ষের সব থেকে বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁর যুক্তি ছিল বস্তুকে যদি কল্পনায় বিভক্ত করতেই থাকি তা হলে সেটি অসীমভাবে করতে পারা উচিত, এটমে এসে থেমে যাওয়ার কোন কারণ নেই। অন্য বিরোধীরা আরো যুক্তি দিয়েছেন এটমের যে আকৃতির কথা বলা হয়েছে তাতে তার একাধিক পৃথক তল থাকার কথা; যদি দুটি তলও থাকে তাহলে তল দুটিকে আলাদা করে এটমকে বিভক্ত করা সম্ভব। ফলে এই যুক্তিতে এটম থাকতে পারেনা। অবশ্য এটমিস্টদেরও যুক্তি ছিল এই কথা নাকচ করে। এটমিক থিওরির বিরোধিতা করার পেছনে এরিস্টোটলের আরো বড় যুক্তি ছিল শূন্যস্থানের অস্থিত্ব অস্বীকার

করা। এরিস্টোটলের মতে কোন স্থান কখনো বস্তু-শূন্য থাকতে পারেনা- কিছু না কিছু গিয়ে ওই জায়গাটি দখল করবেই– তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল 'প্রকৃতি শূন্যস্থানকে পছন্দ করেনা'।

এটমিস্ট আর এন্টি-এটমিস্টদের যুক্তি এবং বিপরীত যুক্তির পালাটি কিন্তু গ্রীক আমলে শেষ হয়নি, মধ্যযুগের ইসলামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এটি চলেছে– এবং যুগে যুগে ওভাবে এটমিক থিওরির ধারণাটি বজায় থেকেছে। কিন্তু বরাবর এটি একটি কল্পতত্ত্বই থেকে গেছে, যদিও মধ্যযুগে তার সঙ্গে মনে মনে করা কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্টের মত যুক্তিও যোগ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুতে এসে ওই প্রাচীন এটমিক থিওরির অন্য আদর লাভ করে নতুন বিজ্ঞান কেমিস্ট্রির কাছ থেকে। আধুনিক কেমিস্ট্রি প্রথমে এটমকে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের মূল উপাদান হিসেবে ক্ষুদ্র মার্বেলের মত একটি নিরেট কণিকা হিসেবে নিয়েছে, এবং এর ভিত্তিতে কেমিস্ট্রির মৌলিক তত্ত্বগুলো দিয়েছে যা এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণও করেছে। যেমন দুই ভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ অক্সিজেন পানির মধ্যে পাওয়ার ঘটনা থেকে তাঁরা কল্পনা করেছেন দুটি হাইড্রোজেন এটম ও একটি অক্সিজেন এটম মিলে পানির একটি অণু গড়ার কথা। পরে আধুনিক পদার্থবিদ্যা অবশ্য দেখিয়েছে যে এটম ওরকম নিরেট কিছু নয়, অবিভাজ্যও নয়, এর নিজের ভেতরেই রয়েছে আরেক জগত– এটমিক জগত। আধুনিক কেমিস্ট্রিও এই নতুন এটমিক তত্ত্বেরই অধীন এখন। কিন্তু সব কিছুর পেছনে ২৩০০ বছরের প্রাচীন ডেমোক্রিটাসের এটমিক তত্ত্বের অবদান ও প্রভাবটি কিন্তু মোটেই কম নয়, যদিও তার সঙ্গে আধুনিক এটমিক তত্ত্বের মিলটিও খুব বেশি নয়। হাজার হলেও তখনই তো ব্যাখ্যামূলক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের শুরু হচ্ছিলো হাঁটি হাঁটি পা পা করে– সমস্ত বস্তু জগতকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার একটি বিরাট দুঃসাহস নিয়ে। এই জন্য দৃঢ়-চিত্তে কল্পনা করে তাকে যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে কার্পণ্য করেননি তাঁরা, যেই প্রক্রিয়া কমবেশি বিজ্ঞানীরা এখনো অনুসরণ করছেন।

## বর্ণনামূলক তত্ত্ব থেকে ব্যাখ্যামূলকের আধুনিক উদাহরণ

**গ্যাসের আচরণঃ**

আধুনিক বিজ্ঞানে, এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক বিজ্ঞানেও যতক্ষণ উপযুক্ত ব্যাখ্যামূলকত তত্ত্ব না পাওয়া যাচ্ছে অন্তত ততক্ষণ এতে বর্ণনামূলক তত্ত্ব

পাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সেগুলো আপাতত ওই বিজ্ঞানকে বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য তো করেছেই, শেষ পর্যন্ত ভাল ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব সৃষ্টিতে সাহায্যও করেছে। যেমন আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুর সময় গ্যাসের আচরণ আবিষ্কার করতে কিছু বর্ণনামূলক তত্ত্ব খুবই সফল হয়েছিলো; এক সঙ্গে নিয়ে সেগুলো গ্যাসের চিরায়ত নিয়মগুলোকে তখনই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে দুটি নিয়ম হলো বয়েলের নিয়ম এবং চার্লসের নিয়ম। বয়েলের নিয়ম বলে উত্তাপ যদি এক থাকে তা হলে চাপ বাড়লে সমানুপাতিক ভাবে আয়তন কমে। চার্লসের নিয়ম বলে তাপ একই থাকলে উত্তাপের সঙ্গে সমানুপাতিক ভাবে আয়তন বাড়ে। একটি গ্যাসভর্তি বেলুনে উত্তাপ অথবা চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে এগুলো এভাবেই দেখা যায়– এই অভিজ্ঞতা থেকেই নিয়মগুলো এসেছে। কিন্তু কেন এমন হয় তার কোন ব্যাখ্যা এসব তত্ত্বে নেই। তা না পাওয়া গেলেও ওই বর্ণনামূলক নিয়মগুলো তত্ত্বে ও বাস্তবে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। রান্নার রেসিপির মত কাজ এদের।

ওই বর্ণনামূলক তত্ত্বগুলোর মাধ্যমে যখন কাজ চলছিলো তখনই বিজ্ঞানী মহলে একটি যুৎসই ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের চেষ্টা চল্‌ছিলো– শেষ পর্যন্ত যেটি গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব (কাইনেটিক থিওরি) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এ তত্ত্বের ধারণাটি ১৭ শতকে শুরু হয়ে ১৮ শতকের শেষে এসে পূর্ণতা পেয়েছে। এর মধ্যে মূলত এটমের সমন্বয়ে গড়া আধুনিক অণুর ধারণাটি কাজ করেছে, ধরে নেয়া হয়েছে যে প্রত্যেক গ্যাস এমনি সব অণু দিয়ে গঠিত যেগুলো সব সময় ইতস্তত গতির মধ্যে রয়েছে। ওভাবে ছুটাছুটিতে ওগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, অন্যদিকে সরে যাচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে এসব অনিশ্চিত ধাক্কাধাক্কির ফলে একটি অণুর গতি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা জানা না গেলেও অসংখ্য এরকম অণুর গড় গতিবেগটি নির্ণয় করা যায় এবং সেটিই গ্যাসটির উত্তাপ বলে দেয়। তেমনি গ্যাসের যে পাত্র তার দেয়ালে যে অণুগুলো এসে ধাক্কা দিচ্ছে তারও একটি গড় নির্ণয় করা যায় সেখান থেকে চাপ পাওয়া যায়। তখন এমন কিছু বিষয় ধরে নেয়া হলো যেগুলো বাস্তব পরিস্থিতিতে যৌক্তিকভাবে মনে করাই যায়। এর মধ্যে আছে অণুর আয়তনের থেকে গড়পড়তা অণুদের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশি; ওদের মধ্যে সংঘর্ষগুলো স্থিতি-স্থাপক ভাবে হয়– এক একটি মার্বেলের মত; শুরুতে অণুর নড়াচড়াকে একেবারে ইতস্তত বলে ধরে নেয়া হলো। এই ধরে নেয়া বিষয়গুলো এরকম অণুর সামগ্রিক গোষ্ঠির ওপর সংখ্যাতত্ত্বের গাণিতিক নিয়মগুলো প্রয়োগ করার

সুযোগ করে দেয়। উত্তাপ বাড়লে অণুগুলোর গড় বেগ এমন ভাবে বাড়ে যে চাপটি উত্তাপের সমানুপাতিক হতে বাধ্য হয়। একই ভাবে চাপ বাড়লে আয়তন সমানুপাতিক ভাবে কমে যেতে বাধ্য। কাজেই চার্লসের নিয়ম ও বয়েলের নিয়ম কেন ঘটছে তত্ত্বের কল্পিত বিষয়গুলো থেকে তা স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। ওই কল্পতত্ত্ব থেকে যত রকম ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তার সবই পরীক্ষায় পাওয়া যায় বলে ওই কল্পতত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে, যা কিনা গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব। বর্ণনামূলক তত্ত্বের মত এর সব কিছু সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। গ্যাস যে অণুতে গঠিত সে ধারণাটি একটি কল্পনা, অণুর ছুটাছুটিও তাই। গ্যাসের বাস্তব সব আচরণ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে বলেই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কল্পনাগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

**অতিপরিবাহিতাঃ**

বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাসে বর্ণনামূলক তত্ত্বের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়েছে, তার মানে এই নয় যে আজকের বিজ্ঞানে তার কদর কমে গেছে। এখনো অনেক ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব অর্থাৎ একটি নিটোল গল্প পেতে সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সফল সে রকম তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছেনা সেক্ষেত্রে এখনো বর্ণনামূলক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। ১৯১১ সালে হল্যান্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী কেমারলিং ওনেস দেখ্ছিলেন অত্যন্ত শীতল পরিবেশে পারদের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা খুব দ্রুত বেড়ে যায়– উত্তাপের অভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহকে (কারেন্ট) বাধা দেবার কারণগুলো দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে; তার ফলে এই বাধা একটি বিশেষ হারে হ্রাস পায়। কিন্তু এর মধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন একটি অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা– উত্তাপ ৪.১ ডিগ্রি কেলভিনে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাধাটি একেবারে শূন্যতে পরিণত হলো অর্থাৎ কিনা এ অবস্থায় বিদ্যুৎ উৎস ছাড়াই চলমান বিদ্যুৎ কারেন্ট অবাধে চালু থাকছে। এই অদ্ভুত ঘটনাটিই অতিপরিবাহিতা (সুপার কন্ডাকটিভিটি)। এটি একেবারেই অভাবনীয় ঘটনা– একটি সম্পূর্ণ বিশেষ পরিস্থিতি। স্বাভাবিক পরিস্থিতি অর্থাৎ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাধা কমার পরিস্থিতি থেকে এই হঠাৎ শূন্য বাধা হয়ে যাওয়ার অতিপরিবাহিতার পরিস্থিতিতে রূপান্তরে যেই উত্তাপটি প্রয়োজন তাকে বলা হলো 'রূপান্তর উত্তাপ'। পারদের ক্ষেত্রে রূপান্তর উত্তাপটি ৪.১ ডিগ্রি কেলভিন। উত্তাপটি অবশ্য অত্যন্ত শীতল; পরম শূন্যের মাত্র ৪.১ ডিগ্রি উপরে অর্থাৎ কিনা বরফের থেকে প্রায় ২৬৯ ডিগ্রি নিচে!

পরে অন্যান্য এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেলো আরো কিছু বস্তু খুবই নিম্ন উত্তাপে নিয়ে গেলে এরকমই নিম্ন বিশেষ বিশেষ রূপান্তর উত্তাপে সেগুলোও অতিপরিবাহী হয়ে যায়। কিন্তু এসবের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য কোন তত্ত্ব ছিলনা। বলার কোন উপায় ছিলনা কোন্ জিনিসের ক্ষেত্রে অতিপরিবাহিতা দেখা যাবে আর সেটি কোন্ রূপান্তর উত্তাপে নামলে তবে দেখা যাবে। ইতোমধ্যে এর মধ্যে চুম্বক ক্ষেত্রের একটি ভূমিকা আবিষ্কৃত হলো। দেখা গেলো চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা একটি সীমার ওপরে গেলে রূপান্তর উত্তাপ বজায় থাকা সত্ত্বেও অতিপরিবাহিতা নষ্ট হয়ে ওটি সাধারণ পরিবাহিতার বস্তুতে পরিণত হয়। তাছাড়া অতিপরিবাহী বস্তু থেকে সব চৌম্বক ক্ষেত্র বের হয়ে যায়। এর ফলে অতিপরিবাহী হয়েছে কিনা বোঝার একটি উপায় হলো একটি চুম্বকের ওপর রাখলে অতিপরিবাহী বস্তু ও চুম্বক উভয়ে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এসব ঘটনাকেও কোন সামগ্রিক তত্ত্বে ধারণ করা যাচ্ছিলোনা।

ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব তখনই না পাওয়া গেলেও নানা এক্সপেরিমেন্টে প্রাপ্ত উপাত্তের প্যাটার্ন লক্ষ্য করে কিছু কিছু বর্ণনামূলক তত্ত্ব দেয়া সম্ভব হয়েছিলো। অতিপরিবাহিতার কারণে চৌম্বক ক্ষেত্রকে বের করে দেয়ার ঘটনাকে বলা হয় মাইজনার এফেক্ট। বিজ্ঞানী দুই ভাই ফ্রিজ লন্ডন ও হাইনজ লন্ডন ১৯৩৫ সালে 'লন্ডন সমীকরণ' নামে একটি বর্ণনামূলক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এতে মাইজনার এফেক্টের বর্ণনা দিতে গিয়ে অতিপরিবাহী বস্তুটির ভেতরের ও বাইরের চুম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে অতিপরিবাহী বিদ্যুৎ কারেন্টের একটি গাণিতিক সম্পর্ক খাড়া করা হয়েছে। সাধারণ বিদ্যুৎ কারেন্টের জন্য 'ওহমের নিয়ম' নামে যে অতি পরিচিত সম্পর্কটি রয়েছে তা হলো সাধারণ কারেন্টের সঙ্গে ভোল্টেজ ও বাধার (রেজিস্ট্যান্স) সম্পর্ক। এক্ষেত্রে অতিপরিবাহী কারেন্টের জন্য সেই আদলেই একটি সম্পর্ক খাড়া করার চেষ্টা করা হয়েছে– যদিও এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো অনেক বেশি জটিল। মাইজনার এফেক্টের মত অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির খুঁটিনাটি আচরণ এই বর্ণনামূলক তত্ত্বে ফুটে উঠেছে। বর্ণনামূলক হলেও এটি খুবই খুবই সহায়ক হয়েছে নানা দিক থেকে। কোন পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব না পাওয়া গেলেও ইতোমধ্যেই অতিপরিবাহিতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যবহার করা শুরু হয়েছিলো। এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলো এর মাধ্যমে উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্র (সুপার ম্যাগনেট বা অতিচুম্বক নামে পরিচিত) পাওয়া যা সাধারণ বিদ্যুৎ কারেন্ট দিয়ে পেতে গেলে অনেক বড় ও অনেক ব্যয়-সাপেক্ষ হতো। কিন্তু ওই চৌম্বক ক্ষেত্র আবার অতিপরিবাহিতা

নষ্ট করে দেবার সীমায় পৌঁছে গেলে বেশি উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্র পেতে বিঘ্ন ঘটে। লন্ডন সমীকরণের মত বর্ণনামূলক তত্ত্ব এসব ক্ষেত্রে হিসেব করার একটি উপায় দিতে পেরেছিলো। তাছাড়া পরে ১৯৫৭ সালে যখন অবশেষে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব অতিপরিবাহিতার রহস্যকে সত্যিই উন্মোচন করেছে তার পেছনে লন্ডন সমীকরণের মত বর্ণনামূলক তত্ত্বেরও অবদান রয়েছে।

১৯৫৭ সালে যখন সত্যিই সেই নিটোল গল্প এলো, তখন অতিপরিবাহিতা আবিষ্কারের পর ৫০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু দেরিতে ব্যাখ্যামূলক যে তত্ত্বটি পাওয়া গেলো তা খুবই সুন্দর এবং পরবর্তীতে এরকম অন্য ঘটনার অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে খুবই সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছিলো। এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেলো অতিপরিবাহিতার মত অদ্ভুত ঘটনা কেন ঘটে। একে বলা হলো বিসিএস থিওরি– আবিষ্কারকারী তিন বিজ্ঞানী বার্ডীন, কুপার আর শ্রাইফারের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে। তাঁরা তাত্ত্বিক যুক্তিতে দেখালেন (যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে) পরিবাহী বস্তুতে যে অসংখ্য মুক্ত ইলেকট্রন থাকে তাদের দুটি দুটি করে জোড়া তৈরি হয় যাতে জোড়ার দুই ইলেকট্রন নিজেদের ঋণাত্মক চার্জের কারণে পরস্পরকে বিকর্ষণ করার কথা থাকলেও অতিপরিবাহিতার অবস্থায় তারা তা করেনা। দুটি ইলেকট্রন বরং পরস্পরের কাছে এসে একে অপরের সঙ্গে মিলে কুপার-জোড় নামের একটি জোড় বাঁধে। এটি কেন হয় তার একটি ব্যাখ্যাও কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ভাবে দেয়া হলো। একটি ইলেকট্রন বাদ দিলে তার অভাবে ওই পরিবাহী বস্তুর বাকি দেহটি হলো ধনাত্মক। কুপার-জোড়ের একটি ইলেকট্রন ওই ধনাত্মক দেহটির সঙ্গে যখন বিক্রিয়া করে তখন ধরে নেয়া যায় যে ঋণাত্মক ইলেকট্রন সেই ধনাত্মক দেহকে খানিকটা আকর্ষণই করে। ওভাবে আকৃষ্ট দেহ তখন কুপার-জোড়ের অন্য ইলেকট্রনটিকেও টেনে আগের ইলেকট্রনটির কাছে নিয়ে আসে এবং তার সঙ্গে জোড় বানিয়ে কুপার-জোড় সৃষ্টি করে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে দুটি ইলেকট্রন উভয়ে ঋণাত্মক হওয়া সত্ত্বেও জোড় বাঁধতে পারছে ওই ধনাত্মক দেহটির মধ্যস্থতায়। সাধারণ চিরায়ত পদার্থবিদ্যার যুক্তিতে এমনটি ঘটতে না পারলেও আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের যুক্তিতে এটি সম্ভব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম ইলেকট্রনের আকর্ষণে বাকি বস্তু-দেহের মধ্যে যে শব্দের মত কম্পন তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা এক রকম কোয়ান্টাম কণিকার মত– কারণ যে কোন তরঙ্গের একটি কণিকা রূপ আছে। এভাবে আলোর তরঙ্গের কণিকাকে যেমন বলা হয় ফোটন (ফটো মানে আলো বলে), এই কণিকাকে বলা যায় তেমনি ফোনন (ফোন মানে শব্দ বলে)। কাজেই জোড়

বাঁধার ব্যাপারটিকে বলা গেলো প্রথম ইলেকট্রনের সঙ্গে ফোননের এবং তারপর ফোননের সঙ্গে দ্বিতীয় ইলেকট্রনের ক্রিয়া হিসেবে– সবই কণিকায় কণিকায় এক রকম ক্রিয়া।

এভাবে সৃষ্ট ওই কুপার-জোড়ের মধ্যেই রয়েছে অতিপরিবাহিতার সফল রহস্যভেদ। কুপার-জোড় জিনিসটাকেও একসঙ্গে একটিই কণিকা হিসেবে বিবেচনা করা যায়– দুটি ইলেকট্রনের জোড় হলেও এই নতুন জোড় কণিকাটির আচরণ ইলেকট্রনের থেকে আকাশ-পাতাল ভিন্ন। ইলেকট্রন দুইয়ের বেশি সংখ্যায় এটমের নিম্নতম শক্তি মাত্রায় থাকতে পারেনা, তৃতীয় ইলেকট্রনকে আরো ওপরের একটি শক্তিমাত্রায় চলে যেতে হয়। এর কারণ ইলেকট্রন বিশেষ একটি সংখ্যাতত্ত্ব মানার মত কণিকা যাদের বলা হয় ফার্মিয়ন (এগুলো এনরিকো ফার্মের আবিষ্কৃত সংখ্যাতত্ত্ব মানে বলে)। কিন্তু কুপার-জোড় যেই সংখ্যাতত্ত্ব মানে তা আমাদের দেশের বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কৃত সংখ্যাতত্ত্ব, এজন্য এরকম কণিকাকে বলা হয় বসুর নামে বোসন। বোসন কিন্তু নিম্নতম শক্তিমাত্রায় যে কোন সংখ্যায় থাকতে পারে। এভাবে পরিবহনের জন্য দায়ী সব কণিকা যখন সর্বনিম্ন শক্তিতে থাকে তখন তাদের পক্ষে প্রবাহে কোন রকম বাধা পাওয়া সম্ভব হয়না– কারণ এই শূন্য শক্তিমাত্রার ওপরে গেলেই শুধু বাধা পাওয়া সম্ভব। সম্পূর্ণ বাধাহীন ভাবে তারা পরিবাহিতা বজায় রাখতে পারে, আর ওটিই হলো অতিপরিবাহিতা। যতক্ষণ উত্তাপ রূপান্তর উত্তাপের নিচে থাকে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে ততক্ষণ এই অবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু উত্তাপ যদি রূপান্তর উত্তাপের ওপরে উঠে যায়, কিংবা চৌম্বক ক্ষেত্র যদি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে থাকে তা হলে কুপার-জোড় গঠনের মত ওই পরিস্থিতি আর বজায় থাকেনা, কাজেই বস্তুটি আর অতিপরিবাহী থাকতে পারেনা, সাধারণ পরিবাহী বস্তুতে পরিণত হয়। তত্ত্বের মধ্যে গাণিতিক এমন সব সম্পর্ক রয়েছে যার থেকে এক একটি বস্তুর নিজস্ব গঠনের উপাত্ত থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তা অতিপরিবাহী হবে কিনা, হলে রূপান্তর উত্তাপ কত হবে, কত চৌম্বক ক্ষেত্র তা সহ্য করতে পারবে ইত্যাদি। একটি ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের তো এটিই প্রয়োজন– প্রয়োজনীয় ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সফল ভাবে করতে পারা। হ্যাঁ ওই যে কুপার-জোড়ের কম্পন, ইলেকট্রন-ফোনন-ইলেকট্রনের বিক্রিয়ার কল্পনা এসব একে একটি গল্পের মতই গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু এই গল্পের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরো গল্পের দারুণ সাযুজ্য রয়েছে, আর এর থেকে করা সব ভবিষ্যদ্বাণী খুবই সূক্ষ্মভাবে সফল– তাই এটি একটি নিটোল

গল্প; বিজ্ঞানের একটি খুবই সুন্দর ও সফল ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব। এর ব্যাখ্যা ঘটনাটির সত্য ব্যাখ্যা।

**জীব বিবর্তন:**

জীব বিজ্ঞানকে তার ইতিহাসে বেশির ভাগ সময় বর্ণনামূলক তত্ত্বের ওপর ভরসা করতে হয়েছে। বিভিন্ন জীবের দেহ, স্বভাব ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার মাধ্যমে এটি এগিয়েছে। জীবগুলোর শ্রেণী বিভাগ একটি বড় কাজ ছিল। এর মধ্য থেকেই বিশেষ ধরণের জীব থেকে কী জীবন প্রণালী আশা করা যাবে তার বর্ণনামূলক তত্ত্ব পাওয়া যায়। তবে এভাবে অভিজ্ঞতায় যা জানা গেছে, তার ওপর ভিত্তি করে কখনো কখনো যে ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব দেবার চেষ্টা হয়নি তা নয়, সেখানে অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে কল্পনায় চলে যেতে হয়েছে। সেই কল্পনাশ্রয়ী তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেছে এমন বিশ্বাস সবার ছিল, তাই তত্ত্বগুলো দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরো সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা ও স্পষ্ট পরীক্ষার ফলে ওরকম অনেক তত্ত্ব বাতিল হয়ে গেছে। যেমন বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসাবিদ গ্যালেন সাড়ে উনিশ শ' বছর আগে রক্ত সঞ্চালনের তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে দু'রকম রক্ত দুই ভিন্ন পথে শরীরের সর্বত্র যায়; কলজেতে তৈরি হওয়া কালো রক্ত ওখান থেকে শিরার মধ্যে দিয়ে খাদ্য বহন করে যায়, আর হার্টে তৈরি হওয়া লাল রক্ত জীবনী শক্তি ধমনী দিয়ে বহন করে যায়। ওভাবে গিয়ে এগুলো শরীরে শেষ হয়ে যায়। এর সবকিছু তিনি দেখেছেন তা নয়, যেটুকু দেখেছেন তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়েছেন। রক্ত সঞ্চালনের এই ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি, আধুনিক কালের শুরুতেই এটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

তেমনি এই গ্যালেনই আরো প্রাচীন আরেকটি তত্ত্ব খাড়া করেছিরেন বহু অসুখের কারণ নির্ণয় করতে। এতে বলা হয়েছে দেহের মধ্যে চার রকমের রসের ভারসাম্য নষ্ট হয় বলেই অসুখ হয়– রক্ত, শ্লেষ্মা, কালো পিত্ত, হলুদ পিত্ত এই চার রকমের রস। ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের জন্য শরীর থেকে রক্ত ফেলে দেয়ার (রক্তক্ষরণ) বিধান পর্যন্ত দেয়া হতো এই তত্ত্ব অনুসরণ করে। মাত্র দু' এক শ' বছর আগে পর্যন্তও দুনিয়ার দেশে দেশে চিকিৎসকরা এই তত্ত্ব অনুসরণ করে রক্ত ক্ষরণে অনেক রুগীর মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। তা সত্ত্বেও সবাই বিশ্বাস করতো যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কাজ করেছে, চিকিৎসার সহায়ক হয়েছে। তবে পরে এটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। এরকম বহু ভুল তত্ত্ব

শুধু বিজ্ঞানকে ভোগায়নি, মানুষকেও ভুগিয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ না করে ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব দিলে তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়না। বর্ণনামূলক তত্ত্বে সেই ভয় কম, কারণ ওখানে সবই অভিজ্ঞতা নির্ভর।

শুরুতে জীব বিবর্তনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, ১৭ শতক থেকে বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা ক্রমেই এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখাচ্ছিলো যে জীবের প্রজাতিগুলো আগে ঠিক আজকের অবস্থায় ছিলনা, যদিও বরাবর এমনটিই মনে করা হতো। সাক্ষ্য-প্রমাণে স্পষ্টতই মনে হচ্ছে যে এগুলো সময়ের সঙ্গে খুবই ধীর গতিতে পরিবর্তিত হতে হতে আজকের অবস্থায় এসেছে। এমন মনে করতে হবার সাক্ষ্য নানা দিক থেকে এসেছে, প্রধানত এসেছে ফসিল গবেষণা থেকে। প্রথম ফসিল আবিষ্কারের পর থেকে যতই দিন গেছে ততই দুনিয়ার নানা জায়গায় অসংখ্য জীবের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে– বিভিন্ন রূপে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়া প্রাচীন জীবের দেহাবশেষ বা নিদর্শন। একই সঙ্গে ফসিলের বয়স নির্ণয় এবং তার থেকে আশ্চর্য রকম বিশদ ভাবে সেই জীবের জীবন-কাহিনী উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একই জীবের নানা ফসিল থেকে দেখা গেছে কী ভাবে ধীরে ধীরে সেই জীবের দেহ বদলে গেছে, আর দেহের এই বদলে যাওয়া থেকে বোঝা গেছে তার জীবন ধারনের নানা দিকের পরিবর্তনগুলোও। এভাবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন যুগের শিলার স্তরে স্তরে পাওয়া অনেক ফসিলের নিরিখে পৃথিবীর ও জীব জগতের এক রকমের ইতিহাসই উদ্ঘাটন করে ফেলেছিলেন। এর মূল কথা হলো সব জীব– সব উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস সবই পরিবর্তিত হয়েছে, অতি ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে; এর নামই জীব বিবর্তন। পরিবর্তিত হতে হতে শুরুতে হয়তো একই প্রজাতির ভিন্ন জাতে পরিণত হয়েছে, তারপর প্রজাতিটিই বদলে গেছে, এমনকি এক সময় পরিণত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠির জীবে।

এই বিবর্তন যে ঘটেছে ফসিল-বিশ্লেষণই তার একমাত্র সাক্ষী ছিলনা, আরো নানা দিক থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিলো। এর মধ্যে সব জীবের শ্রেণী বিভাজনও একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। সতরো শতকের মাঝামাঝি প্রধানত সুইডিশ উদ্ভিদবিদ কার্ল লিনিয়াস যাবতীয় জীবের একটি অনন্য শ্রেণী বিভাজন সম্পন্ন করেছেন যা অনেকাংশে আজও অনুসরণ করা হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামও দেয়া হয়– যাও এখনো দুনিয়ার সব বিজ্ঞানী ব্যবহার করেন। ধাপে ধাপে এই বিভাজন করতে গিয়ে দেখা গেছে কীভাবে

চেহারা ও স্বভাবের দিক থেকে এক একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী তার কাছাকাছি সম্পর্কিত আরেকটির সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে মিলে যায়, শ্রেণী বিভাজনে একই প্রজাতি না হলেও এর পরের ধাপ একই 'জেনাস', বা তার পরের ধাপ একই 'ফ্যামিলির' অন্তর্ভুক্ত হরে। কিন্তু যতই প্রজাতি থেকে এক এক করে দূরের ধাপে যেতে থাকে ততই মূল মিল বজায় রেখেও যেন প্রত্যেকটি নিজ নিজ বৈচিত্রের দিকে সরে যাচ্ছে। ব্যাপারটি অনেকটাই স্পষ্ট করে তুলেছে যে প্রাণীগুলো অতীতে একই পূর্বপুরুষ থেকে ধীরে ধীরে বহু প্রজন্ম ধরে একটু একটু করে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে- এ যেন অতীতের একই জীবের নানা দিকে বিচ্ছূরণ।

জীব বিবর্তন যে ঘটেছে এই বিষয়টি সে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ণনামূলক তত্ত্ব হিসেবে। বর্তমান ও ফসিল জীবগুলো দেখে ও পরস্পর তুলনা করে অভিজ্ঞতা থেকে ওটি বোঝা গেছে। জীববিজ্ঞানীগণ এই তত্ত্বকে তাঁদের গবেষণায় ব্যবহারও করেছেন নতুন যে কোন জীব-বিশ্লেষণে। এটি কী ভাবে আগের জানা অন্য কোন্ জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে, কোন্ দিকে বিবর্তিত হয়েছে, তাতে পরিবেশ পরিস্থিতি ইত্যাদি কোন ভূমিকা রেখেছে কিনা সে সব দেখা হয়েছে। তার ভিত্তিতে আগেরটির চেহারা ও আচরণের সঙ্গে নতুনটির সে সবকে আন্দাজও করা গেছে। কিন্তু কেন ওই পরিবর্তন ঘটেছে, অর্থাৎ বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি আসলে কী তার পূর্ণ ব্যাখ্যা নিয়ে কোন তত্ত্ব তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার মানে এই নয় যে সে রকম ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব পাওয়ার চেষ্টা চল্ছিলোনা। নানা বিজ্ঞানী সে চেষ্টা করে গেছেন। তার কোন কোনটি সাময়িক ভাবে সমর্থনও পেয়েছে, বিজ্ঞানীদের কাছে তাকে যুক্তিসঙ্গত তত্ত্ব বলে মনে হয়েছে, কিন্তু বেশিদিন ধোপে টেকেনি; প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করা যায়নি। এভাবে জীব বিবর্তন দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত তত্ত্ব হিসেবে থাকলেও বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেননা জীব জগতে এই বিবর্তন কী ভাবে ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে চার্লস ডারউইন এর সফল সম্পূর্ণ তত্ত্বটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর আগে ডারউইন নিজেও তাঁর জীবতাত্ত্বিক গবেষণায় বর্ণনামূলক ভাবে ব্যবহার করেছেন। তরুণ বয়সে 'এইচ এম এস বীগল' নামের পালতোলা জাহাজে একটানা পাঁচ বছর দুনিয়ার বেশ কিছু মহাদেশের প্রকৃতি জরীপ করেছিলেন ডারউইন। এ সময় নতুন নতুন জায়গার অজানা ভূ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্রের ওপর কাজ করেন। এসব অভিজ্ঞতা 'বীগল জাহাজে অভিযাত্রা'

নামক বইয়ে তিনি বিস্তারিত লিখেছেন যেখানে নতুন প্রত্যেকটি প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে আনুসঙ্গিক অন্যগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, ওখানে পাওয়া ফসিলের সঙ্গেও সেটি করেছেন। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ অন্য জীববিজ্ঞানীদের মতামতের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখেছেন। সব কিছু থেকে সে সময়ের প্রচলিত জীব বিবর্তনের বর্ণনামূলক তত্ত্বটিই ফুটে ওঠেছে। যদিও বিজ্ঞানীদের মধ্যে সে সব বর্ণনামূলক তত্ত্বের নানা রকমফের প্রচলিত ছিলো মূল বিষয়টির প্রতি কারো কোন অনাস্থা ছিলনা।

ওই বিশ্ব ভ্রমণের সময়েই ডারউইন এমন অনেক তথ্য-উপাত্ত পেয়েছিলেন যেগুলো পরবর্তী সময়ে তাঁর মধ্যে বিবর্তনের একটি ব্যাখ্যাকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তুল্‌ছিলো। ভ্রমণ থেকে দেশে ফিরে তিনি প্রায় ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ওপর গবেষণা করে সেই ব্যাখ্যামূলক একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হিসেবে খাড়া করতে সক্ষম হোন। দীর্ঘ সময়ের অনুসন্ধানে এত বিচিত্র সব প্রমাণ তিনি এই তত্ত্বের সমর্থনে পেয়েছিলেন যে সেগুলোর সমন্বয়ে তিনি 'প্রজাতির উৎস' (অরিজিন অব স্পেসিস) নামের একটি সেরা বইয়ে এই তত্ত্বকে অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই তত্ত্ব হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন। এর প্রকাশ ১৮৫৯ সালের নভেম্বর।

এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বটি জীববিদ্যার পুরো বিষয়টিতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব নিয়ে এসেছে– তারপর থেকে জীববিদ্যা আর আগের জায়গায় নেই, এর প্রায় সব কিছুরই ব্যাখ্যা মিলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে। এর মূলে রয়েছে সেই বীগল জাহাজে ভ্রমণের কাল থেকে শুরু করে ত্রিশ বছর ডারউইনের গবেষণার ফল। তিনি দেখেছেন যে কোন একই প্রজাতির কোন জনসংখ্যার মধ্যেও বিভিন্ন জনের এক একটি দিক এক রকম নয় বরং বিচিত্র– তা দেহগত বৈশিষ্টই হোক আর স্বভাবগত বৈশিষ্টেই হোক। এটি নানা কারণে জন্ম প্রক্রিয়ায় বা জীবনকালে সংঘটিত ইতস্তত নানা দিকে দৈব পরিবর্তনের ফল, যার অনেকগুলোই জননকোষের মাধ্যমে সন্তানের মধ্যেও এরপর সঞ্চারিত হতে পারে। ফলে দেখা যায় যে মূলধারার যেকোন বৈশিষ্টের মধ্যেই এক এক জনে এক একটি কিছু কমবেশি হচ্ছে, যেমন উচ্চতায় একটু বেশি বা কম হওয়া। আবার কোন কোন সময় মূলধারা অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যতিক্রমী পরিবর্তনও দৈবক্রমে দেখা যায় যেমন পাঁচ আঙ্গুলের বদলে ছয় আঙ্গুল থাকা। এই সব পরিবর্তনকে বলা হয় মিউট্যাশন। সব জীবের মধ্যে

মিউট্যাশন সব সময় হচ্ছে, তবে কখন কার কী ধরনের হবে বা আদৌ হবে কিনা তার কোন পূর্বাভাস সম্ভব নয়। অনেক সময় এসব মিউট্যাশন জীবনের ওপর কোন প্রভাব রাখেনা, অনেক সময় এত নেতিবাচক প্রভাব রাখে যে জনসংখ্যায় ওই সদস্যগুলো মরে যায় বলে মিউট্যাশনগুলোও টিকতে পারেনা। কিন্তু কখনো কখনো কারো কোন মিউট্যাশন তার জন্য দারুণ কাজে লেগে যায়, আর তা নিয়েই প্রাকৃতিক নির্বাচন।

পরিবেশের সংকটের সময় জীব-জনসংখ্যার মধ্যে বাঁচার জন্য প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়। সে সময় যদি কারো কোন মিউট্যাশন ওই সংকটে টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটুকুও বাড়তি সুবিধা এনে দেয় তবে সেটি কিছুটা হলেও বেশিদিন বাঁচে, ফলে বড় সংখ্যার মধ্যে এগুলো গড়পড়তায় কিছুটা হলেও বেশি সন্তান দিতে পারে, জননকোষে থাকার কারণে যাদেরও ওই মিউট্যাশন থাকতে পারে। এভাবে ওই মিউট্যাশনধারীদের সংখ্যা সামান্য হলেও বাড়ে। পরের প্রজন্মেও যাদের মধ্যে এই বাড়তি সুবিধাটি বেশি আছে তারাই বাঁচার ও সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে থাকে। পরিবেশ সংকটে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার কারণে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে বলেই এটি ঘটছে। অন্য ভাবে দেখলে বলা যায় প্রকৃতিই যেন এই মিউট্যাশনকে বাছাই করে তাকেই বাঁচতে দিচ্ছে। এই অর্থেই এটি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। এ ভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই মিউট্যাশনধারীদের সংখ্যা বাড়ে, মিউট্যাশনটিও আরো প্রকটিত হয়, শেষ পর্যন্ত সবাই ওই বৈশিষ্টের দিক থেকে ওরকমই হয়ে যায় এবং একটি নতুন জাত বা প্রজাতি সৃষ্টি হয়। সবই হয় অত্যন্ত ধীরে, বহু প্রজন্ম ধরে। শেষ পর্যন্ত শুধু প্রজাতি নয়, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে যেমন জেনাস, ফ্যামিলি ইত্যাদিতেও নতুন রূপের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

একটি খুব সরল উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক সবুজ বনে সবুজ রঙের একটি প্রজাপতির প্রজাতি বহু সংখ্যায় আছে, কারণ সবুজের পটভূমিতে তাকে সহজে দেখা যায়না বলে খাদক পাখিরা সহজে তাদের খেতে পারেনা। কিন্তু পরিবেশ দূষণের সংকটে বনটির গাছপালার ওপর কালো ধোঁয়া থেকে আস্তরণ পড়ে ওটি কালচে হয়ে গেছে। এখন কিন্তু সবুজ প্রজাপতির মহা সংকট, কালো রঙের পটভূমিতে সহজে দেখা যায় বলে পাখি তাদেরকে সহজে খেতে পারছে। কিন্তু মিউট্যাশনের ফলে কালেভদ্রে নানা ব্যতিক্রমী প্রজাপতিও দৈবক্রমে জন্ম নিচ্ছিলো। নানা দিকের অন্য মিউট্যাশনগুলো এক্ষেত্রে কোন কাজে না এলেও

যারা দেহ কালচে রঙের হওয়া মিউট্যাশন নিয়ে জন্মাচ্ছিলো তাদের কিছুটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছিল কালোর পটভূমিতে কালোকে সহজে দেখা যায়না বলে। ফলে তারাই টিকেছে বেশি এবং সন্তানও বেশি দিয়েছে– সেই সন্তানরাও কালচে রঙের। এভাবে প্রতি প্রজন্মে একটু একটু করে ওদের সংখ্যার অনুপাত বেড়েছে, কালো হবার পরিমাণও বেড়েছে– শেষ পর্যন্ত একটি নতুন কালো প্রজাতির প্রজাপতি সৃষ্টি হয়েছে।

এই উদাহরণটি সরল কারণ শুধু গায়ের রঙের একটি বা অল্প কিছু মিউট্যাশনে এটি সম্পন্ন হতে পেরেছে, তাও হয়তো বহু শত বছর ধরে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমনি পরিবর্তিত প্রজাতিতে অনেকগুলো মিউট্যাশনের সমন্বয় ঘটে– যার প্রত্যেকটি এক এক সময় দৈবক্রমে সৃষ্টি হয়েছে হয়তো বহু হাজার বছর পর পর এবং আরো দৈবক্রমে একই বংশধারায় একই সদস্যদের মধ্যে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। যেহেতু লক্ষ, কোটি বছর ধরেও এটি চল্‌তে পেরেছে তাই সময়ের কোন অভাব হয়নি, এমন বিরল ঘটনা ঘটার কিছু সম্ভাবনা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অবশ্যই থাকে। উদাহরণ স্বরূপ এমন ফুলের সাক্ষাত পাওয়া যায় যা দেখ্‌তে হুবহু একটি মৌমাছির মত। এই ফুল বংশ পরম্পরায় এখন এরকমই- হুবহু মৌমাছির মত। কিন্তু সুদূর অতীতে সাধারণ ফুলে বহু কাল পর পর এক এক সময় এখানে এই দাগ, ওখানে পাপড়ির বিশেষ আকৃতি ইত্যাদির অনেকগুলো আলাদা আলাদা মিউট্যাশনে এমনটি হয়েছে– আর প্রত্যেকটি বাড়তি মিউট্যাশন একে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। একটি মিউট্যাশন হয়তো পাপড়িকে কিছুটা পাখার মত দেখতে করেছে, একটি হয়তো ফুলের গায়ে মৌমাছির মত দাগ ফেলেছে, একটি হয়তো কোন পুংকেশরকে মৌমাছির শুড়ের মত করেছে, আরেকটিতে কোন দাগ তার চোখের মত দেখতে হয়েছে এমনি ভাবে মৌমাছির মত দেখতে হওয়ার মিউট্যাশনগুলো জমেছে একই বংশধারায়। মৌমাছি মনে করে সত্যিকার মৌমাছি এসে ওর ওপর বসাতে প্রত্যেক ধাপে কিছু বেশি বেশি করে ফুলটি পরাগ বিস্তার ও প্রজননের বাড়তি সুবিধা পেয়েছে– এবং এই মিউট্যাশনগুলোর অধিকারীরাই সংখ্যায় বেড়েছে। সবকিছু ঘটেছে ধাপে ধাপে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ফুলটির ক্রমের আরো বেশি মৌমাছির মত হয়ে ওঠার মাধ্যমে। সামান্য একটুকুও যখন মৌমাছির মত দেখতে হয়েছে তখনো অন্তত কিছু মৌমাছি ভুল করে বসেছে বলে একটুকু হলেও ওই ফুল সুবিধা পেয়েছে, পরে যখন সাদৃশ্য আরো বেড়েছে, আরো বেশি বেশি মৌমাছি এই ফুলে বসেছে, তখন সুবিধাও বেড়েছে।

দৈহিক বৈশিষ্টের জন্য যা সত্য, স্বভাবের বৈশিষ্টের জন্যও তা সত্য। এক সময় হয়তো হরিণরা দিনে রাতে বিচরণ করতো। কিন্তু দৈবক্রমে তাদের কোন কোনটির মস্তিষ্কে অন্ধকারকে ভয় পাওয়ার মিউট্যাশনে সৃষ্টি হয়েছিলো নিশাচর হিংস্র প্রাণী বেড়ে যাওয়ার মত প্রাকৃতিক সংকটে রাতে চরা হরিণরা যখন মারা পড়েছে ওই অন্ধকারকে ভয় পাওয়া হরিণগুলোই শুধু টিকে ছিল। আর তাদের বংশধররাই সংখ্যায় ক্রমাগত বেড়েছে যারা নিজেরাও অন্ধকারকে ভয় পায়। হরিণ যে সাধারণত রাতের অন্ধকারে ঘোরাফেরা করেনা এই স্বভাবটি এভাবেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছে। দৈহিক হোক স্বভাবগত হোক কোন মিউট্যাশন সংকটের ফলে সৃষ্টি হয়নি। ওগুলো এমনিতেই দৈবক্রমে সব সময় নানা দিকে সৃষ্টি হচ্ছিলো, এখনো হচ্ছে। সংকটে এর কোনটি কাজে লেগে গেলে তবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে।

ডারউইন যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তা ছিলো খুবই পূর্ণাঙ্গ একটি তত্ত্ব– জীববিদ্যা ও মনোবিদ্যায় অসংখ্য জিনিসের ব্যাখ্যা এর মাধ্যমে পাওয়া গেছে। তবে একে সব থেকে জাজ্জল্যমান প্রমাণ যুগিয়েছে আরো পরে ডিএনএ'র বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হবার পর। ওসময় যা বাহ্যিক প্রমাণ থেকে বলা হয়েছিলো এখন ডিএনএতে অণুর পর্যায়ে হুবহু তারই প্রমাণ মিলছে– বলতে গেলে ডিএনএ'র মধ্যেই দেখা যাচ্ছে মিউট্যাশনের একেবারে চাক্ষুষ ছবি, এবং অণুর পর্যায়ে ও বাহ্যিক পর্যায়ে তা একই প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হবার ফল।

বিজ্ঞানে ইতিহাস থেকেই এভাবে আমরা দেখ্ছি প্রাচীন কালে, আধুনিক কালের শুরুতে এবং আজো কী ভাবে কখনো বিজ্ঞানী বর্ণনামূলক তত্ত্বের ওপর ভরসা করছেন, আবার কখনো পূর্ণ ব্যাখ্যাকারী তত্ত্বও খুঁজে পাচ্ছেন। পরেরটি তাঁর লক্ষ্য হলেও বর্ণনামূলক তত্ত্ব দিয়ে যতটুকু পারছেন কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন; অবশ্য চোখ তাঁর সব সময় মহাকাব্যিক ব্যাখ্যার দিকেই। এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাগুলোই বিজ্ঞানের মহাকাব্যের পুরো কাহিনী গড়ে তুলেছে, পুরো প্রকৃতিকে মানুষের কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য।

# একই চাবিতে শত দরজা খোলা

ভাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

**মিথ্যা প্রমাণের সুযোগ থাকতে হবেঃ**

আমরা দেখেছি সন্তোষজনক একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব পেতে বিজ্ঞানীদের কেমন আকুতি। ধারা বিবরণীর মত বর্ণনামূলক তত্ত্ব দিয়ে কাজ সারলেও তা যে বিজ্ঞানীর লক্ষ্য নয় সেটিও দেখেছি। তবে পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত বেশি কাম্য তত্ত্ব আছে। সে রকম বেশি কাম্য তত্ত্বের কামনার একটি জিনিস হলো তত্ত্বে যা কিছু কল্পনা করা হয়, যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিতও হয়েছে, সেগুলোকে শুধু এই বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েই যেন তুলে না রাখতে হয়। তা হলো তো প্রত্যেকটি আলাদা ঘটনার ব্যাখ্যা করার জন্য আলাদা আলাদা এক এক সেট জিনিসকে কল্পনা করতে হবে, যা এই বিশেষ ঘটনার পরীক্ষায় প্রমাণিত হলেও অন্য কোন ঘটনার ব্যাখ্যায় কোন কাজে আসবেনা। স্পষ্টত এটি কোন কাজের কথা নয়; এ অনেকটা আম গাছের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে এক রকম কল্পনা, আর জাম গাছের জন্য আরেক রকমের কল্পনা ব্যবহার করার মত। এতে তত্ত্বটির মধ্যে ওই কল্পনাগুলোর যে আসল অস্থিত্ব সেটি কিছুটা নড়বড়ে হয়েই থাক্‌ছে, অন্য কোথাও সেগুলো তার অস্থিত্ব প্রমাণ করতে পারছেনা। তাই তত্ত্বজগতের বাইরের দশটা সাধারণ বাস্তব জিনিসের মতো ওগুলোর সর্বত্রগামী অস্থিত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে এগুলোকে আপাতত ধরে নেয়া জিনিস মনে হতে পারে। এমন পরিস্থিতি বিজ্ঞানী পছন্দ করেননা– তিনি চান অল্প এরকম কিছুর কল্পনা দিয়ে যথাসম্ভব বেশি ঘটনার ব্যাখ্যা করতে। সেই ঘটনাগুলো যত বিস্তৃত বিষয় জুড়ে হবে তত ভাল, মূল তত্ত্বটি ভাল বলে বিবেচিত হবে। বিজ্ঞানী সব সময় চান এক চাবিতে, অথবা অন্তত কম সংখ্যক চাবিতে শতদিকের শত দরজা খুলে যাক– অর্থাৎ শত রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যাক্।

ভাল তত্ত্ব হতে গেলে অবশ্য তাকে প্রমাণিত তত্ত্ব হতে হবে, তারপর বাকি কথা। প্রাচীন দার্শনিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের যুক্তি তর্কের প্রমাণকেই যথেষ্ট মনে করতেন। যদিও তাঁদের কেউ কেউ বাস্তব প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রমাণকেও জরুরী বলে মনে করেছেন, নিজেদের তত্ত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে তা বড়

একটা অনুসরণ করেননি। আধুনিক বিজ্ঞানে অবশ্য তা হবার যো নেই। পর্যবেক্ষণে অথবা এক্সপেরিমেন্টে যদি তত্ত্বের কথাগুলোকে প্রমাণ করা না যায়, অথবা ওই কথাগুলো থেকে যেই যৌক্তিক ভবিষ্যদ্বাণী সেগুলো বাস্তবে ফল্‌তে দেখা না যায় তা হলে তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য হয়না। এক্সপেরিমেন্টে বা যথাযথ পর্যবেক্ষণে ওই রকম বাস্তব প্রমাণ করার আগে যুক্তি বিস্তারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গাণিতিক সমাধানের সৌকর্যে অনেক সময় তত্ত্বটি খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে আমাদের কাছে এ পর্যন্ত এক্সপেরিমেন্টের যে সব প্রযুক্তি রয়েছে তাতে তত্ত্বটির মধ্যে কল্পিত মূল জিনিসটির অস্থিত্ব বাস্তবে প্রমাণ করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু সেটি মেনে নিয়ে তত্ত্বটির মাধ্যমে যেখানে যা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় তা ঠিকই ফলে যাচ্ছে, ওই কল্পিত জিনিসের অস্থিত্ব সেখানে অপরিহার্য। তাতে এর ওপর যথেষ্ট আস্থা সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তারপরও তত্ত্বটিকে পুরো প্রতিষ্ঠিত বলা যায়না। এর একটি খুবই আধুনিক উদাহরণ হলো হিগ্‌সের তত্ত্ব। ২০১২ সালে হিগস্ বোসন নামের কণিকাটি আবিষ্কার হয়েছে। এর প্রায় ষাট বছর আগে তাত্ত্বিক ভাবে কণিকাটি প্রথম কল্পিত হয়েছিলো এবং পরে এই তত্ত্বের সহযোগে মৌলিক কণিকার পুরো জগতটিকে একটি চমৎকার শৃঙ্খলা দেয়া সম্পন্ন হয়েছিলো। সে সবের গুরুত্বপূর্ণ অনেক দিক সরাসরি এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হয়েছে। এই মৌলিক কণিকাগুলোই হলো পুরো বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান, তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এতগুলো বছরে সব কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলেও ওই হিগ্‌স বোসন জিনিসটিই বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি। তাই তত্ত্বটি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েও হতে পারছিলোনা। অবশেষে উপযুক্ত প্রযুক্তি হাতে এলে ২০১২ সালে হিগ্‌স বোসনকে বাস্তবে 'দেখা গেছে'। একমাত্র তখনই এই কণিকার কল্পনাটি পূর্ণ গ্রহণযোগ্য তো হয়েছেই বিভিন্ন কণিকার ভর সৃষ্টির পুরো তত্ত্ব সহ স্ট্যান্ডার্ড মডেল নামে পরিচিত মৌলিক কণিকা সমূহের সামগ্রিক তত্ত্বটিও অবশেষে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এভাবে বাস্তবে প্রমাণিত হবার আবশ্যকতা এবং যুক্তিতেও বিশ্বাসযোগ্য হবার আবশ্যকতা একটি প্রশ্নকে খুব বড় করে তোলে– সেটি হলো গোড়াতেই তত্ত্বটির মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে কিনা যে তাকে এমন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন করা যাবে যাতে সেটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে। যদি তত্ত্বটি এমন হয় যে সেই রকম কোন পরীক্ষা চিন্তাই করা যায়না। তা হলে তত্ত্বটি সত্য না মিথ্যা এটি যাচাই করার কোন সুযোগই ঘটবেনা। বিশেষ করে মিথ্যা বলে

প্রমাণ করতে পারাটি এতো জরুরি কেন? কারণ এমন একটি পরীক্ষায় সত্য প্রমাণিত হলেও তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়না, অন্য নানা দিক থেকে তাকে আরো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু একবার যে কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা গেলে তত্ত্ব হিসেবে তার গ্রহণযোগ্য হবার আর সুযোগ থাকেনা। এ যুগের বিজ্ঞান-দার্শনিক কার্ল পপার এই ব্যাপারটিকে কোন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক হবার প্রধান শর্ত মনে করেছেন– তত্ত্বের ভেতরেই তাকে মিথ্যায়ন করার উপায় নিহিত আছে কিনা। সেটি যদি না থাকে তা হলে সেটি আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবেনা। এভবে মিথ্যায়িত হবার সুযোগ থাকাকে পপার সত্যিকার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে নকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে পৃথক করতে পারার একটি উপায় হিসেবেই নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে একটি তত্ত্বকে যত বেশি রকমে পৃথক পৃথক ভাবে মিথ্যা প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে, সেটি ততই ভাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে।

অতীতে এমন কোন কোন তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু দিন টিকে ছিলো যাকে মিথ্যা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই সুযোগে এগুলো দীর্ঘকাল টিকে ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বলে গৃহীত হয়নি। আধুনিক কেমিস্ট্রির প্রথম যুগে কোন জিনিস পুড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া অথবা কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা হতো ফলিজেস্টোন তত্ত্ব নামের একটি তত্ত্ব দিয়ে। ১৭ শতকের বড় সময় জুড়ে প্রায় সব বিখ্যাত রসায়নবিদ এই তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন তাঁদের আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করতে। ফলিজেস্টোন জিনিসটি এমন ভাবে কল্পিত হয়েছিলো যে তাকে প্রয়োজন মত নানা গুণ দেয়া যেতো, যাতে তত্ত্বের মধ্যে এর কথিত ভূমিকাটি বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায়। ফলে একে মিথ্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব ছিলো। যে কোন বস্তুর দহনে সাহায্য করে এমন একটি রহস্যময় জিনিস হিসেবে ফলিজেস্টোনকে কল্পনা করা হয়েছিল– শব্দটির অর্থ হলো আগুনের শিখা। এই তত্ত্বে বলা হতো পোড়ার সময় বস্তুটি থেকে ফলিজেস্টোন বাতাসে চলে যায়, বদ্ধ পাত্রে সীমিত বাতাস ক্রমাগত আর ফলিজেস্টোন নিতে পারেনা বলে সেখানে কিছুক্ষণ পর পোড়া বন্ধ হয়ে যায়। যখন অক্সিজেন গ্যাসটি আবিষ্কৃত হলো দেখা গেলো এটি সবকিছুকে বেশিক্ষণ ধরে জ্বলতে সাহায্য করে– তাই ধরে নেয়া হলো গ্যাসটি আসলে ফলিজেস্টোন হারানো বাতাস, ফলিজেস্টোন কম আছে বলে এটি আরো আরো ফলিজেস্টোন গ্রহণ করে পোড়াকে সাহায্য করতে পারে। সে সময় ওই গ্যাসটিকে অক্সিজেন বলা হতোনা, বলা হতো, 'ফলিজেস্টোন হারানো বাতাস'। কয়লা আর লৌহ-

পাথর একত্র পুড়লে কয়লার ফলিজেস্টোন গ্রহণ করে লৌহ-পাথরটি ধাতব লোহাতে পরিণত হয়– ওই ফলিজেস্টোনের কারণে ওটি ধাতব গুণ পায়, চক চক করে, ইত্যাদি। কিন্তু আবার বাতাসে রেখে গরম করলে এই চক চক করা ধাতুতেই এক রকম মরিচা ধরে ওটি আবার পাথরের রূপ লাভ করে; অর্থাৎ গরম করার ফলে এর ফলিজেস্টোন বাতাসে চলে গিয়ে ওটি আবার লৌহ-পাথরে পরিণত হচ্ছে। কাজেই ফলিজেস্টোন দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হচ্ছিলোনা– কারণ ওটিকে এভাবেই কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে অস্বস্তি দেখা যাচ্ছিলো যে ধাতব লোহাকে বাতাসে গরম করলে তার ওজন বেড়ে যায়। ফলিজেস্টোন নামক জিনিসটি ধাতু থেকে চলে যাচ্ছে, অথচ ধাতুর ওজন বাড়ছে– এটি কী ভাবে হতে পারে? এই ক্ষেত্রে ফলিজেস্টোন তত্ত্বটি খুবই সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলো। তত্ত্বের সমর্থক বিজ্ঞানীরা ফলিজেস্টোন তত্ত্বকে মিথ্যায়ন করার কোন সুযোগই রাখতে চাচ্ছিলেন না, তাঁরা একটি মহা অদ্ভুত কথা বল্‌লেন– ফলিজেস্টোনের 'ঋণাত্মক ভর' রয়েছে অর্থাৎ এটি চলে গেলে বরং ভর বাড়ে। এভাবে অদ্ভুত একটি গুণ জবরদস্তি আরোপ করে ফলিজেস্টোন তত্ত্বটিকে মিথ্যায়নের সুযোগ কেড়ে নেয়াটি কোন কোন বিজ্ঞানী ভাল চোখে দেখলেননা।

ফরাসী রসায়নবিদ ল্যাভোশিয়ে ফলিজেস্টোন তত্ত্বটি বাতিল করলেন একটি বিকল্প তত্ত্ব দিয়ে যাকে এক্সপেরিমেন্টে মিথ্যা বা সত্য প্রমাণ করা সম্ভব। এই তত্ত্ব হলো বাতাসে ধাতুকে গরম করলে ধাতুটি বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে তার সঙ্গে যুক্ত হয়– ওটিই মরিচা ধরার প্রক্রিয়া। অক্সিজেন যুক্ত হয়েই এর ভর বাড়ে। এর জন্য কী এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে তাও স্পষ্ট ছিল– দেখতে হবে যে পাত্রের মধ্যে যত অক্সিজেন কমে তার ভর ধাতুটির ভর বৃদ্ধির সমান কিনা। যদি তা না হয় তা হলে এই তত্ত্বটি মিথ্যায়িত হবে, নইলে তত্ত্বটি টিকে যাবে। খুবই সাবধানে বদ্ধ পাত্রের মধ্যে ওজন করে বাতাস ঢুকিয়ে এবং বদ্ধ অবস্থায় ধাতুকে গরম করে তিনি দেখিয়েছেন বাতাসের যে অংশ ভর হারিয়েছে তা ধাতুর ওজন বৃদ্ধির সমান। আর বাতাস ওজন হারিয়েছে বাতাস থেকে অক্সিজেন অংশটি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণে। বাতাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুই গ্যাসের মিশ্রণ হওয়াটিও তত্ত্বের অংশ। বাতাসের সহায়তা পোড়ার ক্ষেত্রে লাগে ফলিজেস্টোন নেবার জন্য নয়, বরং বাতাসের অক্সিজেন এর বিক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় বলে। বাতাসের বদলে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ব্যবহার করা হলে পোড়া আর জ্বলে ওঠাটি আরো তীব্র হয় একারণেই। এই সবগুলো

বক্তব্যই অপেক্ষাকৃত সহজ এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে মিথ্যায়ন করা সম্ভব, এবং সে সব এক্সপেরিমেন্ট অসংখ্যবার করেও তত্ত্বটি মিথ্যায়ন করতে কেউ সমর্থ হয়নি বলেই এগুলো আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তত্ত্বের মধ্যে মিথ্যায়নের সুযোগ ছিল বলেই এই আধুনিক কেমিস্ট্রির বৈজ্ঞানিক সত্ত্বাটি স্পষ্ট হতে পেরেছে। ফলিজেস্টোন তত্ত্বের সেটি ছিলোনা। তাই গোড়া থেকেই ওটি অবৈজ্ঞানিক ছিল।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্গুলো কোন্ কোন্ কারণে অপেক্ষাকৃত ভাল তত্ত্ব হতে পারে তার একটি শর্ত হলো বেশি বিচিত্র ধরনের পথে তাকে মিথ্যায়নের সম্মুখীন করতে পারা। এরও একটি উদাহরণ দেয়া যাক। তত্ত্ব যদি ভাল তত্ত্ব হবার শর্ত একেবারে পূরণ না করে তাকে বাতিল করা ছাড়া উপায় থাকেনা– যেমন ফলিজেস্টোন তত্ত্ব বাতিল হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় চমৎকার ভাবে শর্ত পূরণ করা খুবই ভাল তত্ত্বও একই বিষয়ে আরো বেশি ভাল তত্ত্বের সামনে প্রতিযোগিতায় পড়ে। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশি ভাল তত্ত্বটিতে মিথ্যায়নের বেশি রকমের সুযোগ থাকছে, এবং তত্ত্বটি ওর সবগুলোতে মিথ্যায়ন এড়াতে পারছে। তিন শ' বছর পুরানো নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এই পুরো সময় ধরে অত্যন্ত ভাল তত্ত্ব হিসেবে সুনাম রেখেছে। ওই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করার বহু সুযোগ তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন ভাবেই এই দীর্ঘ সময়ে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়নি– এ সম্পর্কে অসংখ্য পরীক্ষা সত্ত্বেও। তবে অল্প কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের দ্বারা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়নি- যেমন বুধ গ্রহের অদ্ভুত আচরণ। কিন্তু ওই সামান্য দু'একটি ব্যর্থতা এর সুনাম আটকায়নি। অবশ্য নিউটনের তত্ত্বের দার্শনিক গ্রহণযোগ্যতায়ও কিছুটা সমস্যা ছিল যা স্বয়ং নিউটনও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পরস্পর থেকে এত দূরে একটি ভর আরেকটি ভরের ওপর কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার কোন প্রক্রিয়া এতে স্পষ্ট নয়; তা ছাড়া যেতে কোন সময় না নিয়ে একেবারে তাৎক্ষণিক ভাবে কী ভাবে এই প্রভাব সেখানে পৌঁছে যায় সেই বিষয়টিও বোঝা যাচ্ছিলোনা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসব কিন্তু তার সাফল্য আটকায়নি। এই সুনাম রাতারাতি হয়নি। সাফল্যের পর সাফল্য তাকে এটি এনে দিয়েছে। প্রথম দিকে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের হিসেবে পাওয়া ফল আর বাস্তব পরিমাপের ফলের মধ্যে কখনো এমন পার্থক্য থাকতো যে তা সন্দেহে ফেলে দিতো। কিন্তু পরে দেখা গেছে যে তা পরিমাপের ভুল, তত্ত্বের নয়। এভাবে পরিমাপের প্রযুক্তি যতই নিখুঁত হয়েছে ততই তত্ত্বের হিসেব ও

পরিমাপে পাওয়া ফল একেবারে অতি সূক্ষ্ম ভাবে মিলে গেছে। পৃথিবীর ওপর নানা ঘটনায়, আকাশে জ্যোতির্বিদ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের ঘটনায়, সব কিছুতে এতই সূক্ষ্ম এই মিল তত্ত্বটিকে বিচিত্র দিক থেকে সমর্থন যুগিয়েছে; এমনকি এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে নতুন গ্রহ নেপচুনও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। নানা ভাবে চেষ্টাতেও মিথ্যায়ন না হওয়া, আর বিচিত্র ক্ষেত্র থেকে সাফল্যের সমর্থন পাওয়া একটি তত্ত্বকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে আইনস্টাইন এই মাধ্যাকর্ষণ নিয়েই সম্পূর্ণ একটি নতুন তত্ত্ব দিলেন যেটি আরো ভাল তত্ত্ব। নিউটনের তত্ত্বে মহাকর্ষকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুটি ভর মাত্রেরই মধ্যে দূর থেকে একটি আকর্ষণ হিসেবে। আর আইনস্টাইনের তত্ত্বে একে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভর মাত্রই তার আশপাশের স্থান-কালে ভাঁজ সৃষ্টি করে এমনটি দেখিয়ে; এবং অন্য কোন ভর এখানে এলে তাকে ওই ভাঁজকে অনুসরণ করে চলতে হয়– সেটিই দুটি ভরকে কাছে এনে মহাকর্ষ ঘটায়। তত্ত্ব থেকে হিসেব করা ফল বাস্তবে পরিমাপ করা ফলের সঙ্গে উভয় তত্ত্বেই নিখুঁত ভাবে মিলে যায়, তাই সাধারণভাবে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব ও আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবার কিছু নেই। কাজেই সাধারণ ভাবে দুটিই পরীক্ষায় পাশ করা তত্ত্ব। কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব এমনো কিছু সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যা নিউটনের তত্ত্ব পারেনি– যেমন বুধ গ্রহের ওই অদ্ভুত আচরণ ব্যাখ্যায়, দূর তারা থেকে আসা আলো সূর্যের কারণে সঠিক পরিমাণে বেঁকে যাওয়া, বা ব্ল্যাক হোলের দ্বারা আলো সহ সব কিছুকে গিলে ফেলা ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে আইনস্টাইনের এই তত্ত্বে নিউটনের তত্ত্বের সব সাফল্য তো রয়েছেই, কিছু বাড়তি সাফল্যও আছে। তাছাড়া আরো বড় কথা আইনস্টাইনের তত্ত্ব এমন যে তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার সুযোগ নিউটনের তত্ত্বের থেকে আরো বেশি, এটি আরো বৃহত্তর সব ক্ষেত্রে যেমন মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বিকাশ, ভবিষ্যত ইত্যাদির ভবিষ্যদ্বাণীতে আরো কঠিন সব পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। কাজেই নিউটনের তত্ত্বের এতদিনের সুনাম সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদেরকে স্বীকার করতেই হলো যে আইনস্টাইনের তত্ত্বটিই সঠিক তত্ত্ব, নিউটনেরটি নয়। তাছাড়া ওই যে দূরে প্রভাব রাখা, তাৎক্ষণিক ভাবে সে প্রভাব সেখানে চলে যাওয়া এমন মেনে নেয়ার অস্বস্তি থেকেও আইনস্টাইনের তত্ত্বটি মুক্ত। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বই তো দেখিয়েছে যে কোন কিছুই আলোর গতির থেকে বেশি বেগে চল্‌তে পারেনা, একটি ভরের ওপর আরেকটির প্রভাবও

তেমন গতিতে এগুতে পারেনা– তাৎক্ষণিক হবার তো প্রশ্নই ওঠেনা। তবে নিউটনের তত্ত্ব একেবারে বাতিল হয়নি কারণ দৈনন্দিন যা নিয়ে বিজ্ঞানীদেরকে ও অন্যান্যদেরকে কাজ করতে হয় সেখানে নিউটনের তত্ত্বটি একেবারেই সঠিক ফল দেয় এবং তাকে অনেক বেশি সহজ ও যুৎসই ভাবে ব্যবহার করা যায়। সমস্যা হয় যখন অত্যন্ত ভারী বস্তু যেমন গ্যালাক্সি, ব্ল্যাকহোল, মহাবিশ্ব ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হয়, সেখানে আইনস্টাইনের তত্ত্বটি ছাড়া উপায় নেই। তাই বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি হলো যে আইনস্টাইনের তত্ত্বটিই সঠিক, তবে অপেক্ষাকৃত কম ভারী বস্তুর সীমিত পরিসরে নিউটনেরটিও যথেষ্ট কার্যকর। বলা যায় সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রথমটির একটি আসন্ন তত্ত্ব। আসন্ন এই অর্থে যে ভর যখন কম থাকে তখন পুরো ব্যাপারটিকে আমরা একটি আকর্ষণ বল হিসেবে আপাতত মেনে নিতে পারি, স্থান-কালের ভাঁজের বিষয়টিকে এর মধ্যে না এনেও, কারণ তাতে ফলাফলের যে পার্থক্য হবে তাকে তুচ্ছ করা যায়। এখানে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হলো আইনস্টাইনের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করার শত শত রাস্তা রয়ে গেছে, যত রাস্তা নিউটনেরটায় নেই। সে জন্যই সহজে বোঝা যায় যে আইনস্টাইনের তত্ত্বটিই সত্য। সাহিত্যের যে মহাকাব্য তার কোন অংশকে মিথ্যা প্রমাণিত করার কোন রাস্তা এর রচয়িতারা রাখবেননা। কিন্তু বিজ্ঞানের মহাকাব্যে সেটি রাখাটাই তাঁদের কৃতিত্ব। এজন্যও এই মহাকাব্য ব্যতিক্রমী।

**সাফল্যের বেশি সমর্থনই ভাল তত্ত্ব গড়ে তোলে:**

একটি তত্ত্ব ভাল কিনা তার কিছু পরিচয় সেটি মিথ্যা প্রমাণের কত বেশি পথ আছে তার থেকে পাওয়া যায়। তবে পথ থাকলেই হবেনা, সেই পথে পরীক্ষা চালিয়ে মিথ্যা প্রমাণিত না হয়ে তাকে টিকেও থাকতে হবে। এসব পরীক্ষায় একবার সফল হলে তত্ত্বটি মিথ্যায়িত হলোনা বটে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠিত হবার মাত্রাটি খুব একটা বাড়লো না। সেটি বাড়বে যখন আরো নানা সমস্যায় ও পরিস্থিতিতে তত্ত্বটি সাফল্য পাবে তখন। যত বেশি সমস্যায় এটি হবে আর যত বেশি বার হবে ততই তত্ত্বটি আরো ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া– ভাল তত্ত্ব যে সত্যি সত্যি ভাল তার প্রমাণ পেতে সময় লাগে। বিংশ শতাব্দীতে আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্ব এসে এর ওপর অগ্রাধিকার পেলেও দীর্ঘ তিন শত বছর নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। একের পর এক জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনায় ও অন্যান্য ঘটনায়

সাফল্য লাভের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠা এটি লাভ করেছিলো। এই সাফল্য কখনো কখনো রীতিমত নাটকীয় রূপ ধারন করেছে। ১৮৪৬ সালে নেপচুন গ্রহটির আবিষ্কার এমনি একটি নাটকীয় সাফল্য।

নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে উল্‌টো করে ব্যবহার করার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওই গ্রহটির সূর্য-আবর্তনের কক্ষপথে এমন কিছু অনিয়ম দেখা যাচ্ছিল যা সহজে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিলোনা। তবে এমন একটি সম্ভাবনার কল্পনা করা হলো যে অন্য একটি গ্রহের আকর্ষণে কক্ষপথ থেকে এমন বিচ্যুতি ঘটতে পারে, যেই গ্রহ এখনো অনাবিষ্কৃত রয়েছে। এরকম একটি আন্দাজ থেকে সেই অজানা কল্পিত গ্রহটি কোথায় থাকলে, কত ভরের হলে, কত বড় হলে ইউরেনাসের কক্ষপথের দেখা যাওয়া বিচ্যুতিটিই হুবহু দেখা যাবে সেই অংকটাই তত্ত্বের উল্‌টো ব্যবহারে নির্ণয় করা হয়েছে। এসব তথ্য পেয়ে যাওয়ার পর ওই আন্দাজ আদৌ সঠিক কিনা তা অনুসন্ধান করার সুযোগ ঘটেছে। যথাযথ দূরবীক্ষণ দিয়ে ওখানেই তাই খোঁজ করা হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী করা গ্রহটির মত কোন অজানা গ্রহের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। অনুসন্ধান সফল হয়ে ওখানে ঠিক সেরকম একটি গ্রহ দেখা গেছে, নেপচুন গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি নিউটনের তত্ত্বের আরো সাফল্যের একটি বিখ্যাত উদাহরণ। যদি ওই অনুসন্ধানে কোন নতুন গ্রহ পাওয়া না যেতো, তা হলে কি নিউটনের তত্ত্বটি মিথ্যা প্রমাণিত হতো? না তা অবশ্য হতোনা, কারণ গ্রহটি দেখা না যাওয়ার আরো বহু রকম পরিস্থিতিগত কারণ থাকতে পারতো, আন্দাজটি সত্য নাও হতে পারতো, ইউরেনাসের কক্ষপথের অনিয়মের অন্য কারণ থাকতে পারতো। তা ছাড়া নিউটনের তত্ত্ব ইতোমধ্যে অসংখ্য ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলো। দু'একটি ক্ষেত্রে অসফল হলে তাই ধরে নেয়া হয়তো তা তত্ত্বের ভুলের কারণে নয়, অন্য কোন কারণে হয়েছে। তবে সত্যি সত্যি নেপচুনকে খুঁজে পাওয়া ছিল তত্ত্বটির একটি বিরাট নাটকীয় বিজয়।

আমাদের সময়ের আরো কাছে এই তত্ত্ব আরো দুর্দান্ত নাটকীয় ভাবে সফল হয়েছে। ষাটের দশকে মহাশূন্য অভিযান যখন চাঁদকে তার লক্ষ্য করেছিলো তখন ওই অভিযানের পথের ও গন্তব্যে পৌঁছার সব হিসেব নিকেষ করা হয়েছিলো নিউটনের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে– পৃথিবী ও চাঁদের মত কম ভরের জিনিসে আইনস্টাইনের তত্ত্বের কোন প্রয়োজন নেই, অনেক সহজ

নিউটনেরটিই যথেষ্ট। যদিও ইতোমধ্যে ওটি আসন্ন তত্ত্ব, তবুও এই তত্ত্বই ১৯৬৯ সালে এপলো-১১ যাত্রায় মানুষকে প্রথম চাঁদে নিয়ে গিয়েছিলো– এটি কোন জানা গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি নয়, এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হয়েছে মানুষের তৈরি মহাশূন্যযানের মত সম্পূর্ণ নতুন জিনিস নিয়ে, হিসেব করা নতুন পথে তারই প্রথম বার চাঁদে গিয়ে পৌঁছানো– হুবহু ঠিক যেখানে নামা দরকার সেখানে। নিউটনের তত্ত্বের বাহাদুরি আর কাকে বলে? তবে নাটকীয়তার তখনো অনেক বাকি। সেটি এলো এর দু'বছর পর ১৯৭১ সালে এপলো-১৩ এর তিনজন আরোহী নিয়ে চাঁদে যাওয়ার পথে, ভয়ানক এক দুর্ঘটনার আকারে। চাঁদের পথে মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে তাঁদের মহাশূন্যযানে বিস্ফোরণ ঘটে এবং এর পুরো প্রধান অংশটি নষ্ট হয়ে তার অক্সিজেন, জ্বালানি সব নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হয় তার কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ ক্ষমতাও। এর অর্থ চাঁদে যাওয়া ও ফেরার পুরো পথে জীবন রক্ষার জন্য যে অক্সিজেন দরকার, পথের বড় রকেটের যে জ্বালানি দরকার, নিশ্বাসে যে ক্ষতিকারী কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে বাতাস দূষিত করছে তা সরানোর ব্যবস্থা এসব কিছুই রইলোনা। মূল যান থেকে চাঁদে নামার জন্য যে ছোট্ট যানটি এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ওখানে গিয়ে ওখানকার অল্প অক্সিজেন, জ্বালানি, ও শুধু চাঁদে নামা ও ওঠার জন্য থাকা ছোট রকেটের ওপর ভরসা করেই আরোহীদেরকে বাঁচার পরিকল্পনা করতে হলো, পৃথিবীতে থাকা গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে মিলে হিসেব নিকেষ করে।

দেখা গেলো তাঁদেরকে বাঁচানোর জন্য একেবারে কিনারার সম্ভাবনা কিছু হতে পারে একটি মাত্র কৌশলে– এপলো-১৩ কে যেভাবে চাঁদের দিকে ইঞ্জিনবিহীন নিজস্ব গতিতে যাচ্ছে তা যেতে দেয়া; চাঁদের কাছে গিয়ে তার আকর্ষণে তার চারিদিকে অর্ধেকটা ঘুরে পৃথিবীর দিকে মুখ করা মাত্র ওখানকার ছোট্ট রকেটকে সামান্যক্ষণ চালু করে আবর্তন পথ ছেড়ে পৃথিবীর পথে যাত্রা শুরু করা। পৃথিবীর দিকে গতি সঞ্চারে বড় অবদানটি রাখবে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ, যা এপলো-১৩কে অংশত ঘুরিয়ে এনে সামনে ঠেলে দেবে অনেকটা একটি গুলতিকে ঘুরিয়ে এনে সামনে ছুঁড়ে দেয়ার মতো। এই সব হিসেব যদি সঠিক হয় তা হলে পৃথিবীতে ফিরে আসার মত অক্সিজেন ইত্যাদিতে কোন রকমে কুলিয়ে যাবে। কোথাও ভুল করার কোন সুযোগ ছিলনা, যেমন রকেটটিকে কয়েক সেকেণ্ডও বেশি বা কম চালালে তার অর্থ হতো পৃথিবীতে কখনো ফিরে না আসা, নিউটনের তত্ত্বেও বিন্দুমাত্র ভুল হবার কোন অবকাশ ছিলনা। দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পুরো পরিকল্পনা ও কৌশলটাই ছিল হঠাৎ করে নিতে

হওয়া সম্পূর্ণ অভিনব একটি ঘটনা, আগে কোনদিন এরকম পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে হয়নি। তত্ত্বের ওপর কতখানি আস্থা থাকলে এভাবে সারা দুনিয়াকে স্তব্ধ উদ্বিগ্ন রেখে জীবন বাঁচাতে তা প্রয়োগ করা যায় ও তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি শুধু নিউটনের তত্ত্বের জন্য বিরাট সাফল্য নয়, পুরো বিজ্ঞানের জন্যও তাই। বিজ্ঞানে সাফল্য বল্‌তে কী বোঝায় এটি তার একটি জাজ্জল্যমান উদাহরণ। এখানে ভাল বোঝা যায় সম্পূর্ণ নতুন নতুন পরিস্থিতিতে একের পর এক বহু সাফল্যই ভাল তত্ত্বের পরিচায়ক কেন।

ক্রমাগত সাফল্যের সমর্থনে একটি তত্ত্ব কী ভাবে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে জীববিদ্যা থেকেও তার একটি উদাহরণ নেবার জন্য আমাদের ইতোমধ্যে দেখা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বটি দেখা যাক। শুরুতে ডারউইনের মাথায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিষয়টি যখন ঝিলিক দিয়েছিলো সেটি নেহাতই একটি সুদূর সম্ভাবনার মতো। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ বয়সেও একজন কৌতুহলী ও পাকা প্রকৃতিবিদের মন নিয়ে তিনি যখন পালতোলা জাহাজে দুনিয়ার স্বল্প পরিচিত জায়গাগুলোতে পাঁচ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্বজোড়া বিভিন্ন গোষ্ঠির প্রাণী সম্পর্কে জানা জ্ঞানের বেশ কিছুটা ইতোমধ্যে তাঁর দখলে, সম্ভাবনার কিছু উপাদান তখনই তাঁর কাছে এসেছে। এসব তথ্য তখন সংগৃহীত হলেও এগুলোকে দুয়ে দুয়ে মিলে চার করে এর মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আইডিয়াটি উঁকিঝুঁকি দিলো দেশে ফিরে যখন এসব ব্যাপারে গবেষণা শুরু করেন তখন। তখন থেকে শুরু করে 'অরিজিন অফ স্পেসিস' বইতে খোলাসা করে তত্ত্বটি প্রকাশের আগে পর্যন্ত পঁচিশ বছর তাঁর এই গবেষণা চলেছে, এবং ক্রমেই তিনি বেশি বেশি করে এই তত্ত্বের সাফল্যের সমর্থন দেখতে পেয়েছেন। বইটি সে সময় প্রকাশ করার আর একটি কারণ হলো আরেকজন বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়ালেস যিনি তখন বহু বছর ধরে আজকের মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে প্রকৃতি-গবেষণায় কাটিয়েছেন, তিনি ডারউইনকে চিঠি লিখে ওসময় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত একই তত্ত্বের আইডিয়া জানান– যার পেছনেও ছিলো ওখানকার অনেক পর্যবেক্ষণের সমর্থন। ওয়ালেসেরও আন্দাজ করা একই তত্ত্বের কথা না জানলে ডারউইন প্রস্তাবিত নিজের প্রস্তাবিত তত্ত্ব প্রকাশে হয়তো আরো দেরি করতেন। ডারউইন ও ওয়ালেস পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়ে একই সময়ে তত্ত্বটি প্রবন্ধ হিসেবে প্রথম প্রকাশ করেন। এর পরে আসে ডারউইনের বিখ্যাত বইটি।

এ তত্ত্বের প্রতি বাস্তব সমর্থনের একটি উদাহরণ নেয়া যাক, ডারউইনের বিশ্ব-ভ্রমণের সময় সংগৃহীত উপাত্ত থেকেই। দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে হাজারো মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে বিচ্ছিন্ন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ। কোন দ্বীপে কোন মানুষ থাকেনা। ওখানকার কিছু প্রাণী ডারউইনকে খুবই কৌতুহলী করেছে– তার মধ্যে ছিল বিশেষ কিছু চড়ুই পাখি, আর বিশেষ কচ্ছপ। এখন 'ডারউইনের ফিন্‌চ' বলে পরিচিত চড়ু ইগুলোর এক এক প্রজাতি এক এক দ্বীপে দেখা গেছে, একটি থেকে অন্যটির প্রধান পার্থক্য তার ঠোঁটের আকার আকৃতিতে। বিচিত্র সব ঠোঁট এক দ্বীপে এক এক রকম– কোনটি শক্ত মোটা, কোনটা পাতলা ছোট, কোনটা চিমটের মত, কোনটা সরু অনেক লম্বা আমাদের ড্রিংক্‌স মুখে টানার স্ট্র'র মতো। সেই সঙ্গে ডারউইন দেখলেন যে যেই দ্বীপে শক্ত মোটা ঠোঁট, সেখানে চড়ুইয়ের একমাত্র খাবার শক্ত বাদাম, যেই দ্বীপে চিম্‌টের মত ঠোঁট, সেখানে একমাত্র খাবার মাটির ওপর বীজ, আর যেখানে ঠোঁট স্ট্র'র মতো সেখানে একমাত্র খাবার ফুলের গভীরে থাকা মৌ-রস। প্রাকৃতিক নির্বাচনের চিন্তায় পরে ডারউইন বুঝতে পেরেছিলেন এসব বৈচিত্রের কারণ। যে দ্বীপে শুধু শক্ত বাদাম সেখানে দৈবক্রমে মিউট্যাশনে অপেক্ষাকৃত শক্ত মোটা ঠোঁটওয়ালা যে ক'টি ছিল সেই চড়ুইগুলোই বাড়তি সুবিধা পেয়েছে বাদাম ভেঙ্গে খেতে। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে তারাই টিকে থেকেছে। একথা অন্য রকম ঠোঁট নিয়ে অন্য দ্বীপের চড়ু ইয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; আবার কচ্ছপ ইত্যাদি অন্য প্রাণীর বৈচিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কচ্ছপের ক্ষেত্রে অবশ্য সুবিধাটি পেয়েছে বিশেষ রকমের দেহ-খোল; যেমন যে দ্বীপে খাদ্য শুধু মাটিতে সেখানে গুম্বজের আকৃতির খোলে নিচের দিকে গলা বাড়াতে সুযোগ পাওয়ায় সে রকম খোলটিতে থাকতে সুবিধা পেয়েছে। ডারউইন দেখলেন ভিন্ন কোন ভাবে এসব বৈচিত্রের ব্যাখ্যার সুযোগ নেই– অথচ দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে প্রাকৃতিক নির্বাচনে পরিবর্তন দিয়ে এর সবই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যে দ্বীপে চড়ুইয়ের একমাত্র খাদ্য মাটির বীজ সে দ্বীপে চিমটার মত ঠোঁটের মিউট্যাশন টিকে থেকেছে, যে দ্বীপে শুধু ফুলই তাদের খাবার সে দ্বীপে লম্বা ঠোঁটের চড়ুই।

দেশে ফিরে ওই দীর্ঘকাল গবেষণার সময় ডারউইন আরো অনেক জীব-বৈচিত্রের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এর জন্য আজকের জীব এবং প্রাচীন ফসিল জীব উভয় রকমের প্রচুর তুলনা তিনি করেছেন। তবে সবচেয়ে পরিশ্রম সাপেক্ষ গবেষণা বোধ হয় করেছেন

'বারনাকেল' নামে পরিচিত সামুদ্রিক কাঁকড়া জাতীয় যে পরজীবী প্রাণী নানা জায়গার ওপর আঠার মত ব্যবস্থায় নিজেকে শক্ত করে আটকিয়ে রাখে সেগুলোর ওপর। এর কারণ এগুলোর অবাক-করা বৈচিত্র। শঙ্খ জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর খোলের ওপর, তিমির গায়ের ওপর, পানিতে ডোবা শিলা পাথরের গায়ে, জাহাজের গায়ে তেমনি এমন কোন যুৎসই তল নেই যার গায়ে বিচিত্র বারনাকেল নিজেদেরকে আটকায়না। ওখানে এরা কখনো রীতিমতো বড় কলোনি গড়ে তুলে। সারা দুনিয়ার নানা অঞ্চলের নানা মানুষের কাছে অনুরোধ করে তিনি সেখানকার বিশেষ ধরনের বারনাকেলও প্রচুর পরিমাণে আনাবার ব্যবস্থা করেন এবং দীর্ঘ আট বছর দিনের পর দিন শুধু এগুলো নিয়ে গবেষণায় ব্যয় করেন। বারনাকেলের এমন সব সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যার কোন কোনটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ সুবিধার কাজে লেগে যায়। যেহেতু তার পরিবেশ পরিস্থিতি অসংখ্য রকমের হয়ে থাকে, তাই এসব অঙ্গের বৈচিত্রও দেখা যায় অসংখ্য রকম। ডারউইন সেগুলোর মধ্যে সম্পর্ক খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলেন। এদের পর পর প্রজন্ম ঘন ঘন আসে বলে একের পর এক প্রজন্মে ওই সুবিধাগুলো কীভাবে বারনাকেলের ওই অঙ্গকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে ফেলেছে তাও কিছুটা লক্ষ্য করতে পারলেন। সব কিছুর মধ্যে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনটি স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

প্রাকৃতিক নির্বাচন যে রকম দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতিতে হয়ে চলে জীবজগতকে পরিবর্তিত করছে তার পাশাপাশি মানুষ নিজেও এক ধরনের পরিবর্তন জীবজগতে ঘটাচ্ছে নিজেই বিশেষ রকম উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নির্বাচন করে, অর্থাৎ কোন বিশেষ উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিশেষ প্রকার বাছাই করে শুধু সেগুলোর মধ্যে প্রজননের সুযোগ করে দিয়ে। বন্য প্রজাতি থেকে বিশেষ গুণসম্পন্ন গুলোকে নির্বাচিত করে ধীর ধীরে কৃষির সুবিধাজনক পোষ-মানা প্রজাতিতে পরিণত করা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বন্য ধান থেকে কৃষিজ ধান, বন্য গরু থেকে গৃহপালিত গরু ইত্যাদির সৃষ্টিতে এটি ঘটেছে। তবে ডারউইনের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে দেখার সুবিধা হলো তাঁর কাছের প্রতিবেশী কুকুর প্রজননকারীদের কাজ। ডারউইন দেখলেন প্রকৃতি যা করে ওরাও তাই করে; কুকুর বৈচিত্রের মধ্যে বিশেষ কোন মিউট্যাশনের কুকুর বাছাই করে শুধু তাদের মধ্যে প্রজননের সুযোগ করে দেয়। তাকে বলা যায় কৃত্রিম নির্বাচন। যেমন যদি খুব লম্বা কানের কুকুরের জাত তারা উদ্ভাবন করতে চায়, তা হলে সাধারণ কুকুরদের মধ্যে যাদের কান মিউট্যাশনের কারণে ইতোমধ্যেই সামান্য বেশি লম্বা তাদেরকেই

বাছাই করে নিয়ে শুধু তাদের মধ্যে প্রজনন করায়। এই ক্ষেত্রে এরাই বেশি জন্মাচ্ছে লম্বা কান কোন সুবিধা দিচ্ছে বলে নয়, মানুষটি তাদেরকেই চাচ্ছে বলেই। এই বিষয়টিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে তার বড় পার্থক্য আছে। অন্যান্য অনেক কিছুতে প্রাকৃতিক নির্বাচন ও মানুষের দ্বারা কৃত্রিম নির্বাচনের মধ্যে মিল আছে। কৃত্রিম নির্বাচন যদি অনেক লম্বা কানের মত নতুন নতুন বৈচিত্র সৃষ্টি করতে পারে তা হলে প্রাকৃতিক নির্বাচন তা পারবেনা কেন? কৃত্রিম নির্বাচন চোখের সামনে দেখা যাওয়া ঘটনা বলে তা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বুঝতে সাহায্য করেছে। এভাবে কৃত্রিম নির্বাচনেই তো গড়ে ওঠেছে সাধারণ কুকুর থেকে দৌড়বিদ কুকুর, ভয়ঙ্কর চেহারার কুকুর, ভেড়া চরাবার মতো বিশেষ স্বভাবের কুকুর ইত্যাদি। তেমনি যারা কবুতর প্রজনন করায় তারাও তো কত রকমের অদ্ভুত দেখতে কবুতর গড়ে তোলে। প্রকৃতিও তাই করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে।

একটি ফুল কী ভাবে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনে হুবহু একটি মৌমাছির আকৃতি ধারণ করতে পারে সেই জৈব-অনুকরণের (বায়ো-মিমিক্রি) একটি উদাহরণ আমরা দেখেছি। দেখা গেলো এরকম অসংখ্য জৈব-অনুকরণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই শুধু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যেমন দেখা যায় কোন কোন টিকটিকি জাতীয় প্রাণী এমন সবুজ রঙ, এমন পাতলা দেহ ও আকৃতি, গায়ের ওপর এমন রেখার ছোপ লাভ করেছে যাকে সবুজ গাছের ওপর একটি একটি পাতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না। স্পষ্টত ওরকম নানা মিউট্যাশন জমে জমে একটু একটু বেশি বেশি করে সে শিকারির দৃষ্টি এড়াবার সুবিধা পেয়েছে বলে প্রাকৃতিক নির্বাচনে এই রূপ ধারণ করেছে।

তেমনি যখন একই প্রাণী নানা দেশে নানা রূপ ধারণের প্রশ্ন উঠেছে তখনো প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া তার ব্যাখ্যা অন্য কোন ভাবে করা সম্ভব হয়নি। একে বলা হয় জৈব-ভূগোল (বায়ো-জিওগ্রাফি)। তাই উত্তর আমেরিকার প্রাচীন উট এশিয়ার চীনে এসে বড় আকারের দুই কুঁজ-ওয়ালা লোমশ উট হয়েছে এখানকার শীতল মরুভূমিতে সেই প্রকারগুলোই বেঁচে থেকে বংশ বিস্তার করতে পেরেছে বলে। কিন্তু হিমালয়ের এই পারে চলে আসা ভারতীয় উটের মধ্যে কিন্তু কালক্রমে কিছুটা ছোট আকারের, এক কুঁজ-ওয়ালা, কম লোমের রূপগুলোই বেশি টিকেছে এখানকার উত্তপ্ত মরুভূমির কারণে। ঠিক একই রকম কারণে একই উত্তর আমেরিকার উট দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত অঞ্চলে

গিয়ে একেবারেই ছোট আকারের ও ভিন্ন চেহারার লামা ও আলপাকায় রূপ পেয়েছে, ওখানকার পার্বত্য পরিবেশে ক্রমাগত ছোট থেকে ছোট সাইজ হওয়ার মিউট্যাশনগুলো বেশি সুবিধা পেয়েছে বলে। দেখা যায় জৈব-ভূগোলের এরকম সব ঘটনাই একমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনই সফল ব্যখ্যা করতে পেরেছে। এমন কি আজকের দিনে এসে এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার কেন কিছুদিনের মধ্যেই এক একটি এন্টিবায়োটিক্‌কে অকার্যকর করে তুলছে তারো ব্যাখ্যা এই প্রাকৃতিক নির্বাচন। এন্টিবায়োটিক যখন জীবাণুকে মেরে ফেলে তখন সব থেকে জোরালো কিছু জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে যাদের ওপর এন্টিবায়োটিক কাজ করেনা। ওই সুবিধা পেয়ে ওগুলোর সংখ্যাই তখন ব্যাপক হয় অর্থাৎ এই জোরালো জীবাণুগুলোই নির্বাচত হয়ে টিকে থাক্‌ছে, ওরাই দ্রুত বংশ বিস্তার করছে, অথচ ওদের বিরুদ্ধে ওই ওষুধ বেকার। জীবাণু খুব ঘন ঘন বংশ বিস্তার করে বলে এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলটি কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায়, শত শত বছর অপেক্ষা করতে হয়না।

এভাবে একেবারের বিচ্ছিন্ন জীবজগতের বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে সাফল্যের পর সাফল্যের সমর্থন পেয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের তত্ত্ব যেমন ক্রমাগত আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজ্ঞানের সব ভাল তত্ত্ব সেভাবেই বিজ্ঞানীদের অটল আস্থা অর্জন করেছে। এসব তত্ত্বই বিজ্ঞান মহাকাব্যের প্রতিষ্ঠিত কাহিনীর বুনোট তৈরি করেছে।

**সরল ও সুন্দর তত্ত্বই সঠিক তত্ত্বঃ**

একাধিক বিকল্প তত্ত্ব যদি কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারে এবং মিথ্যায়নের সুযোগে এবং সাফল্যের বৈচিত্রের দিক থেকে যদি দুটি একই রকম হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে কোন্‌টিকে সঠিক তত্ত্ব বলে গ্রহণ করবো? এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ঐতিহ্যগত গত ভাবে যে নীতি অনুসরণ করে আসছেন তা হলো যে তত্ত্বটি অপেক্ষাকৃত বেশি সরল সেটিই সঠিক। এই ঐতিহ্যটি গড়ে ওঠেছে একটি বিশ্বাসের ওপর যে সরল ব্যাখ্যায় যে উপাদানগুলো থাকে সেগুলো সত্য হবার সম্ভাবনা বেশি। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা এ রকম বিশ্বাস রাখি। খুব ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দেয়া কোন ব্যাখ্যার থেকে সোজা-সাপটা অল্প কথায় দেয়া যায় এমন ব্যাখ্যার ওপরই আমাদের আস্থা বেশি থাকে। যেমন ঘোড়ার খুরের শব্দ পেলে কেউ যদি বলে ঘোড়া আসছে এবং অন্য কেউ যদি বলে আফ্রিকা থেকে কিছু জেব্রা আমদানী করা হয়েছিলো, সেগুলো খাঁচা থেকে পালিয়েছে, ওগুলোই

আসছে; আমাদের প্রবণতা হবে প্রথমটিকেই মেনে নেয়া। দ্বিতীয়টি যে হতে পারেনা এমন অবশ্য নয়, কিন্তু সেই সম্ভাবনা কম শুধু সারল্যের অভাবে। বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বে অনেক বেশি রকমের অজানা কল্পিত জিনিসকে যদি মেনে নিতে হয়, আর সে সময় একই ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য বিকল্প কোন তত্ত্বে যদি ওভাবে ধরে নেবার জিনিস কম হয়, ব্যাখ্যাটি তাই সরল হয়, তা হলে বিজ্ঞান শেষেরটিকেই সত্য তত্ত্ব বলে গ্রহণ করবে। তত্ত্বে যদি এমন সব ধ্রুবক সংখ্যার বেশি ঘনঘটা থাকে যেগুলো প্রকৃতি থেকে মাপজোক করে পাওয়া যায় আর সেখান থেকেই তত্ত্বে ঢোকানো হয়েছে, না ঢুকিয়ে তত্ত্বটি খাড়া করা যায়না বলে, সেক্ষেত্রেও অবশ্য তত্ত্বটির খুব একটি কার্যকারিতা থাকেনা, জানা জিনিস দিয়ে তত্ত্বকে ভারী করার কারণে। অজানা জিনিসের ভবিষ্যৎদ্বাণী করাই তো তত্ত্বের কাজ, সে নিজে জানা জিনিসে ঠাসা না হয়ে যত হালকা হবে তত ভাল। মধ্যযুগের একজন ইংরেজ দার্শনিক ওক্‌কাম প্রথম এই সারল্যের প্রয়োজনীয়তাটি নীতি হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন– এজন্য একে 'ওক্‌কামের ছুরি' বলা হয়। ছুরি বলার কারণ হলো ওক্‌কামের ভাষায় 'যা এক কথায় বলা যাবে, তার জন্য দুই কথা ব্যবহার করোনা'। এভাবে বাহুল্য কথা বা ইনিয়ে বিনিয়ে দেয়া ব্যাখ্যা ছেঁটে ফেলাটাই কাম্য বলে নীতিটিকে ওক্‌কামের ছুরি বলা।

এই নীতিটিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বরাবর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যদিও এর পেছনে যুক্তির থেকে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এবং সরল ব্যাখ্যার প্রতি মানসিক প্রবণতাটিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছরে ধরে গাণিতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রীক বিশ্ব-ছবির একটিই শক্তিশালী বিকল্প তত্ত্ব যখন অবশেষে ১৫ শতকে কপারনিকাস দিলেন তখন বেশ কিছুদিন ধরে উভয় তত্ত্বই প্রচলিত ছিল। বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই প্রচলিত গ্রীক তত্ত্বের, যেটি তখন টলেমির তত্ত্ব রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারই অনুসারী ছিলেন। কিন্তু কপারনিকাসের তত্ত্বের সমর্থকের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিলো। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে দুটি তত্ত্বই ব্যবহারে থাকার কারণ হলো বাস্তব ফলাফলের দিক থেকে উভয়টির মধ্যে বড় কোন পার্থক্য ছিলনা। সত্যিকার জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণে ও মাপজোকে যা ছিল উভয় তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গেই তা মিলে যেতো। অথচ দুটি তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য অনেক– টলেমির তত্ত্বে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে স্থির রয়েছে, চাঁদ, সূর্য, গ্রহগুলো তাকে ঘিরে ঘুরছে। সেই ঘোরার মধ্যে অবশ্য গ্রহের নিজের কক্ষের এক এক বিন্দুকে কেন্দ্র করে চক্কর খেয়ে খেয়ে ঘোরার ব্যাপার আছে যাকে

বলা হয় এপি-সাইকেল, পৃথিবীও ঠিক কেন্দ্রে না থেকে একটু সরে থাকে, তা ছাড়া আরো কিছু জটিলতা আছে যে সব ছাড়া পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ওভাবে মেলানো সম্ভব হতোনা। অন্যদিকে কপারনিকাসের তত্ত্বে সূর্য বিশ্বের কেন্দ্রে, পৃথিবী নিজে একটি গ্রহ, অন্য গ্রহগুলোর মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এখানে বহু দূরে কক্ষ দিয়ে সূর্য ও গ্রহগুলোকে অসম্ভব বেগে দৈনিক ঘোরার ব্যাপারটাও নাই, শুধু পৃথিবীর নিজেই নিজের অক্ষের ওপর ঘুরলেই হয়। সূর্যের চারিদিকে আবর্তনটিও পৃথিবী সহ সব গ্রহের জন্য সোজা-সাপটা ব্যাপার যদিও এখনো পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলাতে কপারনিকাসকে গ্রহগুলোর জন্য কিছু এপি-সাইকেলের ধারণা রেখে দিতে হয়েছে, তবুও টলেমির বিশ্ব ছবির তুলনায় তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব অল্প। বিজ্ঞানীরা ক্রমেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে কপারনিকাসের তত্ত্বটিই সঠিক। এর বড় কারণটি ছিল এটি তুলনামূলক ভাবে অনেক সরল– অনেক এপি-সাইকেল ও টলেমির বিশ্বছবির অন্য জটিলতাগুলো না থাকার ফলে।

পর্যবেক্ষণে বিশেষ বিশেষ অদ্ভুত ঘটনা যেমন কোন কোন গ্রহের অনিয়মিত চলাচল, বছরের এক এক সময়ে এক এক গতিবেগ, শুক্র গ্রহের মত গ্রহের চন্দ্র কলার মত হ্রাস-বৃদ্ধি কলা ইত্যাদি প্রায় সবই উভয় বিশ্ব-ছবি দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেছে। কিন্তু টলেমির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগুলোকে হতে হয় বেশি জটিল ও ঘোরপেঁচের, তুলনামূলক ভাবে কপারনিকাসের তত্ত্বের একই ব্যাখ্যা অনেক সরল। এই সরল হওয়াটাই কপারনিকাসের তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে, যে কারণে পরিবর্তিত রূপে ওটিই এখনো টিকে আছে। ওপরের ওই ঘটনাগুলো টলেমির তত্ত্বে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেন যখন সেই সমস্যাটি এসেছে সেটির জন্য তত্ত্বে বিশেষ এপি-সাইকেল ইত্যাদির সৃষ্টি করা হয়েছে– এভাবে এপি-সাইকেল ইত্যাদির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বাইরের পর্যবেক্ষণ থেকে তথ্য এনে তত্ত্বকে সামাল দেয়া হয়েছে, তত্ত্বের মধ্যে ধরে নেবার কথাও ক্রমে বেড়েছে। এগুলো বিজ্ঞানীর পছন্দ নয়। ওক্‌কামের ছুরির যে সারল্য নীতি তার বিরোধী। অন্যদিকে কপারনিকাসের মূল সরল তত্ত্বটি দিয়েই ওই সবকিছুর সোজা-সাপটা ব্যাখ্যা দেয়া গেছে। এজন্যই এটি সঠিক, এটি আধুনিক, এটি বৈপ্লবিক। সারল্য এবং এক চাবি দিয়ে শত দরজা খোলাটি তার বৈশিষ্ট। প্রথম প্রথম ওই সারল্যটাই ছিল কপারনিকাসের তত্ত্বকে অগ্রাধিকার দেবার বড় কারণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে

কপারনিকাসের প্রদর্শিত পথের বিশ্বছবিটিই সব দিক থেকেই সঠিক ছবি, টলেমির বিশ্বছবি সঠিক নয়, সবকিছুর ব্যাখ্যা এতে নেই।

তত্ত্বে সারল্যের অভাবকে বিজ্ঞানীরা ক্ষমা করেন না– সেটি যদি নিউটনের তত্ত্বও হয়, তাও নয়। পদার্থবিদ্যায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানে নিউটন যা দিয়েছেন আধুনিক যুগের শুরু থেকে সেটিই তো বিজ্ঞানের চাবি-কাঠি। অথচ এরকম মহা প্রভাবশালী নিউটনের আলোকের স্বরূপ নিয়ে তত্ত্বটি দু'শ বছর আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছিলো এই সারল্যের অভাবে। তাঁর তত্ত্বে আলোকে এক রকম কণার সমষ্টি হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিলো, সেটি ছিলো আলোর কণা তত্ত্ব। প্রায় একই সময় হল্যাণ্ডের হাইগেন্স ও অন্যরা বিকল্প তত্ত্বে বলেছেন যে আলো এক প্রকারের তরঙ্গ, সেটি হলো আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব। আলোর সাধারণ যে সব আচরণ– এর সরল রেখায় চলা, কোন তল থেকে এর প্রতিফলনের নিয়ম, এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় এর বেঁকে যাওয়ার প্রতিসরণের নিয়ম ইত্যাদি কণা তত্ত্ব ও তরঙ্গ তত্ত্ব উভয়টিতে প্রায় সমান স্বচ্ছন্দভাবে ব্যাখ্যা করা গিয়েছিলো। কিন্তু সরু ফাটল বা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, বা কোন কিনারা ঘেঁষে যাওয়ার সময় আলো যে ভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেই ডিফ্র্যাকশন বা অপবর্তনের প্রশ্ন ওঠে সেটি তরঙ্গ তত্ত্বে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাখ্যা করা গেলেও কণা তত্ত্বে যায়না। এতে বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে এক এক দিকে যায়, তার প্রত্যেকটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ঝালরের মত আলো-আঁধার রেখা পর পর থাকে। একই কারণে দুটি সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে একই আলোকে নিয়ে গেলেও এরকম আলো আঁধারের ঝালরের সৃষ্টি হয় যাকে বলা হয় ইন্টারফেরেন্স। এসবের সরল ব্যাখ্যা তরঙ্গ তত্ত্বে থাকলেও নিউটনকে তাঁর কণা তত্ত্বে একে ব্যাখ্যা করতে খুবই কষ্ট-কল্পিত উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। তাঁকে কল্পনা করতে হয়েছে আলোর ওই কণাকে নিয়ন্ত্রণকারী এক ধরনের তরঙ্গ গুণ- ডিফ্র্যাকশান ও ইন্টারফেরেন্সের পেছনে ওই তরঙ্গের একটি ভূমিকা তাঁকে বেশ জটিলভাবে দেখাতে হয়েছে। এত ঘোরানো-পেঁচানো পথে তরঙ্গকে যখন আনতেই হচ্ছে তাহলে কণার ব্যাপারটি রাখাই বা কেন? কাজেই নিউটনের তত্ত্ব হলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু কণাতত্ত্বটি বাতিল হয়েছে ওই সারল্যের অভাবে। এগুলো বড় বড় ঐতিহাসিক তত্ত্বের মধ্যে বেছে নেবার ঘটনা। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় প্রতি নিয়ত যে সব তত্ত্ব প্রস্তাব করা হচ্ছে, হয়তো প্রকাশিতও হচ্ছে, কিন্তু শিগ্‌গির বাতিল হয়ে যাচ্ছে ওই সারল্য না থাকার কারণেই।

বিজ্ঞানে কিন্তু সরল সাধারণত সুন্দরও হয়। কাজেই সারল্যের নীতিটি অনেকটা সৌন্দর্যের নীতি হিসেবেও আসবে এটিই আশা করা হয়। অল্প কথার, কম কল্পিত উপাদান থেকে যখন খুব সুন্দর ভাবে একটি বড় বিষয়ের ব্যাখ্যা সফল হয় তখন বিজ্ঞানীর কাছে এর ওপর আগাম আস্থার সঞ্চার হয়। যেমন অল্প কয়েকটা টেকটোনিক প্লেইটে পুরো ভূত্বকটি বিভক্ত হয়ে আছে আর সেগুলো চট্‌চটে তরলের ওপর ভেসে এদিক ওদিক যাচ্ছে এই সরল কল্পনা থেকে এখন বলতে গেলে প্রাকৃতিক ভূগোলের যাবতীয় বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণীও করা যাচ্ছে। ভূগোলের অনিশ্চিত জটিল ঘটনাবলীর বিপুল বৈচিত্রকে ধারণ করার পেছনে এরকম সরল একটি ধারণা কাজ করার মধ্যে একটি ধারণাগত সৌন্দর্য রয়েছে বৈকি। টেকটোনিক থিওরি এত সফল হওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ। বিজ্ঞানের এই সৌন্দর্য-প্রীতিটি সব থেকে চমৎকার ভাবে আসে এতে গণিতের ব্যবহারে। গণিত জিনিসটি সৃষ্টিই হয়েছে তার সুন্দর বিমূর্ত সৌকর্যের মায়ায়। গণিতের মধ্যে যে প্রতিসাম্য, যে সরলীকরণের ক্ষমতা, আবার অন্যদিকে আমাদের সাধারণ বোধশক্তিকে অতিক্রম করে অসীমের দিকে যাবার সুযোগ তা গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ককে খুবই উদ্দীপ্ত করে। তাঁদের অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস– যে তত্ত্ব বেশি সুন্দর গণিতের বিষয় সেটিই প্রকৃতির নিকটতর সত্যটি প্রকাশ করছে। বিশেষ করে একেবারে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় এই ব্যাপারটি প্রায়ই গুরুত্ব পেয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩০ এর দশকে বৃটিশ পদার্থবিদ পল ডিরাকের একটি আবিষ্কার দেখা যাক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সময়টি ছিল পদার্থবিদ্যার বৈপ্লবিক যুগ। কোয়ান্টাম তত্ত্ব তখন প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করে ইলেকট্রনের মত কণিকা এবং অণু পরমাণুর জগতকে তার আওতায় আনছিলো। আর খুবই দ্রুতগামী এবং খুবই ভারী বিষয়গুলোর সুরাহা করতে এসেছিলো আপেক্ষিক তত্ত্ব। উভয়ে একেবারে অভিনব। ডিরাক ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক আচরণের এমন একটি সমীকরণ আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলেন যা আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রাখবে– কারণ যেই গতিতে ইলেকট্রন চলাচল করে তাতে ওই আপেক্ষিকতা অনিবার্যভাবে এসে পড়ার কথা। যেই সমীকরণটি তিনি আবিষ্কার করলেন তার গাণিতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়, কিন্তু তাতে একটি অসুবিধা হলো তার চারটি সমাধানের মধ্যে শুধু দুটির তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ দাঁড়ালো, খুব সফল ভাবে ওই দুটা ইতোমধ্যে বুঝতে পারা ইলেকট্রনের আচরণ বিশেষ

করে তার স্পিন বা ঘূর্ণনের আচরণকে ব্যাখ্যা করতে পারলো। কিন্তু বাকি দুটি দিলো ঋণাত্মক শক্তির মতো এক আজগুবি অসম্ভব সমাধান। সাধারণত এরকম অসম্ভব সমাধানকে বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিবেচনা থেকে বাদ দেন, নইলে সমীকরণটিকেই সন্দেহ করেন। ডিরাক কিন্তু অন্য রকম বিকল্প সমীকরণও দাঁড় করাতে পারছিলেন যাতে ওই রকম অর্থহীন সমাধানের ঝামেলা আসেনা, কিন্তু ওইগুলো আগেরটির মতো এতো সুন্দর সমীকরণ নয়। ডিরাক গোঁ ধরলেন তিনি তাঁর সুন্দর সমীকরণটি ছাড়বেননা, ওটি এতোই সুন্দর যে ওর মধ্য দিয়ে প্রকৃতি যেন কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, তিনি সেটিই বোঝার চেষ্টা করবেন।

তিনি সেই ঋণাত্মক শক্তির সমাধানগুলোর জন্যও একটি অদ্ভুত নতুন অর্থ দাঁড় করালেন– তাত্ত্বিক কল্পনা ও গণিতের মাধ্যমে তিনি দেখালেন যে ওগুলো আসলে এক রকম অজানা কণিকার অস্থিত্বের ইশারা দিচ্ছে যে কণিকা ইলেকট্রনের ঠিক বিপরীত, ইলেকট্রনের মত একই ভরের হয়েও তার চার্জ ইলেকট্রনের বিপরীত ও সমান– অর্থাৎ সমান ধনাত্মক চার্জ। একে তিনি বল্‌লেন এন্টি-ইলেকট্রন, পরে যার নাম হয়েছে পজিট্রন। যার কোন সাক্ষাত কোনদিন পাওয়া যায়নি, কল্পনায়ও যাকে প্রয়োজন হয়নি এমনি একটি কণিকার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে ডিরাক দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন; এটি তিনি দিলেন প্রধানত ওই গাণিতিক সৌন্দর্যের ওপর তাঁর দৃঢ় আস্থা থেকে। এই আস্থা চাঞ্চল্যকরভাবে যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী যে রকম কণিকার কথা বলেছে হুবহু ঠিক সেই রকম নতুন একটি কণিকা– এন্টি-ইলেকট্রন বা পজিট্রন কণিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু এই এন্টি-ইলেকট্রন নয় ডিরাকের তত্ত্ব ধরেই এন্টি-প্রোটন, এন্টি-নিউট্রন ইত্যাদি বিভিন্ন কণিকার জন্য প্রতি-কণিকার ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাস্তবে সেই প্রতি-কণিকা পাওয়া গিয়েছে। যদিও প্রকৃতিতে এখন প্রতি-কণিকা নেই, কিন্তু ল্যাবোরেটরিতে প্রতি-কণিকা সৃষ্টি করা যাচ্ছে, আর তাদের গঠিত প্রতি-এটম, প্রতি-বস্তু সবই। কণিকার সঙ্গে প্রতি-কণিকার মিলনে অবশ্য উভয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়– এ কারণেই প্রতি-কণিকা প্রকৃতিতে নেই।

মৌলিক কণিকাবিদ্যার সামগ্রিক তত্ত্বের মধ্যেও আমরা এই গাণিতিক সৌন্দর্যের জয়জয়কারটি লক্ষ্য করি। একে এতোটাই আস্থার সঙ্গে দেখা হয়েছে যে এর মূলে একটি কণিকা হিগ্‌স বোসন দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃত থাকলেও এই

তত্ত্বটিতে বিজ্ঞানীরা কখনো কোন সন্দেহ পোষণ করেননি। এই হিগ্‌স বোসন আবিষ্কার ঘটনাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতির চার রকমের বল বিজ্ঞানের সবকিছুর মূলে– মাধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ-চৌম্বক, নিউক্লিয়ার স্ট্রং (সবল) এবং নিউক্লিয়ার উইক (দুর্বল)। প্রত্যেকটি বলের বাহক হলো এক এক রকমের বোসন কণিকা- যেমন বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের বাহক হলো ফোটন যা কিনা আলোর কণিকা ও একটি বোসন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক (কর্মকাল ১৯২৪-১৯৪৫) সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব অনুসরণ করে বলে তাঁর নামে এই রকম কণিকাগুলোকে বোসন বলা হয়। ইলেকট্রন, প্রোটন, ইত্যাদি অন্য কণিকাগুলো বস্তু-কণিকা সেগুলো এনরিকো ফার্মির সংখ্যাতত্ত্ব অনুসরণ করে বলে তাদেরকে ফার্মিয়ন বলা হয়। ১৯৬০ এর দশকে নিউক্লিয়ার উইক বল নিয়ে কাজ করার সময় একটি উভয়-সংকট দেখা যাচ্ছিলো। এক দিকে মনে হচ্ছিলো উইক বলের বাহক বোসন কণিকাকে ভরহীন হতে হবে, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বলের বাহক বোসন ফোটন যেমন ভরহীন। বলের ভরহীন বোসনের জগতে উইক বলের বোসন ভরহীন না হলে পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত জরুরী সিমেট্রি বা প্রতিসাম্য ভঙ্গ হবার ঝুঁকি নিতে হয়।

সিমেট্রি মানে এক একটি বিশেষ পরিবর্তন এনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলো একই থাকা– ওই ব্যাপারটি আমরা আগেই দেখেছি। প্রত্যেকটি সিমেট্রি প্রকৃতির একটি অপরিহার্য সৌন্দর্যও বটে, এটি ভঙ্গ হওয়াকে পদার্থবিদগণ আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত অঘটন মনে করেন। অথচ অন্যদিকে উইক বলের আচরণে মনে হচ্ছিলো যে এর বাহক বোসনের যথেষ্ট ভর থাকা উচিত। বিশেষ করে এটমের নিউক্লিয়াসের ভেতরে দুটি কণিকা খুবই কাছাকাছি থাকা অবস্থায় উইক বল যে যথেষ্ট শক্তিশালী থাকে তাতেই সেটি মনে হয়। তারপরও একে নিউক্লিয়ার উইক বল বলা হয় নিউক্লিয়ার স্ট্রং বলের তুলনায় এটি দুর্বল হবার কারণে। ওই ষাটের দশকে পীটার হিগ্‌স এই উভয়-সংকটের নিরসণ করলেন তাঁর তত্ত্বে একটি খুব ভারী বোসনের কল্পনা করে– অতীতের পরিস্থিতিতে যা সিমেট্রিতে ছিল ভর থাকা সত্ত্বেও। মহাবিশ্বের জন্ম-মুহূর্তে একটি সুন্দর সিমেট্রিতে এই বোসন এর সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। এটিই হিগ্‌স বোসন। হিগ্‌সের তত্ত্ব বললো ওসময় অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি সময়ের জন্য তাৎক্ষণিক ভাবে সিমেট্রি ভঙ্গ হয়ে ওই হিগ্‌স বোসনের মাধ্যমে নানান কণিকা নানান পরিমাণে ভর লাভ করেছিলো; তারপরেই সিমেট্রিটি আবার পুনস্থাপিত

হয়ে গিয়েচিলো। কী ভাবে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিলো তার সব হিসেব-নিকেষ হিগ্‌সের তত্ত্বে ছিলো, কোন্ কণিকা কেন কত ভর পেলো তাও। হিগ্‌স বোসন না থাকলে এই সব কণিকা ভরহীন আলোর কণিকা ফোটনের মত বিশ্বময় শুধু আলোর গতিতে ছুটে বেড়াতো।

এরপর আবদুস সালাম, ভাইনবার্গ, ও গ্ল্যাশো এই তিন বিজ্ঞানী নিজেদের যার যার তত্ত্বে দেখালেন মহাবিশ্বের জন্মের পর পর বিদ্যু-চৌম্বক ও উইক বল একীভূত অবস্থায় একটি সিমেট্রিতে ছিলো (ইলেকট্রো-উইক)। ওই তাৎক্ষণিক সিমেট্রি ভঙ্গের প্রক্রিয়ায় হিগ্‌স বোসনের সাহায্যে এসময় আলাদা হয়ে উইক বলের বাহক W বোসন ও Z বোসন তাদের নিজ নিজ ভর লাভ করেছে। পাকিস্তানী বিজ্ঞানী আবদুস সালামও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানী সবার শিক্ষক স্থানীয় ছিলেন তাঁর পুরো বিজ্ঞানী জীবনে। ওই তাত্ত্বিক আবিষ্কারের পর সুইজারল্যান্ডের জেনেভার কণিকা-ত্বরক যন্ত্রে সত্যি সত্যি ওই W বোসন ও Z বোসন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এসব হিগ্‌সের তত্ত্বের সঙ্গে চমৎকার সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরকম আরো নানা দিক থেকে হিগ্‌সের তত্ত্ব কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুরো কণিকা বিদ্যাকে একেবারে সুশৃঙ্খল সামগ্রিকতায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো। তার বড় ভিত্তি ছিল তার গাণিতিক সৌন্দর্য– তার বিশেষ রকমের সব সিমেট্রি।

অথচ এদিকে তার যে একটি বড় অংশ সেই হিগ্‌স বোসনের কোন খবর বাস্তবে নেই, সেটি তখনো উদ্ঘাটিত হয়নি। বাস্তবে প্রমাণিত না হয়েই যেভাবে স্ট্যান্ডার্ড মডেলটি বিজ্ঞানীদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো– সেটি বিরল ঘটনা। হিগ্‌স বোসনকে খুঁজে পেতে হলে তো মহাবিশ্বের জন্ম-মুহূর্তের সেই অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন পরিস্থিতিকেই আমাদের ল্যাবোরেটরিতে সৃষ্টি করতে হবে। এটি অকল্পনীয় কঠিন কাজ, কিন্তু ঠিক তাই করা হয়েছে জেনেভার সেই ল্যাবের নতুন যন্ত্র লার্জ হ্যাড্রোন কলাইডারে (এল এইচ সি)। সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের বেশ কিছু এলাকা জুড়ে মাটির গর্তে বৃত্তাকার এই যন্ত্র। এতে বায়ুশূন্য নলের ভেতর প্রোটন কণিকাকে (প্রোটন তুলনামূলক ভাবে একটি ভারী কণিকা তাই লার্জ হ্যাড্রোন পর্যায়ভুক্ত) বিপরীত দিক থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা অসংখ্যবার ঘুরিয়ে এমন গতিতে ও শক্তিতে নিয়ে যাওয়া হয় যে তাতে সেই জন্ম-মুহূর্তের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ২০১২ সালে অবশেষে ওই যন্ত্রে ওই শক্তিতে প্রোটন কণিকা চূর্ণ করে তার জায়গায় নানা অস্থায়ী কণিকা সৃষ্টির মধ্যে হিগ্‌স বোসনের

সন্ধান পাওয়া গেছে, তাত্ত্বিক আবিষ্কারের ৪০ বছর পর। এতদিন যা শুধু গাণিতিক সৌকর্যে তাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবার সেই স্ট্যান্ডার্ড মডেল পূর্ণাঙ্গ ভাবে হতে পারলো। সুন্দর তত্ত্ব বাস্তবতার অপেক্ষাও করেনা অনেক সময়। এভাবে প্রকৃতির যা একেবারে মৌলিক উপাদান সেই পরম কণিকাগুলো নিশ্চিত হয়ে গেলো- যা কিনা পুরো বিজ্ঞান মহাকাব্যের পুরো গল্পের ভিতটি রচনা করে দিয়েছে।

সর্বত্রগামী তত্ত্বের জয়

**পৃথক ঘটনায় একই কাজঃ**

ভাল বিজ্ঞান-তত্ত্বের পরিচয় তার পদচারণার ব্যাপ্তিতে। যত বিচিত্র বিষয়ের দিকে যত দূরে দূরে গিয়ে এটি তার ব্যাখ্যার কাজগুলো করতে পারে ততই তার কৃতিত্ব। হয়তো শুরুতে সীমিত সমস্যার দিকে খেয়াল রেখেই তত্ত্বটি ভাবা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তত্ত্বের যে উপাদান খাড়া হয়েছে সেগুলো সেই মূল সমস্যার অনেক বাইরের সমস্যার সমাধানে কার্যকর হতে পারে। যদি তা হয় তখনই আমরা বলবো সে তত্ত্ব সর্বত্রগামী এবং এক চাবিতে অনেক দরজা খুলতে পারছে। আমরা দেখেছি কী করে বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হিসেবে বহুদিন থাকার পর পরস্পর যুক্ত হয়ে একই বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ওই যুক্ত বিষয়ের তত্ত্ব এখন যথেষ্ট ছিমছাম হয়েও আগের তুলনায় অনেক বড় এলাকা জুড়ে কাজ করতে পেরেছে। যেমন বিদ্যুতের তত্ত্ব ও চুম্বকের তত্ত্ব একত্রে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। বিদ্যুতের গতির ফলে চুম্বকের, এবং চুম্বকের নড়াচড়ার ফলে বিদ্যুতের সৃষ্টি হওয়াটি বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাদের অস্থিত্ব ও কাজ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ অথবা চৌম্বক ক্ষেত্রের কম্পনে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। ওখান থেকে আরো দেখা গেছে যে আলোর তরঙ্গ আসলে এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। তার মানে ওই তত্ত্বের প্রয়োগ আলোর ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে, আলোক তরঙ্গের আরো সূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে গেলে এর বিদ্যুৎ-চৌম্বক গুণাগুণের দিকেই লক্ষ্য করতে হয়।

তাছাড়া আমাদের পরিচিত চোখে দেখা আলোর বাইরে আরো বহু রকম বিকিরণও আসলে এই অর্থে আলোর পর্যায়েই পড়ে– এক্সরে, আলট্রা-ভায়োলেট, ইন্‌ফ্রারেড, রেডিও ইত্যাদি সব তরঙ্গও ওই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গই।

কাজেই এই যে বিদ্যুৎ চার্জ, চৌম্বক মেরু, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এই সব নিয়ে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব তার কার্যকারিতার প্রসার ক্রমাগত বেড়ে আজ এটি পদার্থবিদ্যার একটি বিরাট অংশে কাজ করছে– যেটি কিছুটা ব্যবহারিক পর্যায়ে গিয়ে ইলেকট্রনিক্স, অপট্রোনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদিরও মূল তত্ত্ব হিসেবে কাজ করছে। এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করার মত। ইলেকট্রন, তার প্রবাহ, চার্জ, ক্ষেত্র, তরঙ্গ সবই প্রথমে কল্পনা থেকে এসেছে, এর কোনটাই কখনো দেখা যাবার মত জিনিস নয়। কিন্তু বহু রকমের পৃথক ঘটনায় এদের প্রত্যেকটিকে এমন ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে সর্বত্র হুবহু একই জিনিস হিসেবে– সেটি বৈদ্যুতিক কাজকর্মে, রেডিও সিগন্যাল প্রেরণ বা গ্রহণে, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কৌশলে, আলোতে পরিণত করে অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত টেলি-যোগাযোগের অপট্রোনিক্সে, কম্পিউটার লজিক সার্কিটে ইত্যাদি বিচিত্র জায়গায়। এ যেন একই বা কয়েকটি হাতিয়ারকে আমরা নানা ভাবে নানা কাজে নিশ্চিন্ত ভাবে ব্যবহার করছি কারণ এই হাতিয়ার এসবের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলেই জানা রয়েছে। ধরা যাক এখন আমাদের চোখ বাঁধা রয়েছে বলে ওই হাতিয়ারকে আমরা যদি দেখতে নাও পাই, তবুও নানা ক্ষেত্রে এটি যে তার কাজ সফল ভাবে করছে সেটি যদি বোঝা যায় তাহলে হাতিয়ারটির অস্থিত্ব অস্বীকার করি কী যুক্তিতে? কাজেই তত্ত্বে ব্যবহৃত যে অদৃশ্য জিনিসগুলো এখানে কার্যকর হচ্ছে ওসবকেও অস্বীকার কী ভাবে করি? একই ভাবে কী ভাবে বলি যে ওই ইলেকট্রন, প্রবাহ, চার্জ, ক্ষেত্র, তরঙ্গ ওসবের অস্থিত্ব নেই, এগুলো কল্পনা মাত্র? এভাবে তত্ত্ব সর্বত্রগামী হওয়াটাই তত্ত্বের মধ্যে থাকা সব জিনিসের ওপর উচ্চ আস্থা রাখতে আমাদেরকে বাধ্য করে।

বিজ্ঞানের জগতে একটি বিষয় আরেকটি বিষয়কে অনুসরণ করতে করতে তার অনেক কিছু নিজের মধ্যে আত্মীকৃত করে। অন্য বিষয়টির তত্ত্বগুলো এবং তাতে থাকা কল্পিত জিনিসগুলো নতুন বিষয়ে এসেও একই ভাবে কাজ করে বলে তা সম্ভব হয়। এটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও করা হচ্ছে। জীববিদ্যার চর্চাটি যখন থেকে অনেক বেশি বিশ্লেষণাত্মক হয়ে ওঠেছে তখন জীবের দেহের সব বস্তুকে ও তার গুণাগুণকে আধুনিক কেমিস্ট্রির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা আরম্ভ হয়েছে- ওভাবে বায়োকেমিস্ট্রি বা জৈব রসায়ন কাজ করতে পেরেছে। জীববিদ্যার কারণে কেমিস্ট্রির সম্প্রসারণ ঘটেছে, জীববিদ্যার চর্চা রাসায়নিক ল্যাবোরেটরিতেও চলে এসেছে। তাদের তত্ত্বগুলো সর্বত্রগামী হবার

কারণেই সেটি সম্ভব হয়েছে। অথচ কেমিস্ট্রি ও জীববিদ্যার এলাকা ও ঐতিহ্য গোড়াতে খুবই আলাদা ছিল। কিন্তু পরে কেমিস্ট্রির অণু-পরমাণুর বিজ্ঞানটি জীবদেহের শারীরবৃত্ত, কোষের কার্যাবলী ইত্যাদি নানা ধরনের ব্যাখ্যায় চমৎকার ভাবে কাজ করে গেছে। দেখা গেছে দেহের মধ্যে সংগঠিত অসংখ্য কার্যক্রম বিশেষ রাসায়নিক অণুর বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়। জীবের বংশগতির প্রক্রিয়া আবিষ্কার যখন শেষ পর্যন্ত ডিএনএ নামক অণুর নানা অংশের দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেল তাতে ডিএনএ'র রসায়ন একটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। এখানে অণুর পর্যায়ের কাজ এতই গুরুত্ব পেয়েছে যে পুরো বিষয়টিকেই অণু-জীববিদ্যা হিসেবে। অথচ এই অণু, যে সব এটমে ওগুলো গঠিত হয়েছে তার সবই পদার্থবিদ্যা ও কেমিস্ট্রির তত্ত্বে কল্পিত হয়েছে। আণবিক পর্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়াও তাই। এগুলো এখন জীবজগতের অত্যন্ত ব্যাপক ও ভিন্ন ক্ষেত্রে একই ভাবে চমৎকার কাজ করছে।

শত দরজা খোলার এমনি চাবি এখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেই পাওয়া যায়, এক শাখার চাবি সে অন্য শাখার দরজা খুলতেও কাজে লাগে তাও দেখলাম। তার ভেতরে কোন কোন চাবিকে আবার আমরা যাকে বলি 'মাস্টার কী' বা মূল চাবি সেই হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যেমন হোটেলের কর্তৃপক্ষ একটি মাস্টার কী দিয়ে সব সব কামরা খুলতে পারে এও অনেকটা সেরকম। অণু-পরমাণু সাইজের জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হলে আধুনিক পদার্থবিদ্যার বৈপ্লবিক তত্ত্ব কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের কৌশলগুলোই আজ বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে সেখানকার সমাধানগুলো বের করে আনছে। এটমের বড় অংশে যেখানে ইলেকট্রনের রাজ্য সেখানকার ঘটনাকে যেমন এটি ব্যাখ্যা করছে, আবার মাঝের ছোট অংশে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যত ঘটনা তাও। এই বিষয়গুলোই আবার খুঁজে পাওয়া যায় মহাবিশ্বের সর্বত্র সেখানকার ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করতেও। বিগ ব্যাং মুহূর্তে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবার পর পর যা ঘটছিলো তাতেও এসবের তত্ত্বগুলোই কাজ করে কণিকাবিদ্যা, এটমিক বিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান, মহাজাগতিক বিজ্ঞান সর্বত্রই তাই একই সব তত্ত্ব, এবং সেগুলোর পেছনে থাকা কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূলনীতিগুলোও সর্বত্র সুন্দর ভাবে কার্যকর। অথচ এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রথম গড়ে ওঠেছিলো উত্তপ্ত বদ্ধ গর্ত থেকে বিকিরণ, ধাতুর তলে আলো ফেল্‌লে উৎক্ষিপ্ত ফটো-ইলেকট্রন, এটম থেকে নিঃসারিত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করতে। সেটিই এখন এমন মাস্টার কী'তে পরিণত হয়েছে

যে তাকে ব্যবহার করে নতুন ধরনের কম্পিউটারের মত প্রযুক্তিরও সৃষ্টি করা গিয়েছে।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব পুরো জীবজগতের নতুন নতুন প্রজাতিতে পরিণত করে তাই ব্যাখ্যা করেছে। এতে শারীরিক ও আচরণগত ভাবে একটি প্রজাতি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে ক্রমাগত এর প্রয়োগের এলাকা বড় হয়েছে। এখন মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় ভূমিকা রাখছে– বলতে গেলে সর্বাধুনিক মনোবিদ্যায় বিবর্তনমূলক মনোবিদ্যা এবং মস্তিষ্কবিদ্যা নির্ভর মনোবিদ্যার অগ্রগতিটিই সব থেকে বেশি লক্ষ্যণীয়। ব্যাপক প্রাণীজগত থেকে শুরু করে মানুষের নানা মানসিক বৈশিষ্ট ব্যাখ্যার বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার; ভয়, উদ্বেগ, সুখ-দুঃখ, ইত্যাদি নানা ধরনের আবেগ ইত্যাদির ব্যাখ্যায়ও এখন অনেকটাই বিবর্তন-মূলক মনোবিদ্যাই অধিকতর সফল হচ্ছে। সেই মূল প্রাকৃতিক নির্বাচন যেন জীববিদ্যায় এবং মনোবিদ্যায় একটি মাস্টার কী'র মত কাজ করছে শত দরজা খোলার জন্য। এমনিভাবে বিজ্ঞান মহাকাব্যের সব কাহিনীর রহস্য উন্মোচনে আমরা একই গুরুত্বপূর্ণ অবাক- করা চাবির সাক্ষাৎ পাই।

**আইডিয়ার খনিঃ**

এই সবের মধ্যে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট। তা হলো কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি নতুন নতুন পথে এগোবার বদলে কানাগলিতে আটকে যায় তা হলে বিজ্ঞানের কাছে তার মূল্য কম। যেই সীমিত সমস্যার সমাধান করতে তত্ত্বটি প্রথম আবিষ্কার হয়েছিলো সেটি যদি সেখানেই থেমে যায় তখন সেটি কানাগলিতে আটকে যাবার মতই হয়। ভাল তত্ত্বকে হতে হয় আইডিয়ার একটি খনি। তখন একটি তত্ত্বের আবিষ্কার আর সাফল্য তার মধ্যে অনেক রকমের নতুন আইডিয়ার জন্ম দেবার সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে মূল তত্ত্ব ওই প্রত্যেকটি নতুন আইডিয়ার সাহায্যে নতুন নতুন দিকে বিস্তৃত হবার সুযোগ পেয়ে যায়। ওপরের উল্লেখিত সবগুলো ক্ষেত্রে এবং এরকম আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে ভাল তত্ত্বগুলো এভাবেই নানা দিকে বিস্তৃত হতে পেরেছে। ভাল তত্ত্ব হবার জন্য এটিও একটি শর্ত।

এ অনেকটা উন্মুক্ত মন নিয়ে চিন্তাকে নানা দিকে প্রসারিত করার ফল। এমনটি করলেই নানা সম্ভাবনার কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে উদয় হতে থাকবে এবং

তার মধ্যে কোন কোনটি সৃষ্টিশীলতার বিশেষ রকমের নান্দনিক ছাঁচের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। পল ডিরাক যখন তাঁর ইলেকট্রন- সমীকরণের দুটি অর্থহীন সমাধান নিয়ে ভাবছিলেন তিনি তার সুযোগ করে দিয়েছেন। এটি অন্য রকমও হতে পারতো। তিনি যদি তাঁর কাম্য ফলাফল অর্থপূর্ণ দুটি সমাধানের মধ্যে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যেতেন, এবং বাকি সমাধান দুটিকে অর্থহীন গাণিতিক সৃষ্টি বলে তুচ্ছ করতেন, কিংবা সৌন্দর্যের কথা চিন্তা না করে তুলনামূলক ভাবে 'অসুন্দর' বিকল্প সমীকরণে চলে যেতেন তাহলে প্রতি-কণিকার ওই দুর্দান্ত আইডিয়ার কোন সুযোগ হতোনা। বল্‌তেই হবে যে তাঁর ইলেকট্রন সমীকরণের মধ্যে আইডিয়ার খনি হবার জাদুটি ছিল, যার ফলে সেটি কণিকাবিদ্যাকে এক লাফেই দ্বিগুণে প্রসারিত করতে পেরেছিলো কণিকা জগতের সঙ্গে একটি প্রতি-কণিকা জগত যোগ করে। তত্ত্ব কানাগলিতে আটকা পড়ার বদলে বরং নতুন এক তত্ত্ব-জগতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ডারউইইন প্রাকৃতিক নির্বাচনকে জীববিদ্যায় নতুন নতুন ঘটনা ঘটার ফল্গুধারা হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন– যার মূলে ছিল পরিবেশ-সংকটের সঙ্গে খাপ খেয়ে বেশি বাঁচা ও সে কারণে বেশি সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই মূল চিন্তা তাঁকে একই সঙ্গে নতুন চিন্তার দিকে ধাবিত করেছে। তিনি দেখলেন বাঁচার ক্ষেত্রে খুব সুবিধা না হলেও বেশি সন্তান দেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হতে পারে যদি প্রজনন প্রক্রিয়াটি অযৌন না হয়ে যৌন হয় এবং যৌন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর বিপরীত লিঙ্গের বিশেষ কারো কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে। এই আইডিয়াটি তাঁর মাথায় এলো প্রাণী জগতের দিকে লক্ষ্য করে। তিনি লক্ষ্য করলেন অনেক স্ত্রী-প্রাণী প্রজনন মৌসুমে পুরুষ প্রাণীগুলোর মধ্যে প্রাণপণ লড়াইয়ে যে জিতে আসে তার সঙ্গেই প্রজননে আগ্রহী হয়। ফলে বিজয়ী পুরুষদের বৈশিষ্টগুলোই পরবর্তী প্রজন্মে নির্বাচিত হয়। এদিকে বহু স্ত্রী-প্রাণীদের ওই আগ্রহের কারণে অল্প সময়ে তার অনেক সন্তান জন্ম হয় সবাই কমবেশি তার বৈশিষ্টগুলো নিয়ে। এতে সন্তান জন্ম বাড়লেও বাঁচার সম্ভাবনা না বেড়ে বরং কমেই যায়, পরবর্তী লড়াইয়ে আহত বা নিহত হবার সম্ভাবনার কারণে। এদিক থেকে এটি প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে আলাদা।

পুরুষ-প্রাণীর পরস্পর লড়াই না করেও অনেক সময় স্ত্রী-প্রাণীর প্রজনন-পক্ষপাতিত্ব লাভ করতে পারে। ডারউইন লক্ষ্য করলেন যে নিজের মস্তিষ্কে কোন মিউট্যাশনের ফলে স্ত্রী-প্রাণী পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট থাকাটি

পছন্দ করে এবং প্রজননে তাকেই বাছাই করে যেমন কোন প্রাণীতে বড় সাইজের পুরুষকে, কোন প্রাণীতে রঙচঙে পুরুষকে, কোন প্রাণীতে ঘাড়ে কেশর থাকা পুরুষকে ইত্যাদি। লড়াই ও পছন্দসই বৈশিষ্ট উভয়েই পুরুষদেরই থাকার বিষয়– স্ত্রীর কাজ হলো শুধু পছন্দ করা, তারা নিজেরা লড়াইও করেনা, আবার ওই বিশেষ বৈশিষ্টগুলোও লাভ করেনা। হয়তো সন্তান জন্ম দেয়াতে তাদেরকে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বলে পছন্দ করার কাজটি স্ত্রী-প্রাণীকেই করতে হয় যেন ত্যাগ স্বীকার বৃথা না যায়। পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে ওই যে বিশেষ বৈশিষ্ট দেখা দেয় তাও মিউট্যাশনেরই ফল, দৈবক্রমে আপনা থেকেই ইতস্তত সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্ত্রী-প্রাণীর প্রজনন-আনুকূল্য লাভ করার ফলে এই বৈশিষ্টগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম আরো বেশি সন্তানদের মধ্যে হয়, প্রকট হয়। এর মধ্যে রয়েছে পুরুষ প্রাণীর বড় আকারের হওয়া, রঙচঙে বা বাহারি সব বাড়তি শোভা পাওয়া। পাখিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বেশি দেখা যায়– বর্ণাঢ্য হওয়া, রঙীন পালক হওয়া, মাথায় সুন্দর ঝুঁটি হওয়া, লম্বা ও বাহারি লোজ হওয়া ইত্যাদি। ময়ূরীর তুলনায় বাহারি পেখম মেলা ময়ূর এর একটি সুন্দর উদাহরণ। শুধু দেহ-বৈশিষ্ট নয় স্বভাবের বৈশিষ্টেও লক্ষণীয়। পুরুষ পাখিদের অনেকে প্রজনন মৌসুমে স্ত্রীর পাখির কাছাকাছি থেকে গান গায়, ভোরে মোরগের ডাকার মত বিশেষ ধরণের শব্দ করে, বিশেষ ভঙ্গিতে উড়ে ও মাটিতে নেমে লাফিয়ে নাচে, রঙীন গলা বেলুনের মত ফোলায় ও চুপসে নেয়, এমনকি সুন্দর বাসা তৈরি করে। যার যার ক্ষেত্রে এগুলোর সবই স্ত্রী-পাখি প্রজননের সঙ্গী নির্বাচনে পছন্দ করে বলেই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ওই পুরুষ পাখিরই বেশি সন্তান হয়। ডারউইন একে বলেছিল যৌন-নির্বাচন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রূপ। এসব ক্ষেত্রে সন্তান জন্ম বাড়লেও আয়ু বাড়ার বদলে বরং কমারই সম্ভাবনা ওই সব বর্ণাঢ্যতা, লম্বা বাহারি লেজ, গাওয়া নাচা ইত্যাদি বরং শিকারিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে।

অপেক্ষাকৃত বেশি দেখা গেলেও যৌন নির্বাচন শুধু পাখিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় স্তন্যপায়ীদের পুরুষদের মধ্যে শিং, ঘাড়ের কেশর, বড় আকার, ইত্যাদির বাহারটিও এভাবে ক্রমে বাড়তে বাড়তে প্রকট হয়েছে বহু প্রজন্ম ধরে স্ত্রী প্রাণীদের নির্বাচনের ফলে। সরীসৃপ, ব্যাং, মাছ, পোকা, পতঙ্গ সব কিছুর মধ্যেই কমবেশি নানা রকম বৈশিষ্ট পুরুষদের একমাত্র একচেটিয়া হওয়াটিও ওই যৌন-নির্বাচনের ফলে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ে নতুন তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে যৌন-নির্বাচন তার অনেক মানবিক গুণ সৃষ্টির জন্য বিরাট

ভূমিকা রেখেছে। অবশ্য মানুষের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন উভয়মুখী হয়েছে অর্থাৎ সঙ্গী ও সঙ্গীনী উভয়েই পরস্পরের মধ্যে একই রকম আচরণগত বৈশিষ্ট নির্বাচিত করেছে। এসব বৈশিষ্টের মধ্যে নান্দনিকতা, সঙ্গীতপ্রীতি, ভাষার সৌকর্য-প্রীতি, রসবোধ ইত্যাদি বহু গুণাগুণ রয়েছে; মনে করা হয় যে যৌন নির্বাচনের ফলে না এলে এগুলো হয়তো মানুষের মধ্যে স্বভাবজাত হয়ে উঠতোনা। এই বিচিত্র ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নতুন ধরনের আইডিয়ার জন্ম দিতে পেরেছিলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল তত্ত্বটি। পরে সাধারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতই শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এই যৌন-নির্বাচন তত্ত্ব; ব্যাখ্যা করতে পেরেছে আরো অসংখ্য ঘটনা। মূল তত্ত্বটি এভাবে নিজেকে আইডিয়ার খনি হিসেবে প্রমাণ করেছে।

অনেক ভাল তত্ত্ব তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে এভাবে প্রতি পর্যায়ে আরো আইডিয়ার সৃষ্টি করার কারণে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি দেখা যাক। শক্তির গুচ্ছ বা শক্তির কোয়ান্টামের ধারণাটি সর্বপ্রথম বাধ্য হয়ে এনেছিলেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। তিনি একটানা শক্তি তরঙ্গকে শক্তির গুচ্ছ হিসেবে নিয়ে; এবং প্রতি গুচ্ছের শক্তিকে ফ্রিকোয়েন্সির সমানুপাতিক ধরে নিয়ে তখনকার মতো বদ্ধ গর্তের বিকিরণ সংক্রান্ত সে সমস্যাটি দেখা দিয়েছিলো তার এক রকমের সমাধান করেছিলেন। এটি অনেকটা সমস্যা সমাধানের গাণিতিক কৌশলের মতোই এসেছিলো, বাস্তবে একটি বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। কিন্তু আইনস্টাইন ধাতুর ওপর আলো ফেল্‌লে যে ইলেকট্রন নির্গত হয় আলোর তরঙ্গের তীব্রতার সঙ্গে তার শক্তির সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে প্ল্যাঙ্কের সেই গাণিতিক তত্ত্বটির শরণাপন্ন হলেন– তার মধ্যেই তিনি আইডিয়া পেলেন তরঙ্গ হয়েও আলোর কণিকার মত আচরণের। প্ল্যাঙ্কের কাছে যেটি ছিল শক্তিগুচ্ছ মাত্র আইনস্টাইনের নতুন আইডিয়াতে তা হয়ে পড়লো রীতিমত একটি কণিকা– আলোর কণিকা ফোটন। কোয়ান্টাম তত্ত্বটি এতে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো।

কিন্তু এটিই আবার জন্ম দিলো আরো অদ্ভুত আইডিয়ার। বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন তরঙ্গ যদি কণিকাও হতে পারে, তা হলে কণিকা কেন তরঙ্গ হতে পারবেনা? ভাবলেন বটে কিন্তু ব্যাপারটি এতই অভাবনীয় যে একে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। কারণ কণিকা মানে তো বস্তুরও কণিকা, অর্থাৎ তা বস্তু, সেটিকে ঢেউয়ের মত কল্পনা করা রীতিমত উদ্ভট। এটি তো হবে বস্তু-তরঙ্গ,

বস্তু আবার তরঙ্গ হয় কী ভাবে, কিসের তরঙ্গ? কিন্তু ফ্রান্সের একজন তরুণ পিএইচডি ছাত্র দ্য ব্রগলি ব্যাপারটিকে মোটেই উদ্ভট মনে করলেন না, বরং একে একটি খুব ভাল আইডিয়া মনে করলেন। তিনি তাঁর পিএইচডি থিসিস হিসেবে গাণিতিক ভাবে কণিকাকে তরঙ্গ হিসেবে দাঁড় করালেন। ওই কণিকা হিসেবে নিলেন আলোর কণিকা ফোটনকে– কারণ এ সংক্রান্ত নানা সমীকরণ ইতোমধ্যে পদার্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই ছিলো। এভাবে কয়েকটি জানা সমীকরণগুলো একটির সঙ্গে একটি মিশিয়ে তিনি ফোটনের ভরবেগের ভিত্তিতে তার একটি তরঙ্গদৈর্ঘের সম্পর্কও বের করে ফেল্‌লেন। ভরবেগ হলো কণিকা হিসেবে ফোটনের একটি পরিমাপ, কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ থাকতে হলে তাকে তরঙ্গও হতে হবে। এভাবে অন্তত আলোর কণিকা ফোটনের ক্ষেত্রে কণিকা তার তরঙ্গ-চরিত্র লাভ করলো। কিন্তু অন্যরা বল্‌লেন ফোটন তো আলোর কণিকা, এতো বস্তু নয়; কাজেই সেটিকে দ্য ব্রগলি গাণিতিক ভাবে তরঙ্গ রূপে দেখাতে পারলেও ওটি ওতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কোন বস্তু-কণিকাকে কখনো তরঙ্গ রূপে দেখা যাবেনা।

কিন্তু দ্য ব্রগলী তা মানলেননা। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কণিকার ভরবেগের নিরিখে যে তরঙ্গদৈর্ঘ তিনি দিয়েছেন তা যে কোন কণিকার ক্ষেত্রেই সত্য, সেটি ইলেকট্রনের মতো বস্তু-কণিকা হলেও। আইনস্টাইনের ফোটনসহ অন্য সব প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব তাঁর মাথায় যে আইডিয়া খুলে দিয়েছে সেটি এমনই বলে। এর ফয়সালা একমাত্র হতে পারে সত্যিকার পরীক্ষার মাধ্যমে। কিছুদিনের মধ্যে অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী সেই পরীক্ষা করলেন। পাশাপাশি দুটি সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে আলো নিয়ে গিয়ে পর পর আলো-আঁধারের ঝালর পাওয়ার যে পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে আলো একটি তরঙ্গ এবং তার তরঙ্গদৈর্ঘটি ওই পরীক্ষা থেকেই মাপা যায়, অনেকটা ওরকম একটি পরীক্ষা করা হলো। শুধু আলোর বদলে রইলো অসংখ্য ইলেকট্রনের প্রবাহ। এখানেও পাওয়া গেলো তেমনিই ঝালর যার একমাত্র অর্থ হলো ইলেকট্রন কণিকাও তরঙ্গ, মাপা গেলো তার তরঙ্গদৈর্ঘও। যা পাওয়া গেলো তা হুবহু দ্য ব্রগলীর ওই ভরবেগ-তরঙ্গদৈর্ঘ সম্পর্কের সঙ্গে মিলে গেলো। তাঁর আইডিয়ার জয় হলো, কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিরাট একটি উল্লম্ফন পেলো। বস্তু-তরঙ্গই হলো কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি সারকথা। মূল তত্ত্বটি আইডিয়ার খনি না হলে এসব কি হতো?

এ যেন বিজ্ঞান মহাকাব্য গল্পের প্রত্যেকটি অংশকে আরো বহু গল্পের প্লটের আইডিয়া দিয়েছে– তার প্রত্যেকটিতে নতুন গল্পে কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। এই মহাকাব্য শুধু গল্প বলেনা, সেই গল্পে মেশানো আইডিয়াগুলো সিসিম ফাঁকের দরজা খোলার চাবির মত কাজ করে– সেই দরজার পেছনে থাকে আরো রহস্য উদ্ঘাটক অন্য গল্পের হাতছানি।

# একটানা একটাই মহাকাব্য

এটি মানবজাতির বড় কাজ

একজন বিজ্ঞানী হয়তো সারা জীবন একটি সীমিত বিষয়ে গবেষণা করেন; সেটিই বছরের পর বছর তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে থাকে। ওভাবে হয়তো পুরো একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানই বিজ্ঞানের একটি শাখা বা প্রশাখার বাইরে কখনো কিছু করেনা। ওই বিজ্ঞানী বা ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আওতায় বিজ্ঞানের কাহিনীর যতখানি রূপ পায় তা হয়তো বিশ্ববিজ্ঞানের একটি সীমিত অংশ, যেই অংশে অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানী ও প্রতিষ্ঠানও হয়তো কাজ করেন। এই অংশের ভাষা, কাজের ভাবভঙ্গি অন্যান্য অংশের থেকে কোন কোন দিক থেকে একটু আলাদা হতে পারে। যাঁরা এই অংশ নিয়ে থাকেন তাঁদের সুবিধার জন্যই সমসাময়িক বিজ্ঞানের সব গল্পের মধ্যে একে একটি নিজ বৈশিষ্টময় গল্প মনে হতে পারে– যেমন পদার্থবিদ্যার গবেষণা প্রবন্ধ দেখলে এবং পাশাপাশি কেমিস্ট্রি বা জীববিদ্যার কোন শাখার গবেষণা প্রবন্ধ দেখলে আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট ভিন্ন মনে হবে। এর প্রধান কারণ এর প্রত্যেকটিতে তার নিজস্ব চিহ্ন, ফর্মুলা, পরিভাষা, গাণিতিক বা অন্য ভঙ্গির প্রকাশ থাকতে পারে। কেউ যদি এই পার্থক্য অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞানের নানা শাখার সঙ্গে তাঁর কিছু পরিচিতির সুযোগ নিয়ে এর সব ক'টির মর্মগুলো পড়তে পারেন তা হলে হয়তো তাঁর কাছে ওগুলোকে এত ভিন্ন মনে হবেনা। খুবই ভিন্ন ভিন্ন জগতের গল্প নিয়ে গড়া মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় মূল গল্পের সঙ্গে তিনি এর সম্পর্ক লক্ষ্য করবেন। সেই কেন্দ্রীয় গল্প এবং সেই সামগ্রিকতাকে খুঁজে পেতে হলে অন্তত মোটাদাগে বিজ্ঞান নামক পুরো মানব-প্রকল্পটির কথা ভাবতে হবে। তখন বোঝা যায় কত বিজ্ঞানীর কি বিশাল কর্মযজ্ঞে একটি অখণ্ড মহাকাব্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে, আর এটি চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে। ওই আলাদা আলাদা পরিসরের গল্পগুলোকে শেষ অবধি সেই অখণ্ড মহাকাব্যে শামিল হয়ে যেতে হয়, একই লক্ষ্যে।

যেদিন থেকে মানুষ বিজ্ঞানে মনোযোগ দিয়েছে– সেদিন থেকেই সে জানে সে কী করতে চায়, লক্ষ্যটি তখন থেকেই ছিল। এমন নয় যে এর উপায় তাদের হাতের মুঠোয় ছিল, বা এখনো আছে; কিন্তু গোড়া থেকেই তারা জানে

যে সমাধান দূরে থাকলেও সমস্যার দিগন্তগুলো তাদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। অন্য ভাবে বলা যায় বিজ্ঞানীরা যাঁর যাঁর ছোট গল্প বা ছোট কাব্য রচনা করতে থাকলেও তাঁদের অনেকের কাছে এবং সামগ্রিক ভাবে সবার কাছে ওই সব মিলে একটি মহাকাব্যের আবছা কাহিনী শুরু থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করেছিলো। একেবারে প্রথমে এতে যে মহাকাব্যের আঁটুনি ছিল তা বলা যাবেনা, কিন্তু ধীরে ধীরে তারও উন্নতি হয়েছে। যেমন তাঁরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তখনই বুঝতে পেরেছেন নিজেদের আবাসটুকুর বাইরে একটি মহাবিশ্ব আছে। নিজেদের আবাস পৃথিবীকে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কেন্দ্রে রেখেছেন, কিন্তু সুদূরের ওই জ্যেতিষ্কগুলোর জ্যোতি, চলাফেরা, নিয়মানুবর্তিতা মনে মনে তাঁদের মধ্যে এক বৃহতের ধারণা এসে দিয়েছিলো যার থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারেননি। কাজেই পৃথিবীতে তাঁদের আশেপাশের সবকিছুকে ব্যাখ্যা করাটি যখন তাঁদের জন্য জরুরী হয়ে ওঠেছিলো, তখন ওই আকাশের জগতটিকেও তাঁদেরকে মাথায় রাখতে হয়েছে।

যতটুকু যখন তাঁরা দেখেছেন পৃথিবীর বৈচিত্রটিও কম নয়। এখানকার বস্তু, শক্তি, গতি ইত্যাদিকে ঘিরে বিজ্ঞান রচিত হয়েছে। এতে আবার রয়েছে জড় ও জীব– তাদের বিভিন্নটির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার সম্পর্কও বিচিত্র। সব মিলে যে সাগর, পাহাড়, সমতল, বন, মরুভূমি এসব বৈচিত্রেরও পেছনে কাহিনী রয়েছে যার গল্প বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রয়োজন। এক সময় নিজের অন্যান্য সব রকম চিন্তার সঙ্গে মিলেমিশেই আসতো এসব গল্প, বিজ্ঞানের গল্পটি আলাদা বৈশিষ্টের হতোনা। পরে প্রকৃতির রহস্য আর অন্য রহস্যগুলোকে আলাদা করে 'প্রকৃতির দর্শনকে' সাধারণ 'দর্শনের' মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট দেয়া হয়েছে। নিজেদের পৃথিবীতে ঘনিষ্টতর সব প্রকৃতির ঘটনা নিয়ে যখন গল্প এগুচ্ছে বিজ্ঞানীর চোখ কখনো আকাশ থেকে বিচ্যুত হয়নি। সেখানে নানা জ্যোতিষ্কের যে স্থির বা গতীয় প্রকৃতি তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘটনাগুলোর সঙ্গে এমনকি মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পর্ক দেখতে পেতে তাঁদের দেরি হয়নি। জোয়ারভাটা, গ্রহণ, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদিতো একেবারে সরাসরি জীবনকে প্রভাবিত করেছে। যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি তা করেনি, যেখানে তাঁরা কিছু প্রভাব মনে মনে আরোপ করিয়ে নিয়েছেন– ব্যক্তির ভাগ্য, রাজার ভাগ্য, দেশের ভাগ্য এসবের ভবিষ্যদ্বাণী ওসব জ্যোতিষ্কের গতিবিধি দিয়ে করার চেষ্টা করেছে, সেগুলোকেও বিজ্ঞানের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে

ফেলেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞান থেকে বাদ দিতে হয়েছে, ওটি বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেনা বলে।

গোড়া থেকেই বিজ্ঞানীর আয়োজনটি মহাকাব্যিক, এটি অল্পের ওপর শুরু হলেও কখনো অগ্রগতি থেমে যায়নি। তাই যখন নিজের পৃথিবীকে চেপ্টা সমতল কিছু বলে মনে করে আকাশের অর্ধগোলককে দিগন্তে তার সঙ্গে এসে মিলছে কল্পনা করেছে, সেই আদি দিনগুলোতেও বিমূর্ত সব নতুন চিন্তা তাঁদেরকে দখল করেছে। দুই, তিন, ইত্যাদি সংখ্যা শুধু গাছ, পাথর, হরিণ গোণার কাজে আর ব্যবহার করছেন না, গাছের বা পাথরের বা হরিণের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক হারিয়ে এই সংখ্যা যেন এখন কিছুর সঙ্গে আটকে থাকছেনা নিজেই বিমূর্ত পাখা মেলে অসীমের দিকে উড়াল দিয়েছে শত, হাজার, কোটি হয়ে অসীম সংখ্যার কথাও ভাবতে অসুবিধা হচ্ছেনা। এটি একেবারে নতুন কাহিনী, গণিতের গল্প- আকাশের বা পৃথিবীর সব কিছুর মাপজোক করতে আগের গল্পের সঙ্গে এটি একাকার হয়ে এলো। পর পর সংখ্যার মত এই গণিতেরও পাখা গজিয়েছিলো– যোগ, বিয়োগ থেকে শুরু করে কত কিছুইনা। এ গণিত মহাকাব্যটিকে খুবই আলাদা বৈশিষ্ট দিলো- হাত ঘুরিয়ে, আন্দাজে কিছু বলার বা করার উপায় রইলোনা, সব সুনির্দিষ্ট হতে শুরু করলো। এতই সুনির্দিষ্ট যে রাতের পর দিন আসার আর দিনের পর রাত আসার পরম্পরায় এখন সুন্দর ক্যালেন্ডার আর পঞ্জিকার সংখ্যার হিসেব নিকেশে বাঁধা পড়লো। আগে এগুলো মাথায় খাটানোর মত কোন লেখাজোকা ছিলনা। রাশিচক্রের পথে জ্যোতিষ্কদের ঘোরাফেরা, নিজেদের জীবনের ছন্দ, আর ক্যালেন্ডারের সংখ্যার তারিখ সব যেন একটি অভিন্ন কাহিনীতে চলে আসলো– যেটি আগে কখনো হয়নি। এখন সবাই বুঝতে শুরু করলো এই কাহিনী তো আর দশটা গল্প-কাহিনীর মত নয়, এটি একটি আলাদা মহাকাব্য তাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ঘটিয়ে দিচ্ছে।

পৃথিবীতে যত হাজারো জিনিস নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হয় তাদের প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের থেকে আলাদা হয় তা হলে এই মহাকাব্য হবে অসংখ্য আলাদা বর্ণনার একটি সমষ্টি মাত্র। বিজ্ঞানীর মন এরকম একটি সাদামাটা বর্ণনা-তালিকা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাঁরা এত বিচিত্র জিনিসের মধ্যে একই পরম কিছু খুঁজে পেতে চান, অন্তত অল্প কয়েকটি পরম উপাদান যাদের সম্বয়ে গোটা পৃথিবীর সব গড়ে উঠতে পারে। এদেরকে মৌলিক উপাদানের মত করে দেখা

যায়। প্রাচীন কালে দুনিয়ার বহু সভ্যতার বিজ্ঞানীরা পানি, বাতাস, মাটি এবং আগুনকে এমনি উপাদান হিসেবে দেখেছেন। ভারতবর্ষে এর সঙ্গে আকাশকে যুক্ত করা হতো। এগুলোই যে সবকিছুর পরম উপাদান তা যুক্তিতর্কে প্রমাণেরও চেষ্টা হয়েছে যেমন গ্রীকদের মধ্যে এটি এরিস্টোটল করেছেন। তাঁরা সব রকম জিনিসকে যুক্তিতে বিশিষ্ট করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে শেষ পর্যন্ত ওই উপাদানগুলোর দু'একটি দিয়েই এরা গড়া। গ্রীকদের মধ্যে আর এক বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাস উপাদানের ব্যাপারে ওই চারটা জিনিসে থেমে যাননি। বরং তিনি দেখালেন সব কিছুর আরো পরম একটি উপাদান আছে যার থেকে মৌলিক আর কিছু হয়না, অর্থাৎ তার মধ্যে আর কিছু পাওয়া যায়না, তাকে ভাগ করা যায়না, তাই তাকে বলা হলো এটম বা অবিভাজ্য। দুটি এটমের মাঝখানে থাকে শূন্য স্থান ভ্যাকুয়াম। তিনি বল্‌লেন এই এটমগুলো নানা ভাবে স্তুপ হয়ে সেজে গিয়ে দুনিয়ার সব বস্তু তৈরি হয়েছে।

এরিস্টোটল, ডেমোক্রিটাস তাঁরা সবাই সব কিছুর পরম রূপটি পেতে চেয়েছেন, যথাসম্ভব আরো পরম আরো মৌলিকভাবে। এটি সত্যিই কেমন ভাবে রয়েছে এ নিয়ে গোড়াতেই বিতর্ক ছিল, যে বিতর্ক চলেছে হাজার বছর ধরে। এরিস্টোটল ও তাঁর অনুসারীরা এটমে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু অন্যরা করেছেন এবং শেষ অবধি এটমকে অন্য রকম আজকের রূপে নিয়ে এসেছেন। বলা যায় চাওয়াটি ছিল সামনের মহাকাব্যের কাহিনীর একটি সীমানা কিনারার দিক নির্দেশ করা। সীমানার দিকটি সেই প্রাচীন কালেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো বিজ্ঞানীদের ওরকমের পরম উপাদানের সন্ধানের। তারপর যুগে যুগে মহাকাব্য সেদিকে এগিয়েছে– এটমের আরো স্পষ্ট রূপ, ইলেকট্রন-প্রোটন ইত্যাদি মৌলিক কণিকা, এমনি ভাবে কাহিনী সেদিকে হয়তো চল্‌তেই থাকবে। সেই ডেমোক্রিটাসের কালেই পরম উপাদান অদৃশ্য ছিল, কল্পনার বিষয় ছিলো; কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো সত্যি হবার জন্যই তো কল্পনা আসে। কল্পনাকে তখন প্রমাণ করা হয়েছে যুক্তিতে; পরে অবশ্য বাস্তব প্রমাণটিও অপরিহার্য হয়েছে এবং এক্সপেরিমেন্টে এটম ও মৌলিক কণিকা প্রমাণিত হয়ে বাস্তবতা পেয়েছে।

সব কিছুর পরম ক্ষুদ্র উপাদানের কল্পনা মহাকাব্যের কাঠামোতে যেমন একটি কিনারা সীমান্ত, তেমনি আর একটি কিনারা সীমানার কল্পনা এসেছে বৃহতের ধারণা থেকে, প্রধানত আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। কয়েক হাজার বছর ধরে আকাশকে সূক্ষ্ম ভাবে দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেনে আকাশের

জ্যোতিষ্ক ও আমাদের পৃথিবীকে নিয়ে একটি সামগ্রিক মহাবিশ্ব আছে। শুরুতে মহাবিশ্ব বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন কেন্দ্রে পৃথিবী, তার ওপরে আকাশ অর্ধ-গোলকে বাকি সব কিছু– চাঁদ, নানা গ্রহ, সূর্য; আর তার সঙ্গে স্থির তারা। দূরত্বগুলো কিছুটা বোঝা গেলে বুঝতে পারছিলেন পৃথিবীর পরপর চাঁদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এভাবে সাজানো আছে, তারপর অসংখ্য স্থির তারা। এর কয়েক হাজার বছর পর ধারণা কিছুটা পাল্টিয়ে পৃথিবীকে গোলক ভেবে নিয়ে, বাকি সব কিছু এর চারিদিকে একটি আকাশ গোলকে আছে ভাবলেন। তখন তাঁদের ধারণা ছিল এসব নিয়েই পুরো মহাবিশ্ব। এটমের মত এগুলো অদৃশ্য না হলেও এতেও নানা কল্পনার দরকার হয়েছে পর্যবেক্ষণে এগুলোর গতিবিধিকে নিজেদের ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। সে সময়েই কোন কোন বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন সব গ্রহের মাঝামাঝি থাকা সূর্যের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট আছে– যেমন ওরকম মাঝামাঝি থেকে এটি বাকি সব গ্রহকে ও পৃথিবীকে আলোকিত করছে। বহুকাল পরে প্রায় আধুনিক কালে এসে অবশ্য বোঝা গেল গ্রহগুলোর মাঝখানে আছে পৃথিবী নয় সূর্য। পৃথিবী সহ গ্রহগুলো সেই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে শুধু চাঁদ।

আধুনিক কাল যখন এগিয়েছে তখন বোঝা গেছে ওই প্রত্যেকটি তারারই অনেকগুলোর আছে এমনি সব গ্রহের পৃথক জগত, কোটি কোটি তারা নিয়ে এক একটি গ্যালাক্সি, তাদের আবার গ্যালাক্সিপুঞ্জ। বোঝা গেছে মহাবিশ্ব আসলে অনেক অনেক বড়; তার সীমানারও একটি আন্দাজ পাওয়া গেছে, যা ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। এসব সম্প্রতি জানা জিনিস। কিন্তু এই রকম মহাবিশ্ব যে আছে, তার ভেতরেই যে সব, বিজ্ঞানের মহাকাব্য যে তাকে নিয়েই, সে রকম পরম বৃহতের সীমানাটির ধারণা আগেই হয়ে গিয়েছিলো, যেমন ভাবে পরম ক্ষুদ্রের ধারণাটি হয়েছিলো। মনে হচ্ছে যেন এই দুই চরম সীমানার কাঠামো গোড়াতেই এঁকে দিয়েছেন ওই মহাকাব্যের প্রথম দিকের রচয়িতারা। শুধু তাই নয় সামগ্রিক বৃহতের হিসেব নিতে গিয়ে মহাবিশ্ব কি একটি না একাধিক এই প্রশ্নও সেই প্রাচীন বিজ্ঞানীরাই প্রথম করেছেন– উভয় সম্ভাবনার পেছনে যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই হাজার বছর ধরে এটি চিন্তার মধ্যে আছে। একেবারে আধুনিক কালে আমাদের নিজেদের মহাবিশ্বের বাইরে যে আরো মহাবিশ্ব থাকতে পারে তা তাত্ত্বিক ভাবে দেখানোও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য সেই অন্য মহাবিশ্বগুলো কখনো আমাদের আবগতিতে আসার উপায়

নেই। এখানেও দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান আধুনিক হলেও তার মূল ধারণাগুলো অনেক প্রাচীন।

একদিকে সব কিছুর সামগ্রিকতা, অন্যদিকে সব কিছুর ক্ষুদ্রতম মৌলিক উপাদান এমনি সব মহাকাব্যিক লক্ষ্যের ভেতরেই চলেছে মূল কাহিনীর রচনা। এর ভেতরেই এসেছে গল্পের ভেতর গল্প, সৃষ্টি হয়েছে কাহিনীর নতুন নতুন অন্য রকম সীমান্ত এলাকা। অতীতে দূর দিগন্তগুলোর আবছা সীমানা পাওয়া গেলেও তার মধ্যে কাহিনীর বুনোট ছিলনা। নতুন নতুন আবিষ্কার কাহিনী বুনোটকে ক্রমাগত আটসাট করেছে, এখনো করে চলেছে। প্রশ্নের ভেতর প্রশ্ন এসেছে। দেখা গেছে যেই এটমকে অবিভাজ্য বলা হয়েছিলো, তার ভেতরে আছে আরো পরম কণিকার রাজ্য। যেই কণিকাকে মনে করা হয়েছিলো স্বয়ংসম্পূর্ণ, দেখা গেছে তা কয়েক রকম ক্ষুদ্রতর কণিকায় গড়া; এমনি ভাবে কাহিনী যেন পরতে পরতে উন্মোচিত হচ্ছে– সেই প্রাচীন কাঠামোর ভেতরেই। অন্যদিকে একেবারে সম্প্রতি ফয়সলা হয়েছে যে মহাবিশ্ব একটি বিন্দু হিসেবে অতীতে এক বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে; কোন্ মুহূর্তে তাও হিসেব করে বলে দেয়া গেছে, ১৪ শত কোটি বছর আগে। কিন্তু তারপরও ওই সেদিন পর্যন্তই এটি বিতর্কিত বিষয় ছিল, কারণ অনেক বিজ্ঞানী আবার মনে করতেন মহাবিশ্ব সব সময় একই ছিল, বর্তমানে যেমন অতীতেও তেমন। এই বিতর্কটিও কিন্তু আজকের নয়– মহাবিশ্বের প্রাচীন ধারণা যখন এসেছিলো তখনই এই প্রশ্নটিও এসেছিলো। যুগে যুগে প্রশ্নটি নতুন রূপ পেয়েছে, অবশেষে আজ একেবারে হাতে কলমে কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে বিশেষ মুহূর্তে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের জন্মের তত্ত্বটিই স্বীকৃত হয়েছে। এভাবে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতের ওই মূল কাঠামোর মধ্যেই যেন সব কিছু ঘটে চলেছে– বিজ্ঞান নামক একই অভিন্ন মহাকাব্যের সব কাহিনী।

## মূল মহাকাব্যে গল্প-সীমান্ত ক্রমেই সৃষ্টি হয়েছে

বৃহৎ আর ক্ষুদ্রের যে গল্প-সীমান্ত তাকে একটি পরম সীমান্ত বলে যদি ধরে নিই তার মধ্যে কিন্তু আরো নতুন নতুন সীমান্ত সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যেমন ধরা যাক গতির প্রশ্নটি। প্রাচীন দার্শনিকরা গতিকে দেখেছেন পরিবর্তন হিসেবে– এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে পরিবর্তন। গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে এটি নিয়ে মতবিরোধ ছিল; কিন্তু পরিবর্তন হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হওয়া যে খুবই গুরুত্বপর্ণ এই ব্যাপারে কোন মতবিরোধ ছিলনা। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক

পারমিনিড্‌স মনে করতেন আমাদের চারদিকে যেই বাস্তবতা তার কোন পরিবর্তন নেই, এটি একটানা একই থাকে; তাই পরিবর্তন ব্যাপারটিই অসম্ভব, গতিও তাই। যাকে আমরা কোন কিছুর গতি মনে করি তা আসলে অলীক ব্যাপার। এর ঠিক বিপরীত মতবাদ ছিল আরেক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের; সেটি তাঁর বিখ্যাত উক্তি থেকেই বোঝা যায়– 'কেউ এক নদীতে দুইবার পা রাখেনা'। তিনি সব কিছুকে নদীর মতই চলমান মনে করতেন। আর একজন দার্শনিক জেনো পারমিনিডসের পক্ষ নিতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন আমরা যদি গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে দেখি তখন যে কোন গতিই যে অসম্ভব তা দেখতে পাবো। এর জন্য তিনি গল্পচ্ছলে এমন কিছু যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যার ফল আমাদের জানা বাস্তবতার সঙ্গে খুবই বিসদৃশ- যে রকম পরিস্থিতিকে বলা হয় প্যারাডক্স বা কূটাভাস। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে গ্রীসের সব চেয়ে বড় দৌড়বিদও দৌড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবেনা, সব থেকে বড় বীরও দৌড়ে গিয়ে কচ্ছপের মত ধীর গতির প্রাণীকেও ধরতে পারবেনা, একটি তীর ছুঁড়লে কোথাও যেতে পারবেনা।

প্রত্যেকটিতে জেনো নানা ভাবে দেখিয়েছেন যে কোন কাম্য দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে প্রথমে ওই দূরত্বের মধ্যবর্তী একটি বিন্দু পার হতে হবে। আর সেই মধ্যবিন্দুতে পৌঁছতে হলে আগে ওখানে যাবার পথের নতুন মধ্যবিন্দুটি অতিক্রম করতে হবে। এমনি করে যতবারই সে এগুতে চাইবে তাকে একটি নতুন মধ্যবর্তী বিন্দু অতিক্রম করতে হবে– এবং এটি অসীম ভাবে চলতেই থাকবে। চূড়ান্ত গন্তব্যে যাওয়ার আগে এরকম অসীম সংখ্যক বিন্দু পার হয়ে যেতে হবে। সসীম একটি সময়ে এভাবে অসীম বিন্দু অতিক্রম সম্ভব নয়। কূটাভাসের বিষয়টি এখানেই– বাস্তবে যা অনায়াসে সম্ভব দেখছি তা যুক্তি দিয়ে দেখানো যাচ্ছেনা; কাজেই নিশ্চয়ই তাতে কোন সমস্যা আছে। এর পর দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় বহু দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ বহুভাবে চেষ্টা করেও এই সমস্যা সমাধান করতে পারেননি প্রধানত অসীম সম্পর্কে ধারণাটি গাণিতিক ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি বলে। মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে আধুনিক গণিতবিদ ক্যান্টরই পৌঁছতে পেরেছে অসীম সংখ্যা সম্পর্কে সেই জ্ঞানের গভীরতা লাভ করে জেলোর কূটাভাসের কারণ বের করতেন।

এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞানের মহাকাব্যে গোড়া থেকেই গতির ভাবনাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলো। পারমিনিডস,

হেরাক্লিটাস, জেনো সবার থেকে অনেক পরের দার্শনিক এরিস্টোটল গতির ওপর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে সব জ্যোতিষ্কের গতির জন্য এবং পৃথিবীর বুকে কিছু স্বাভাবিক গতির উৎস হিসেবে তিনি এক গতিহীন গতিদাতার কল্পনা করেছিলেন। এই উৎসটি শুধু ব্যতিক্রম, বাকি সব গতি সরাসরি অন্য গতিমানের সঙ্গে সংস্পর্শের মাধ্যমেই নিজে গতি পায়। গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর সঙ্গে সংস্পর্শে থাকা স্বচ্ছ গোলকের গতির মাধ্যমে আকাশের সবাই এই গতি পায়, পৃথিবীর অনেক কিছু পায়। গতি সম্পর্কে এই কল্পনাটি যে ভুল তা বুঝতে মানুষের অনেক বছর লেগে গিয়েছিলো। পৃথিবীর নানা বস্তুর জন্য এরিস্টোটল আরো এক রকম গতি কল্পনা করেছিলেন সেটি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি করা যায়– যেমন ধনুকের ওপর বল প্রয়োগ করে তীরে গতি সঞ্চার। কিন্তু গতির ভুল ধারণাগুলো এখানেও ছিল। এখানেও যতক্ষণ এক গতিমান অন্যকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে গতি না দিচ্ছে ততক্ষণ সেটি গতি পায়না। গতির এসব তত্ত্ব বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো; যদিও এগুলো যে সত্য কোন পরীক্ষার মাধ্যমে এরিস্টোটল তার প্রমাণ দেননি তবুও সাধারণ অভিজ্ঞতায় এ রকম ঠেলে চালানোর ব্যাপার তো ছিল।

পরীক্ষায় প্রমাণ দিতে গিয়ে দু'হাজার বছর পর গ্যালিলিও দেখিয়েছিলেন যে গতি নিয়ে ওসব কথা সত্যি নয়। আসলে সব বস্তুই নিজের একটি গতি নিয়ে চিরকাল থাকে, যা সরল রেখায় সমবেগে গতি। সে গতি কতটা তা অবশ্য যে দেখ্ছে তার নিজের গতির আপেক্ষিকে এক একজনের কাছে এক এক রকম হবে। তবে বল প্রয়োগ করে এই গতি পরিবর্তন করা যায়। নিউটন এই সবকে অংকের ভাষায় তাঁর তিন গতি সূত্রে নিয়ে গেলে মনে হলো গতির সীমান্তের সব কিছুর সুন্দর সমাধান হয়ে গেলো। এটি পুরো বিজ্ঞানের মহাকাব্যটিকেই যেন তার নিজস্ব গল্পে তরতর করে এগিয়ে যেতে দিলো। তারপর থেকে প্রকৃতিতে যার কথাই বলি শুধু ওই গতি তত্ত্বের চাঁছে তাকে ফেলে দিলেই তার সব কিছু জানা হয়ে যায়। সেটি বড় বড় গ্রহ-উপগ্রহ হোক, পৃথিবীতে যে কারো চলাফেরা হোক, শরীরের রক্ত কণিকার প্রবাহ হোক, কিংবা অদৃশ্য অণু, কি এটম, কি কণিকার গতিময়তাই হোক। ওই ক্ষুদ্র অদৃশ্যদের জগতের গতি নিয়ে একটু মুশ্কিলে পড়া গেলো। ওগুলোর সংখ্যা তো অনেক, অল্প খানিকটা গ্যাসের মধ্যেই তো বহু কোটি অণু রয়ে গেছে। ওই নিউটনের সূত্র দিয়ে এক এক করে সেগুলোর প্রত্যেকটির ভবিষ্যৎ হিসেব কষে বের করা যায়। কিন্তু সেতো নীতির কথা, সত্যি সত্যি তো এতগুলোর হিসেব করা যাবেনা। তাই

গণিতের কৌশলের আশ্রয় নিতে হলো– গড় গতি, সার্বিক গতির সম্ভাবনা ইত্যাদি গণিতের সাহায্য নিয়ে পুরো সবগুলোকে এক সঙ্গে হিসেবে নিয়ে আসা হলো– এক রকম সংখ্যাতাত্ত্বিক গতি হিসেবে– এ যেনো সীমান্তের মধ্যে আরেক সীমান্ত; গল্পের মধ্যে গল্প।

আরো পরে দেখা গেলো ক্ষুদ্র জিনিসের জগতটার গল্প খুবই আলাদা, ওটি আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে বা আমাদের মস্তিষ্কের ভাবনার স্বাভাবিক ভঙ্গি দিয়ে কল্পনায়ও আনতে পারিনা। কিন্তু বিজ্ঞানের কাহিনীতে তাকে দিব্যি আনা যায়, এখন হরদম আনা হচ্ছে। গণিতের ভাষায় কথা বলে আমাদের বোধ শক্তির তোয়াক্কা না করেই সে কাহিনীকে বাস্তবের সঙ্গে সুন্দর মিলিয়ে নেয়া যায়– যা অন্য কোন ভাবে সম্ভব নয়। এটি মহাকাব্যের আধুনিকতম একটি সীমান্ত যাকে বলা হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সীমান্তে গিয়ে দেখা গেলো খুব দ্রুত গতির জিনিসের ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর সেই এক এক গতি সম্পন্ন দর্শকের আপেক্ষিকে প্রত্যেকের নিজস্ব গতিটিকে যে ভিন্ন মনে হয় তার তাৎপর্য আরো অনেক দূর বিস্তৃত। ইতোমধ্যে এও দেখা গেছে যে আলোর গতির ব্যাপারটি অন্যরকম, কোন পরিস্থিতিতে তার বেগ বদলায়না। ওই তাৎপর্য ও এই আলোর গতির এই না বদলানো এই দুইয়ে মিলে নানা দর্শকের গতির সাপেক্ষে তাদের কাছে স্থান, কাল ইত্যাদির পরিমাপও বদলে যায়– ঠিক কীভাবে কতখানি বদলে যায় তাও সুন্দর বলে দেয়া গেলো। এও এক নতুন আধুনিকতম সীমান্তের জন্ম যাকে বলা হলো অপেক্ষিক তত্ত্ব। প্রত্যেকটি সীমান্তের জন্ম সেখানে নতুন নতুন আইডিয়ার জন্ম দিচ্ছে আর পুরো মহাকাব্যটির বুনোটে নতুন সৌকর্য আন্‌ছে। এ শেষ না হওয়া, নতুন সৌকর্যের অভাব না ঘটা এক অদ্ভুত মহাকাব্যই বটে।

গতি জিনিসটি সব জায়গায় কাজ করেছে- তাপের অর্থ খুঁজতে গিয়ে সেখানেও কাজ করেছে। দেখা গেছে যে তাপ জিনিসটাও গতি। তাই ইঞ্জিনের মধ্যে তাপকে ব্যবহার করেই চাকা ঘোরাবার গতিতে রূপান্তরিত করতে পারি। মহাকাব্যের এক উপকাব্য হিসেবে তাপের কাহিনী লিখতে গিয়ে দেখা গেলো তাপের মধ্যে যত গতি তার পুরাপুরি সবটুকুকে চাকা ঘোরাবার মত কাজের গতিতে রূপান্তর সম্ভব নয়– কিছু চারিদিকে ছিটিয়ে নষ্ট হবেই। আর এটি শুধু ইঞ্জিনের মধ্যে নয় মহাবিশ্বের সব কাজের মধ্যে সত্যি, এমনকি মহাবিশ্ব নিজে কোন দিকে যাচ্ছে তার জন্যও সত্যি। এই সব কিছু এবং মহাবিশ্ব নিজেও

আসলে অপচয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বলা যায় অকর্মণ্যতার দিকেই যাচ্ছে, ক্রমেই বেশি বেশি অকর্মণ্য হচ্ছে। একে বলা হলো তাপ-বল বিদ্যার দ্বিতীয় নিয়ম। এ যেন মহাকাব্যটিতেই একটি বিষাদের সুর দিলো, চূড়ান্ত বিচারে অকর্মণ্য হবার এক মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডিই যেন এটি রচনা করছে। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে গিয়ে আরো সব কথা আসে, ওই যে আপেক্ষিক তত্ত্ব সেটি এর ভবিষ্যতের নানান সম্ভাবনা তুলে ধরে– যেমনি আছে তেমনি থেকে যেতে পারে, অথবা চুপসে গিয়ে তার জন্মকালীন বিন্দুতে ফিরে শেষ হয়ে যেতে পারে, অথবা আরো প্রসারিত হয়ে চল্‌তে পারে। সবই বড় মাপের কাহিনী, বিজ্ঞান নামক মহাকাব্য বলে কথা।

ওই তাপ বলবিদ্যারই আরেক নিয়ম কাজ করেছে নিম্ন উত্তাপেরও একটি সীমার ব্যাপার নিয়ে। উত্তাপ (তাপমাত্রা) যেহেতু গতির ব্যাপার ওই গতি একেবারে শূন্য হয়ে পড়লে তারপর উত্তাপ আরো নিচে যাবার সুযোগ থাকলোনা। এভাবে উত্তাপের একটি নিম্ন সীমা পাওয়া গেল। ওই নিম্ন সীমার কাছাকাছি উত্তাপগুলোতে প্রকৃতির অনেক নতুন নতুন ঘটনা উদ্ঘাটিত হলো– অতিপরিবাহিতা, অতিপ্রবাহ ইত্যাদি– যেসব ক্ষেত্রে গল্পগুলো সোজা পথে এগুনোর সুযোগ ছিলনা। কোয়ান্টাম তত্ত্বের জটিলতর বুনোটের তত্ত্বেই তাকে এগুতে হয়েছে। অন্যদিকে উত্তাপের ওরকমের ধরা বাঁধা কোন উচ্চ সীমা দেয়া যায়নি। তবে মহাবিশ্ব শুরুর মুহূর্তের যে উত্তাপ সেটি অত্যন্ত উচ্চ যদিও তা কাহিনীতে কল্পিত হতে হয়েছে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে, মানুষ তার খুব কাছের উত্তাপও নিজে ল্যাবোরেটরিতে সৃষ্টি করতে পারেনি। সাধারণ বিজ্ঞান কাহিনীতে যা যা আছে এরকম উত্তাপে তার অনেক কিছুই কার্যকর হবেনা– বস্তু আর শক্তির যে আলাদা অস্থিত্ব তাও সেখানে নেই। অনেক উচ্চ উত্তাপ থেকে অনেক নিচে উত্তাপ এও তো এক রকম চরম সীমানা দিয়ে দেয়া।

বিজ্ঞানের মহাকাব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমানা হলো জীব ও জড়ের মাঝখানের সীমানা। একই পৃথিবীতে পাশাপাশি জীব ও জড় উভয়েই বাস করছে। দেখা গেলো জড়ের অনেক আচরণ জীবেরও রয়েছে, কিন্তু জীবের এমন বিশেষ সক্ষমতা আছে যা জড়ের নেই। ওই সক্ষমতার কথা বাদ দিলে জড়ের মত জীবও বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রি ইত্যাদি সব কাহিনীর সমান অংশীদার। জীবের ওই বিশেষ সক্ষমতাগুলোকে আত্মা নাম দিয়ে একটি পর্যায় পর্যন্ত জীবকে বিজ্ঞানের বাইরে রেখে দেয়া হচ্ছিলো– যেন বিজ্ঞান নামক

মহাকাব্যে আত্মা সম্পন্ন কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চল্‌তে পারলোনা, বিজ্ঞানীরা বুঝলেন জীবকেও একই ভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে আনতে হবে– সেই থেকে জীবজগত বিজ্ঞান মহাকাব্যের গল্পের ভেতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গল্প; একটি অত্যন্ত সক্রিয় সীমান্ত অঞ্চল। দেখা গেলো জীবনের যে লক্ষণগুলো– সেগুলোকে একেবারে মৌলিক পর্যায়ে দুটি বিষয়ে পর্যবেশিত হয়। তা হলো নিজেই নিজের কপি (নকল) তৈরি করতে পারা, আর নিজের মধ্যে সহজাত ভাবে পরিবর্তন আনতে পারে যার ফলে প্রকৃতি-পরিবেশ দিয়ে নির্বাচিত কিছু কিছু পরিবর্তিত জীব আসতে পারে, যাকে বিবর্তন বলা হয়। এই দুটিই ঘটার মৌলিক উপাদানটি হলো ডিএনএ। জীবনের গল্পকে এখন শুরু করতে হয় ডিএনএ'র গল্প দিয়ে। জীবের সব বিশেষ গুণ তার খাদ্য গ্রহণে বেড়ে ওঠা, তার নড়াচড়ার সক্ষমতা, তার শক্তি উৎপাদন, তার বংশ বৃদ্ধি, তার বর্জ্য নিষ্কাশন, তার মানসিক আচরণ সব কিছুরই শুরু এই ডিএনএতেই। কারণ এই ডিএনএতেই এর সব কিছুর সাংকেতিক কোড লিপিবদ্ধ থাকে যার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জীবনের প্রকাশ ঘটে। এই কোডের একটু একটু পরিবর্তনই বিবর্তন যা জীবকে পরিবর্তিত করে। এমনিভাবে বিজ্ঞানের মহাকাব্যে শত সীমান্তে গল্প তৈরি হয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি, যে কোন মহাকাব্যের মতই। তাই মানুষের জীবন উন্নত হওয়া, মানুষের টিকে থাকাটি এখানে গুরুত্ব পায়। কিন্তু দেখা গেছে মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত পুরো জীব জগতের বেঁচে থাকা, কোন অবস্থাতেই জীববৈচিত্রের হানি না হয়ে। অথচ তাই এখন হয়ে চলেছে মানুষেরই কাজের ফলে। জীব ও জড় একত্রে এক একটি পরিবেশের আওতায় এক সঙ্গে থাকে যেগুলোকে এক একটি ইকোসিস্টেম বা বাস্তু-ব্যবস্থা বলা হয়– যেমন একটি পুকুর বা একটি বাগান হতে পারে সে রকম ইকোসিস্টেম। এতে সব জীবের মধ্যে এবং জীবের ও জড়ের ভারসাম্য বজায় রেখে একে টেকসই করার মাধ্যমেই সব জীবের ও মানুষের টিকে থাকা নির্ভর করে। মানুষের কারণেই ভূ-উত্তাপ বাড়ার মাধ্যমে এই ভারসাম্য যেন নষ্ট না হয়, বিশ্বজোড়া জলবায়ু পরিবর্তন যেন বেড়ে না চলে তাও এ মুহূর্তে বিজ্ঞান মহাকাব্যের সব থেকে সংবেদনশীল অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে– সবকিছুকে টেকসই করার চেষ্টা যার মূলমন্ত্র।

## এই মহাকাব্যের দুই অংশে সাংঘর্ষিক নিয়ম অচল

নানা সীমান্তের নানা গল্প, তাদের প্রকাশের ভঙ্গিটিও বিচিত্র; কাজেই এমন তো হতে পারতো যে এক অংশে যা বলা হয়েছে অন্য আরেক অংশে গিয়ে তার বিপরীত কথা বলা হয়েছে। না, সেটি হওয়াটি একেবারেই বারণ, শত সীমান্ত সত্ত্বেও মহাকাব্যটি কিন্তু এক এবং অখণ্ড। এতে বহু বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে, তার মধ্যে কোন কোনটি অন্য তত্ত্বের ওপর নির্ভর নাও করতে পারে। কিন্তু এমন কিছু কোন তত্ত্বে থাকতে পারবেনা যা অন্য তত্ত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সেটি হবে মহাকাব্যের এক অংশে কিছু বলে অন্য অংশে গিয়ে সেটি অস্বীকার করার মত। সাহিত্যের মহাকাব্যে যে নানা রাজ্যের কথা বলা হয় তার কোন কোনটিতে শাসকদের কারণে উল্টো ধরনের নিয়ম চালু থাকতে পারে- তাতে পুরো মহাকাব্যের কোন ক্ষতি হয়না। কিন্তু বিজ্ঞানের পুরোটা এক সুরে কথা বলতে হয়। কারণ এই মহাকাব্যটি শুধু কথা-কাহিনী-আবেগ-ভক্তির ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং যুক্তি এবং একই সঙ্গে হাতে কলমে প্রমাণিত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই সৃষ্টি হয়। এক শাখার সেই প্রমাণ যদি অন্য শাখায় গিয়ে নাকচ হয়ে যায় তখন সেই ভিত্তি আর থাকেনা, বিজ্ঞানে তার অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকারও থাকেনা। বিজ্ঞানের এক যাত্রা; এই এক যাত্রায় দু জায়গায় দুই ভিন্ন ফল হতে পারেনা। হ্যাঁ কোন একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব একেবারে বাতিল হয়ে গিয়ে সে জায়গায় নতুন তত্ত্ব আসতে পারে, এমনকি আগের তত্ত্বটি বিশেষ শর্তাধীনে নতুন তত্ত্বের একটি আসন্ন রূপ হিসেবে ব্যবহৃতও হতে পারে। যেমন আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বটিই সঠিক তত্ত্ব হলেও নিউটনের প্রচলিত মহাকর্ষ তত্ত্বটি শর্তাধীনে আসন্ন রূপে এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বর্তমানে ব্যবহৃত নিউটনের তত্ত্বে এমন কিছু মেনে নেয়া হয়না যা আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়।

এর ব্যতিক্রম হবার চেষ্টা হলেই বোঝা যায় যে কোন একটা কিছুকে বিজ্ঞানের অনুর্ভুক্ত না হয়েই বিজ্ঞান বলে চালানো হচ্ছে। যেমন চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাক। বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক চিকিৎসার একটিই ধারা আছে, তা একাধিক হতে পারেনা। কেউ যদি বলেন এই ওষুধটি ওই মূলধারা চিকিৎসাবিদ্যা থেকে আসেনি এটি একটি বনাজি ওষুধ, কিংবা হার্বাল ওষুধ তা হলে একটু থম্‌কে দাঁড়াতে হবে। যদি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসাবিদ্যার কোন ওষুধের উৎস হিসেবে সরাসরি গাছগাছড়া বা ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়

তা হলে তাতে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্মতি আছে কিনা তা দেখতে হবে। হয়তো কারখানায় তৈরি না করে সরাসরি উৎস ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তাতে উপাদানটি সঠিক পরিমাণে আছে কিনা, বিশুদ্ধভাবে আছে কিনা, ক্ষতিকর কিছুও মেশানো আছে কিনা তা ওই স্বীকৃত আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যাকেই নির্ণয় করতে দিতে হবে। হার্বাল, ভেষজ ইত্যাদি নামে কোন বিকল্প চিকিৎসাবিদ্যা আলাদা স্বাধীন ভাবে বিজ্ঞান বলে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা, মূল চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তো একেবারেই নয়। যেমন হোমিওপ্যাথিকে যে আলাদা একটি চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসেবে দাবী করা হয় তা মূলধারার চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এক সময় তো রুগীকে সিদ্ধান্তই নিতে হতো এলোপ্যাথিক (মূলধারার) চিকিৎসা করাবো না হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাবো। এভাবে বিজ্ঞানের মহাকাব্যে সাংঘর্ষিক দুটি তত্ত্বের এক সঙ্গে স্থান পাবার কোন সুযোগ নেই।

হোমিওপ্যাথিও বিজ্ঞানের বিশেষ করে কেমিস্ট্রির ভাষা ও কিছু কিছু জ্ঞান ব্যবহার করে বটে কিন্তু তার মূল তত্ত্বগুলো মূলধারার চিকিৎসার সঙ্গে একাধিক ভাবে সাংঘর্ষিক। যেমন তাতে একটি প্রধান নীতি হলো ওষুধের যে উপাদান তার কার্যকারিতা ততই বাড়ে যতই দ্রবণের মধ্যে উপাদানটির পরিমাণ কমে, অর্থাৎ দ্রবণটিকে যতই দ্রাবক মিশিয়ে পাতলা করে নেয়া হয়। হোমিওপ্যাথির মতে এভাবে কম হলে তার ওষুধ-গুণ বেড়ে যায়, তা দেহের সঙ্গে আরো ভাল বিক্রিয়া করে। এটি মূলধারার শুধু চিকিৎসাবিদ্যার নয়, বিজ্ঞানের যে কোন শাখার সঙ্গে বিশেষ করে কেমিস্ট্রি ও শারীরতত্ত্বের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। পাতলা করলে উপাদানের গুণ ও কাজ হ্রাস পায় সেটিই বৈজ্ঞানিক কথা। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটি কাম্য হতে পারে, তা ভিন্ন ব্যাপার, কারণ তার মানে গুণ হ্রাস করাটাই সেখানে কাম্য। তাছাড়া হোমিওপ্যাথির আর একটি মুল নীতি হলো বিষে বিষক্ষয় হয়– সে জন্য অনেক সময় খুব পাতলা করে বিষময় উপাদানও এর ওষুধের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এমন তত্ত্বে বিজ্ঞানের সায় নেই। বিষময় কিছু যদি বৈজ্ঞানিক ওষুধে অন্তর্ভূক্ত হয়ও সেটি বিষক্ষয় করার জন্য নয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে মেরে ফেলার প্রয়োজনে– তাও খুবই বিরল ক্ষেত্রে ও রুগীর তেমন ক্ষতি করবেনা এই সতর্কতা অবলম্বন করে। এসব কারণে দুনিয়ায় নানা দেশে তার ওপর অনেক মানুষের আস্থা থাকলেও হোমিওপ্যাথিকে কী ভাবে বিজ্ঞানের অংশ বলা যায় তা বিতর্কিত প্রশ্ন। অসুখের বিরুদ্ধে কার্যকারিতার প্রশ্নে যেমন এ বিতর্ক আছে, তেমনি এর সাংঘর্ষিক নীতিগুলোকে

কীভাবে বিজ্ঞানে স্থান দেয়া যায়, তা নিয়েও আছে। সে ক্ষেত্রে দুটি সমান্তরাল বিজ্ঞান সৃষ্টির উপক্রম হয়, যা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানে একই রকম ফলাফল দেবার কারণে পাশপাশি দুটি তত্ত্বের উপস্থিতি সাময়িক ভাবে মাঝে মাঝেই ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় তত্ত্বের বক্তব্যগুলো রীতিমত পরস্পর সাংঘর্ষিক– তেমনো ছিলো। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক যুগের একেবারে শুরুতে কোপারনিকাসের বৈপ্লবিক সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব-ছবি আবিষ্কারের পরও বহুদিন অনেক বিজ্ঞানী প্রচলিত পৃথিবী-কেন্দ্রিক এবং নতুন সূর্য-কেন্দ্রিক এই দুটি তত্ত্বকেই সমান চোখে দেখেছেন, দুটি নিয়েই কাজ করেছেন। যেহেতু ফলাফল দুটি থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই আসছিলো কাজেই কোনটিতেই অসুবিধা হচ্ছিলোনা। কিন্তু সাংঘর্ষিক দুটি তত্ত্ব একই সঙ্গে বেশিদিন থাকতে পারেনা, এদের মধ্যে একটিই শুধু সত্যি হতে পারে, এবং বিজ্ঞানীর শিগ্‌গির এটি বেছে নেবার উপায় খুঁজে নেন। টলেমির তত্ত্ব এরপর আর চলেনি। একেবারেই সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত আধুনিক সব বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন মহাবিশ্ব সম্পর্কে একই সঙ্গে দুটি তত্ত্বকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো– তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী কেউ এটিকে কেউ ওটিকে সত্য বলে ধরে নিচ্ছিলেন। এগুলোর একটি হলো বিগ ব্যাং তত্ত্ব যা সুদূর অতীতে একটি মুহূর্তে শূন্যের মধ্য থেকে মহাবিশ্বের জন্মের কথা বলে, আর অন্য হলো স্টিডি স্টেট থিওরি যা মহাবিশ্ব চিরকাল একই রকম রয়েছে এমন কথা বলে। উভয় তত্ত্বের পক্ষেই জোরালো যুক্তি ছিল এবং প্রকৃতির অনেক পর্যবেক্ষিত তথ্য উভয়টি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিলো। কিন্তু গত ষাটের দশকে এরও স্পষ্ট নিষ্পত্তি হয়ে যায়, বিগব্যাং তত্ত্বটিই হলো সত্যি তত্ত্ব, অন্যটি নয়। পরস্পর সাংঘর্ষিক দুটি তত্ত্ব বিজ্ঞানে থাকতে পারেনা।

মাঝে মাঝে অবশ্য কেউ কেউ একই তত্ত্বের একই ফলাফল পেতে গিয়ে দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার উপস্থিতিকে ভুল ভাবে সাংঘর্ষিক বলে উপস্থাপন করেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুটিই পৃথক দুটি প্রক্রিয়া, দুটিই ক্ষেত্র বিশেষে ঘটে থাকে, এবং কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব। এখানে লক্ষণীয় যে প্রক্রিয়া দুটি পৃথক, বলা যায় সমান্তরাল; কিন্তু একটি ঘটতে পারলে অন্যটি ঘটতে পারবেনা সেভাবে পরস্পর সাংঘর্ষিক নয় মোটেই। যেমন বিবর্তন তত্ত্বকে ডারউইন যেভাবে আবিষ্কার করেছেন তাতে দৈবক্রমে সৃষ্ট নানা মিউট্যাশন থেকে যেটি সংকটের সময় প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে সেটিই অধিক বেঁচে থাকা ও অধিক সন্তান দানের মাধ্যমে বেশি বিস্তৃতি লাভ

করে। পরে দেখা যায় মূলত পুরো প্রজাতিটিই ওই মিউট্যাশনের গুণ লাভ করেছে, এমনকি তা ভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন, এবং অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা গেছে এই প্রক্রিয়াতেই প্রধানত প্রজাতির বদল হয়।

পরে সাম্প্রতিক কালে আরো একটি প্রক্রিয়াতে প্রজাতি বদল হতে দেখা গেছে, অর্থাৎ সেটিও হতে পারে বিবর্তনের একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, আমরা অসংখ্যবার একটি মুদ্র টস্ করলে সম্ভাবনার নিয়মে ঠিক নিশ্চিন্ত থাকতে পারি, যে প্রায় হুবহু মোট সংখ্যার অর্ধেকটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৫০% ক্ষেত্রে 'হেড' ক্ষেত্রে 'হেড', পড়বে। কিন্তু এই টস্ করার সংখ্যাটিকে যদি কমিয়ে অল্প কয়েকবারে পরিণত করি তখন ৭৫% ক্ষেত্রে এমনকি ১০০% ক্ষেত্রে 'হেড' পড়াটিও অবাক করার কিছু হয়না যেমন ৪ বার টস্ করে ৩ বারই হেড পেলাম, অর্থাৎ ৭৫% হেড এলো। তেমনি কোন কারণে কোন প্রাণীর বড় একটি জনসংখ্যা থেকে খুব ছোট একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, যেমন কোন নতুন দ্বীপে চলে গেলে, সেই ছোট দলের মধ্যে কোন একটি মিউট্যাশনের আনুপাতিক সংখ্যা দৈবক্রমে অনেক বেশি হতে পারে- এমনকি ১০০% এর কাছাকাছি, যেভাবে ১০০% এর কাছাকাছি বার 'হেড' পড়েছিলো সে রকমই দৈবক্রমে। ধরা যাক সেটি সবুজ রঙের চোখ হবার মিউট্যাশন। আগের বড় জনসংখ্যায় অসংখ্য খয়েরী রঙের চোখের মধ্যে অল্প কিছু সবুজ রঙের মিউট্যাশন ছিল। এখন দৈবক্রমে ওই দ্বীপ আটকা পড়া ছোট জনসংখ্যার প্রায় সবাই সবুজ রঙের হলো। এরপর থেকে দ্বীপের মানুষের মধ্যে সবুজ রঙের চোখ নিয়ে বাচ্চা হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। এমন কি আগে থেকে সেখানে অন্য রঙের চোখের মানুষ থাকলেও আগন্তকদের নিজেদের মধ্যে বিয়েশাদি যদি বেশি হয় তা হলে সবুজ রঙের চোখের সংখ্যা সেখানে ক্রমে বাড়তেই থাকবে। একে বলা যায় ওই বিশেষ মিউট্যাশনের দিকে ব্যাপারটা ঝুঁকে পড়েছে– এরপর এরকম জনসংখ্যাই সৃষ্টি হবে। এই ঝুঁকে পড়াটি হলো ড্রিফট করা– তাই একে বলে জেনেটিক ড্রিফ্ট। এভাবেও খয়েরি রঙের চোখের মানুষ সবুজ রঙের চোখের মানুষে বিবর্তিত হতে পারে– বিবর্তনের এটিও একটি পৃথক প্রক্রিয়া। এই ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার কোন ব্যাপার নেই, প্রকৃতি কর্তৃক সবুজ চোখের রঙটি নির্বাচিতও হয়নি, এটি নেহাত সংখ্যাতত্ত্বের সম্ভাবনার দৈব নিয়মেরই একটি ফলশ্রুতি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিবর্তনের জন্য দুটি প্রক্রিয়াই কার্যকর হতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং জেনেটিক ড্রিফ্ট। অবশ্য খুব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই জেনেটিক ড্রিফ্ট এভাবে কাজ করতে পারে– যেমন জনসংখ্যা যখন অত্যন্ত কমে যায়, অথবা বিশেষ রকমের অভিবাসন ঘটে। সাধারণ ভাবে ব্যাপক পর্যায়ে বিবর্তনের কথা চিন্তা করলে প্রাকৃতিক নির্বাচনই বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি। জেনেটিক ড্রিফ্টের প্রক্রিয়াটি প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসরণ করেনা বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও কিছু নেই। একে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে খাটো করার জন্য যেমন ব্যবহার করা যায়না, তেমনি এখানে সমান্তরাল দুটি বিজ্ঞান আছে এমন কথাও বলা যায়না।

## এক একটি তত্ত্বের শুরু কোথায়?

**ঘটনাচক্রেই শুরু হতে পারেঃ**

অন্যান্য মহাকাব্যের মত বিজ্ঞানের মহাকাব্যেরও একটি সার্বিক কাঠামো বা বড় সীমান্ত যেন ঠিক করাই আছে– যুগে যুগে এই বড় মাপের সীমান্তকে লক্ষ্য করেই এটি রচিত হয়েছে। কিন্তু ছোট ছোট ভেতরের সীমান্তগুলো যেখানে সৃষ্টি হতে দেখেছি, অর্থাৎ গল্পের ভেতরে গল্প যখন লেখা হয়েছে, সেখানে তা পরবর্তী নানা সময়ে সুযোগমত নানা ভাবে এসেছে। একটি তত্ত্ব ওখানে কেন প্রয়োজন হলো, অর্থাৎ একটি নতুন গল্প কেন সৃষ্টি করতে হলো, এ সম্পর্কে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে আরো বহু রকম আইডিয়ার জন্ম হতে পারে তা আমরা দেখেছি, যত বেশি আইডিয়ার জন্ম হবে তত্ত্বটিকে তত ভাল বলে মনে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানীরা ওসব আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে পারেন এবং সেটির মধ্যে যদি সারবত্তা থাকে তা হলে তার গবেষণা ফলপ্রসূ হয়ে একটি নতুন তত্ত্বের জন্ম দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যুতের ও চুম্বকের যত আলাদা আলাদা তত্ত্ব এক সময় খাড়া হয়েছিলো ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব তার সবগুলোকে এক জায়গায় এনে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ধারণাটি সৃষ্টি করেছিলেন। সেখান থেকে বহু রকম নতুন আইডিয়ার একটি ছিল বিদ্যুৎ-চুম্বকের ব্যবহার করে বেতারে দূরে তরঙ্গ পাঠানো অর্থাৎ রেডিও বিজ্ঞান। এরপর এটি রেডিও বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্সের নানা কাজের জন্ম দিয়ে কতদিকে কত নতুন নতুন জগত সৃষ্টি করেছে আজ আমরা সবাই তার সুবিধাভোগী।

তবে এভাবে এক তত্ত্ব থেকে নতুন তত্ত্বে যাওয়াটাই বিজ্ঞানের সব নয়। নতুন গল্প শুরুর আরো অনেক পথ আছে। তার মধ্যে অবাক কাণ্ড হলো যখন একেবারে নেহাৎ ঘটনাচক্রেই অপ্রত্যাশিত ভাবে এর সুযোগ হাতে চলে আসে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ওভাবেই অনেক নতুন সীমান্তের সৃষ্টি হয়েছে নেহাৎ দৈবক্রমে। এক্স রে আবিষ্কারের কাহিনীটি দেখি। এই অদ্ভুত ভেদ করার ক্ষমতা সম্পন্ন রশ্মিটি যাঁর হাতে যে ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিলো সেই জার্মান বিজ্ঞানী রোয়েন্টগেনের কোন উদ্দেশ্য ছিলনা এমন কিছু করার। ১৮৯৫ সালে তিনি তাঁর এক্সপেরিমেন্টের আয়োজনটি করেছিলেন ইতোমধ্যে পরিচিত ক্যাথোড রে নামের রশ্মির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য। এই রশ্মিটি ইলেকট্রনের একটি প্রবাহ যা বায়ুশূন্য কাচ নলে ক্যাথোড আর এনোড নামের দুটি ধাতব ইলেকট্রোডের মাঝখানে প্রবাহিত। রোয়েন্টগেন দেখতে চাচ্ছিলেন এই ইলেকট্রনের কিছু কাচের নল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে কিনা। সেই পরীক্ষাটি করার জন্য তিনি আপাতত পুরু কালো কাগজ দিয়ে কাচ নলটি আগাগোড়া ঢেকে রেখেছিলেন। ওটির কাছেই একটি ফ্লোরোসেন্ট পর্দা রাখা হয়েছিলো যাতে ইলেকট্রন পড়লে আলো দেখা দিয়ে তা জানিয়ে দেবে। কালো কাগজে ছিদ্র করে ওটি দেখার আগেই ঘটলো ঘটনা। ওই অবস্থাতেই কাচ নলের ইলেকট্রোডের মাঝখানে উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে দেখা গেলো ওই ফ্লোরোসেন্ট পর্দায় আলো ফুটে ওঠেছে অর্থাৎ কিছু একটি রশ্মি কাচ নল আর কাগজ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। কৌতুহল বশত ফ্লোরোসেন্ট পর্দার ওপর নানা রকম জিনিসের বাধা রেখে রশ্মিটিকে আটকাবার চেষ্টা করলেন, দেখা গেলা ধাতব পাত বা ওরকম কঠিন ও পুরু জিনিস ছাড়া বাকি সব কিছুকে ভেদ করে রশ্মিটি ফ্লোরোসেন্ট পর্দায় পৌছতে পারছে এই বিস্ময়কর ভেদকারী রশ্মি। রোয়েন্টগেন ও জায়গায় তাঁর হাত রাখলে দেখা গেল হাতের মাংসের মধ্য দিয়ে চলে গিয়ে ওটি হাতের কিছুটা ম্রিয়মান আলোর ইমেজ পর্দায় ফেললো কিন্তু হাড়ের মধ্যে রশ্মি পুরো আটকে গেলো বলে তার ভেতর হাড়ের স্পষ্ট ছায়া স্পষ্ট দেখা গেলো– হাড়ের সকল খুঁটিনাটি সহ। রশ্মিটি একেবারেই অজানা জিনিস বলে এর নাম দেয়া হলো এক্স রে বা এক্স রশ্মি।

এটি কেন কী ভাবে তৈরি হচ্ছে তার কোন ধারণা এখনো না পাওয়া গেলেও ওভাবে হাড়ের ছবি দেখা যাওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর দারুণ কার্যকারিতা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়লো, দুর্ঘটনায় হাড় ভাঙ্গা ইত্যাদি চট করে বুঝে ফেলার জন্য। এক্স রে'র এই ব্যবহার তাই তখুনি শুরু হয়ে গেলো,

শরীরে ওপর যথেচ্ছভাবে অনেক্ষণ ধরে এক্স রে'র ব্যবহার যে কত বড় ক্ষতি করতে পারে তাও এরপর অনেকদিন অজানা ছিল। কিন্তু সেই যে ব্যাপারটি ঘটনাচক্রে আবিষ্কার হলো সেটি তখন থেকেই বিজ্ঞানের একটি নতুন দিক উন্মোচিত করলো যা একেবারে সম্প্রতি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সি টি স্ক্যান ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাজে লাগলেও এই আকস্মিক আবিষ্কারটি এসেছে মূলত পদার্থবিদ্যায়, এবং সেই বিজ্ঞানে আরো বিভিন্ন রকম অনেক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।

বিশুদ্ধ জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনাচক্রে আবিষ্কার আরো ঘটেছে– এমনকি তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি অসংখ্য মানুষের জীবন রক্ষা করছে। ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডে এক হাসপাতালের বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ছোট ছোট কাচের ডিশে জীবাণুর খাবার হিসেবে পুষ্টিদ্রব্য রেখে তাতে জীবাণু বৃদ্ধির ব্যাপারটি পরীক্ষা করছিলেন। স্ট্রেপটোকক্কাস ধরনের এই জীবাণু নিউমোনিয়া, গনোরিয়া, গলার ঘা ইত্যাদির মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে বলে এ জীবাণুর আচরণ জানা দরকার ছিল। এভাবে জীবাণু নানা ডিশে রেখে দু'সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে আসার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে কয়েকটি ডিশ অকার্যকর হয়ে গেছে কারণ ওখানকার জীবাণুগুলো খাবার সহ গলে গেছে। ওগুলো ধুয়ে পরিস্কার করার সময় ফ্লেমিং লক্ষ্য করলেন যে ওই ডিশগুলোতে আসলে ফেলে রাখার ফলে ছত্রাক (ছাতা) জমেছে আর ডিশের যেদিকে সেই ছত্রাক সেদিকেই শুধু জীবাণু মরে গলে গেছে। যে চিন্তাটি ফ্লেমিঙের মাথায় ঝিলিক দিয়ে গেলো তা হলো ওই ছত্রাকটি এমন কিছু বিষাক্ত জিনিস তৈরি করেছে যা স্টেপটোকক্কাস জীবাণুকে মেরে গলিয়ে ফেল্‌তে পেরেছে। যেই না ভাবা ফ্লেমিং তাঁর আসল এক্সপেরিমেন্টের কাজ বাদ দিয়ে এই নস্ট হয়ে যাওয়া ডিশগুলো নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। জেনে ফেল্‌লেন বাতাস থেকে যে ছত্রাকটি জমে এই কাজ কচ্ছে সেটি পেনিসিলিয়াম নামক একটি ছত্রাক। তাই যে জীবাণু ধ্বংসকারী বিষাক্ত জিনিসটি তৈরি করে বলে কল্পনা করা হয়েছে তার নাম দেয়া হলো পেনিসিলিন। অবশ্য এখনই এই পেনিসিলিনকে ছত্রাকটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করা গেলনা যাতে আক্রান্ত ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করে জীবাণুনাশক এন্টিবায়োটিক হিসেবে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করা যাবে। তবে ফ্লেমিং যতটুকু জেনেছেন তার ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাকি বিষয়টিকে বিজ্ঞানী জগতে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

এর ওপর ভিত্তি করেই পরে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বড় আকারে পেনিসিলিয়াম ছত্রাক চাষ ও তার থেকে পেনিসিলিনকে নিরাপদ ওষুধ হিসেবে উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে এভাবে ব্যাপক ভাবে পাওয়া এই প্রথম এন্টিবায়োটিক অসংখ্য আহত ও রোগাক্রান্ত মানুষকে প্রদাহজনিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। নষ্ট কাজের একটি সামান্য ঘটনার মাধ্যমে যার প্রথম আবিষ্কার সেই এন্টিবায়োটিক ওষুধের বিজ্ঞান পেনিসিলিনকে ছাড়িয়ে আরো নানা রকম বৈচিত্রে বিকশিত হয়েছে যেগুলো আরো দারুণ কার্যকর। ব্যাপক ব্যবহারে জীবাণু এক একটি এন্টিবায়োটিকে অভ্যস্ত হয়ে পড়াতে ওটির কার্যকারিতা কমে যায়। তখন সম্পূর্ণ নতুন এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের জন্য গবেষণা শুরু করতে হয়। এভাবেই বহু এন্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে– বিজ্ঞানের একটি খুব ব্যস্ত শাখা কাজ করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ ঘটনাচক্রে যে বিজ্ঞানের এমন একটি সীমান্ত সৃষ্টি সম্ভব এটি তার একটি চমকপ্রদ উদাহরণ।

**সমস্যা সমাধান করতে গিয়েঃ**

বিজ্ঞানের অধিকাংশ আবিষ্কার অবশ্য কাকতালীয় ভাবে হয়না, একেবারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কোন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হয়; অর্থাৎ কিনা কাকতালীয়ের ঠিক উল্টো কারণে। সমস্যাটি হযতো অনেক পুরানো, অথবা এটি হয়তো হঠাৎ করে দেখা দিয়েছে। হঠাৎ দেখা দেয়ার উদাহরণ হিসেবে আমরা তাপের প্রকৃতি কীভাবে আবিষ্কৃত হলো সেটি উল্লেখ করতে পারি। দীর্ঘদিন ধরে তাপের কেলোরিফিক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত ছিল যাতে তাপকে একটি অদৃশ্য তরলের মত মনে করা হতো। এ তরলের তল যেখানে উঁচু সেখান থেকে নিচু তলের দিকে তরলটি প্রবাহিত হওয়াটি উচ্চ উত্তাপ থেকে তাপ নিম্ন উত্তাপের দিকে প্রবাহিত হবার মত। এই তত্ত্বকে নিয়ে এমন কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা যে এর পরিবর্তে অন্য কোন তত্ত্ব প্রয়োজন হবে, এ জন্য কোন চেষ্টাও ছিলনা। কিন্তু সেনাপতি বিজ্ঞানী কাউন্ট রামফোর্ড কামান তৈরির সময় যতই কামানের নলটি খোদাই করার জন্য নিরেট লোহার সিলিন্ডারে ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত করা হচ্ছিলো ততই তাপ তৈরি হতে দেখ্ছিলেন। এটি তাঁকে ভাবনায় ফেলেছিলো– ভোতা ড্রিল ধাতুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেটে কেটে কেলোরিক (তাপ) বের করবে এটি আশা করা যায়না, অথচ ড্রিল যতক্ষণ ঘোরে তাপ ততই অন্তহীন ভাবে বের হয়। তিনি বুঝতে পারলেন ড্রিলের ঘর্ষণ করা গতিই

তাপ সৃষ্টি করছে। গতি এবং তাপ একই জিনিস। রামফোর্ডের এই চিন্তা থেকে দ্রুত তাপের আজকের তত্ত্ব তার গতীয় তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। সমস্যাটি তাৎক্ষণিক ভাবে দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করতে গিয়ে নতুন চিন্তা, নতুন তত্ত্ব এসেছে।

অতিপরিবাহিতা ব্যাপারটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বিসিএস থিওরি নামে যে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তাও অতিপরিবাহিতার অদ্ভুত ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার সমস্য থেকেই এসছে। পঞ্চাশ বছরের মত সময় ধরে এই সমস্যা বজায় ছিল, এই পুরো সময় সমাধানের চেষ্টাও চলেছে। এই সব কাজ হয়েছে সম্পূর্ণ লক্ষ্যনিষ্ঠ ভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য। এখানে কাকতালীয় হবার মতো কিছু ছিলনা। এমনি ভাবে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে নানা দিক থেকে কোন সমস্যাকে লক্ষ্য করে। ওই অতিপরিবাহিতার কথাটাই আরেকটু দেখা যাক। বিসিএস তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবার পর ধরেই নেয়া গিয়েছিলো যে অতিপরিবাহিতার ব্যাপারটি খুব নিম্ন উত্তাপেই শুধু ঘটবে। কিন্তু ওই তত্ত্ব আসার ত্রিশ বছরের মধ্যে দেখা গেলো সিরামিক জাতীয় কিছু মিশ্র বস্তু সচরাচর রূপান্তর উত্তাপের থেকে বেশ খানিকটা ওপরের উত্তাপেই অতিপরিবাহী হয়ে পড়েছে। তখনো যথেষ্ট ঠাণ্ডা অবস্থায় হলেও তাই ওই ব্যাপারটিকে একটু আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে হলো উচ্চ-উত্তাপ অতি পরিবাহিতা হিসেবে। যদিও উচ্চ উত্তাপ আসলে নয়, তবে আগেরগুলোর থেকে উচ্চতো বটেই, কারণ হাসপাতাল কারখানা ইত্যাদির মতো জায়গাতেই যেই তরল বাতাস বা তরল নাইট্রোজেন দেদার পাওয়া যায় সেই রকম ঠান্ডাতেই এখন অতিপরিবাহিতা পাওয়া যাচ্ছে- আগে যা শুধু বিশেষ নিম্নতাপ ল্যাবোরেটরির অতি নিম্ন উত্তাপেই শুধু সম্ভব হচ্ছিলো। এই রকম কম ঠাণ্ডায় যে অতিপরিবাহিতা তাকে তো বিসিএস থিওরি দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলেনা কারণ সেই তত্ত্বের মৌলিক ব্যাপারটিই খুবই নিম্ন উত্তাপ নির্ভর। কাজেই নতুন সমস্যা সামনে এলো তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর সামনেও, নতুন তত্ত্ব চাই যা উচ্চ উত্তাপের অতিপরিবাহিতাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে। এ যেন এক ধাঁধাঁর সমাধান হতে হতে আর এক ধাঁধাঁর সম্মূখীন হওয়া– এই সীমান্তেও তাই গল্পের ভাবনা চলতেই থাকে।

গল্পটি অত্যন্ত নাটকীয় হয়ে ওঠে যখন শুধু নতুন কোন ধাঁধাঁ দেখা দিয়েছে বলে নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত মহাকাব্যটিই সামগ্রিক ভাবে একটি সংকটে পড়ে যায়।

তখন সমস্যাটি মূল গল্পে গুরুতর চিড় ধরিয়ে দিয়েছে বলে এমন কোন অভাবনীয় সমাধানের চেষ্টা করতে হয় যাতে গল্পের খোল নল্‌চে বদলে ফেলে হলেও মূল মহাকাব্যটিকে মসৃণ ভাবে এগুতে দেয়া যায়। গত শতাব্দীর পদার্থবিদ্যায় এরকম ঘটনা অন্তত দু'বার ঘটেছে, দুটিতেই নিউটনের আমল থেকে যেই বিজ্ঞান মহাকাব্য আমাদের চিন্তায় চেতনায় ও সাফল্যে এক হয়ে গিয়েছিলো সেটিই সংকটে পড়াটাই ছিল কারণ। ওই সংকট সমাধান করতে গিয়ে একদিকে যেমন এসেছে আপেক্ষিক তত্ত্ব, অন্য দিকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব। প্রথমটিতে সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো স্থান ও কাল সম্পর্কে নতুন চিন্তা করতে গিয়ে যখন দেখা গেলো এই উভয় জিনিসই দর্শকের গতির আপেক্ষিকে এক এক জনের কাছে এক এক রকম হতে পারে, এবং আলোর গতি অদ্ভুত ভাবে দর্শকের যে কোন গতির মধ্যেই একই থাকে। এসব থেকে এলো সম্পূর্ণ নতুন সব সিদ্ধান্ত– পদার্থবিদ্যার খোল নলচে পাল্‌টে গেলো যা অনুভূত হলো আলোর গতির একই পর্যায়ের দ্রুত গতির ক্ষেত্রে এবং অত্যন্ত অধিক ভর সম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে। কোয়ান্টাম তত্ত্বও তেমনি এসছে ওই রকমই মস্ত কিছু সংকটের কারণে, আগের গল্পকে নিয়ে শুধু নয় গল্পের ভঙ্গিটি বজায় রেখেও আর এগুনো সম্ভব হচ্ছিলোনা। তাই আবারো অভাবনীয় ভাবে অনেক কিছু বদলাতে হলো- এটি করতে হলো অণু, এটম ইত্যাদি বা তারো থেকে ক্ষুদ্র সব কণিকার ক্ষেত্রে; ওগুলোকে কণিকা ও তরঙ্গ উভয় ভাবে দেখতে হলো, ওগুলোকে বড় বস্তুর মত গতির সময় বিন্দুতে বিন্দুতে অনুসরণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগকেও বাদ দিতে হলো- ভাবখানা এমন যেন ওরা সব বিন্দুতে সব মুহূর্তে থাকতে পারে, বিজ্ঞানী শুধু বলতে পারবেন কোন্ বিন্দুতে থাকার সম্ভাবনাটি কেমন। এসব মৌলিক পরিবর্তন আন্‌তে বাধ্য করেছে প্রকৃতিকে আরো সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে দেখার মাধ্যমে যে সংকট দেখা দিয়েছিলো তার সমাধান করতে গিয়ে।

সমস্যা বা সংকট সৃষ্টিতে যদিও হাতে কলমে এক্সপেটিমেন্টের খুব গুরুত্ব ছিল ওপরের উদাহরণগুলোতে যে সমস্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে নতুন বিজ্ঞানের অবতারণা হয়েছে তা তাত্ত্বিক, এবং নতুন তত্ত্ব সৃষ্টিতেই তার সমাধান হয়েছে। বিজ্ঞানের সীমান্তগুলো এভাবেই তত্ত্ব, সমস্যা, আবার তত্ত্ব এমনি ভাবে চলতে থাকে। কিন্তু কোন কোন সমস্যা প্রযুক্তির দিক থেকেও আসে। অতীতে এক সময় প্রযুক্তির অগ্রগতিগুলো বিজ্ঞানের তোয়াক্কা না করেই এগুতো– প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবনমূলক কৌশল অনুসরণেই সেগুলো চল্‌তো। কিন্তু আধুনিক কালে এসে প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রায়ই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেছে।

বিজ্ঞানের কাজ হলো অন্তর্নিহিত কার্য-কারণগুলো উদ্ঘাটন করা, যে প্রযুক্তি ইতোমধ্যে কাজ করছে তার ভেতরের বিষয়গুলো সম্পর্কেও এটি প্রযোজ্য। কোন কারণে প্রযুক্তিতে কী হচ্ছে সেটি জানা থাকলে তবে প্রযুক্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া সহজ হয়, এর কোথাও সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানও সহজ হয়। কাজেই বিজ্ঞানের অনেক নতুন গল্প সৃষ্টি হচ্ছে– প্রযুক্তির সমস্যার সমাধান করতে গিয়েও। যেমন লোহা আর ইস্পাত শিল্পের মত প্রযুক্তি নিজের থেকেই অনেক দূর এগিয়েছিলো। লোহা, বিশেষ করে পেটানো লোহা যথেষ্ট দৃঢ় ও শক্ত। লোহার অণুগুলোর মধ্যে বন্ধনের শক্তির নিরিখে লোহা যত শক্ত হওয়া উচিত এটি তার থেকে অনেক বেশি শক্ত। অন্য দিকে লোহার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন মেশানো থাকলে বিশুদ্ধ লোহার থেকে তা অনেক বেশি শক্ত ও দৃঢ় হয়, বিশেষ করে ইস্পাতের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। এগুলো করে করে দেখে দেখে প্রযুক্তিবিদরা কার্যকর করছিলেন বটে, কিন্তু এর পেছনের বিজ্ঞান জানা না থাকাতে অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছিলোনা, বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে প্রযুক্তির পরীক্ষা নিরিক্ষাগুলো করা যাচ্ছিলোনা।

অবশেষে গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দিকে ধাতব কৃস্টালের মধ্যে নানা রকম ত্রুটির উপস্থিতি এবং তার ফলে তার দৃঢ়তার সক্ষমতাগুলোতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটার বিষয়ে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। তত্ত্বটি কঠিন পদার্থের বিজ্ঞানের হলেও এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি এসেছে বিজ্ঞানের দিক থেকে নয়, বরং প্রযুক্তির দিকে থেকে। এর ফলে প্রযুক্তিতে ঘটা বিষয়গুলো বোঝা গেছে। কৃস্টালে অণুগুলো সঠিক দূরত্ব পর পর সঠিক বিন্দুতে অবস্থান করে। তবে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মেই ওরকম কিছু বিন্দু খালি থাকে অথবা কোন দুই বিন্দুর মাঝখানে বাড়তি অণু থাকে। এই উভয়কেই বলা যায় বিন্দু ত্রুটি– কারণ কৃস্টালের একেবারে বিশুদ্ধ রূপের ক্ষেত্রে এগুলো এক রকম ব্যতিক্রম, তাই সেটি ত্রুটি আর তা ঘট্ছে এক একটি বিন্দুতে। এছাড়া আরো এক রকম ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়েছে যা বিন্দুতে নয় বরং কাজ করে রেখায়। পর পর অণুতে গড়া পরস্পরের মধ্যে সমান দূরত্বে তলগুলো কৃস্টালের সব দিকেই কল্পনা করা যায়। বাইরের পীড়নে এই তলগুলোর মধ্যে এমন বিকৃতি যদি ঘটে যে অংশত একটি বাড়তি তলের সৃষ্টি হয় যা অন্য অংশে হয়না, তখন কৃস্টালের বিকৃতিটি একটি রেখার আকারে দেখা দেয়, যেই রেখাটি চাপের মুখে কৃস্টালের ভেতর দিয়ে নড়াচড়া করতে পারে। শেষ অবধি দেখা যায় এই বিকৃতি রেখাগুলোর নড়াচড়াটিই ধাতুর কৃস্টালকে দুর্বল করে, এর একাংশ আরেক অংশের ওপর

দিয়ে গড়িয়ে একে বাঁকিয়ে ফেলা সহজ করে। বিকৃতির সংখ্যা বাড়লে, সেগুলোর নড়চড়া বাড়লে ধাতুর দৃঢ়তা কমে, সে সব না হলে দৃঢ়তা বাড়ে। একে পেটালে বিকৃতি রেখাগুলো এলোমেলো সরে গিয়ে জট বেঁধে যায়, সহজে নড়তে পারেনা। তাই ধাতু শক্ত হয়। বিকৃতি নড়ার মুখে যদি বিন্দু ত্রুটি থাকে তা হলেও ওটি আর এগোতে পারেনা। বাইরের থেকে ঢুকানো দূষণ অণু কৃস্টালে মিশে যেতে পারেনা, বিন্দু ত্রুটি হিসেবে থেকে যায়– যেমন লোহার মধ্যে কার্বনের দূষণ। বিকৃতি রেখার সরন কমিয়ে ওটিও তখন লোহাকে শক্ত করে। এভাবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রযুক্তির সমস্যার সমাধান করার কাজ করেছে বল্‌তে গেলে ওই সমস্যার মধ্যেই এই ধরনের গবেষণার সূত্রপাত করেছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এমনি প্রধানত প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের বিশাল আয়োজনের একটি অত্যন্ত নাটকীয় উদাহরণ হলো যত দ্রুত সম্ভব নিউক্লিয়ার শক্তি ভিত্তিক বোমা তৈরির লক্ষ্যে। নিউক্লিয়ার শক্তির মূল নীতিটি ১৯৩৮ সালে জার্মানীতে আবিষ্কৃত হয়েছিলো, যখন ওটো হান এবং লিজ মাইটনার এই দুজন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে ভারি সুবিধাজনক নিউক্লিয়াসকে ধীর গতির নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ওই ভারি নিউক্লিয়াসটি নিউট্রনকে শোষণ করে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং এটিকে দুটি নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে ফেলে। এই ভাঙ্গনটি ফিশন প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। এর ফলে অল্প কিছু নিউক্লিয়ার শক্তি নির্গত হয়। এখন এটিকে বড় কোন শক্তি উৎস বা অস্ত্র হিসেবে তখন চিন্তা না করা হলেও পরের বছর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর মিত্র পক্ষের বিজ্ঞানীরা এরকম একটি বোমার দিকে জার্মানীই এগিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। প্রধানত তাঁদের অনুরোধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্র পক্ষের নানা দেশের প্রাসঙ্গিক বহু বিজ্ঞানীকে একত্রিত করে একটি অত্যন্ত জরুরী বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হাতে নেবার ব্যবস্থা করে, যা প্রজেক্ট ম্যানহাটান নামে পরিচিত।

তার আগে আগেই অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি গবেষণায় সেখানেই প্রমাণিত হয়েছিলো যে একটি নিউক্লিয়াসে ফিশন সৃষ্টি করলে আর ওখানে যদি একটি ন্যূনতম ভরের ওই ভারী নিউক্লিয়াসের ফিশনযোগ্য বস্তু থাকে তা হলে একটি ভাঙ্গন থেকে আরো নিউট্রন বের হয়ে আশপাশের আরো নিউক্লিয়াসে ফিশন ঘটাতে পারে এবং অতি দ্রুত এটি ক্রমে বেশি বেশি নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার যে ঘটনা (চেইন রিয়্যাকশন) ঘটে তাতে বিশাল

পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয়। ওই প্রাথমিক ব্যবস্থায় একটি নিয়ন্ত্রক দণ্ড ভাঙ্গার নিউট্রনগুলো দ্রুত শোষণ করে নিয়ে প্রক্রিয়াটি থামিয়ে দিতে পেরেছিলো বলেই রক্ষা। কিন্তু মূল যে লক্ষ্য সেই কার্যকর বোমা তৈরির পথে তখনো ছিলো আরো বহু রকমের প্রযুক্তিগত সমস্যা– যার সমাধানে মুক্ত বিশ্বের অনেক সেরা বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। এর কারণ ওই প্রযুক্তিগত সমস্যার অনেকগুলোর সমাধান নতুন সব বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটনের মাধ্যমেই শুধু আসতে পারতো। তারই আয়োজন হয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে নিউ মেক্সিকোর লস আলামোস নামক স্থানে। এখানেই একে একে সেই বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো সমাধান করে করে শেষ পর্যন্ত একটি পরীক্ষামূলক বোমা কাছের মরুভূমিতে বিস্ফোরিত করে সমস্যাগুলো সমাধানে সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিলো। এই বিশাল বৈজ্ঞানিক আয়োজনের পেছনে ছিল বোমা সম্পর্কিত ওই সব প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান। এভাবে বিজ্ঞানকে পদে পদে নতুন বিষয়ে নিজেকে জড়াতে হয়েছে নতুন সমস্যা আসার কারণে। কখনো সমস্যাগুলো হয় গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে যেগুলোর সমাধান না করে বিজ্ঞানেরই এগুবার উপায় থাকেনা; আবার অনেকগুলো সমস্যা প্রযুক্তির দিক থেকেও আসে।

**নানা কিছু করে দেখাঃ**

বিজ্ঞানীরা আরো এক ভাবে নতুন বিজ্ঞানের সন্ধান পান, তা হলো নানা কিছু করে দেখতে দেখতে। যে কোন আইডিয়া, যে কোন একটি ঘটনা, বা যে কোন একটা নতুন বস্তুর সম্মুখীন হলে সেটিকে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা না করে পারেননা। তাঁরা দেখতে চান এ ধরনের বিবেচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন কিছু উন্মোচিত হয় কিনা। আগের কোন আইডিয়া, কোন ব্যবস্থা-পত্র, কোন সমস্যা একাজের কারণ নাও হতে পারে। পুরো ব্যাপারটি ঘটে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানী মন থেকে। নানা সম্ভাবনাকে নাড়াচাড়া করে নতুন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তা দেখাটাই উদ্দেশ্য। এ ধরনের নাড়াচাড়ায় আদৌ কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সেটি বেশ অনিশ্চিত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি চমৎকারভাবে কাজ করেছে। যেমন গ্লোবের ওপর নানা মহাদেশের আকৃতি দেখে বিজ্ঞানী ভেগনারের মনে হয়েছিলো যে পাশাপাশিখ কিন্তু দূরে থাকা মহাদেশগুলোকে পরস্পরের কাছে এনে প্রয়োজনে সামান্য ঘুরিয়ে নিলে এগুলো যেন প্রায় নিখুঁত ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ফিট্ করে যায়। এও নেহাৎ করে দেখা,

যেটি সফল হওয়াতে ভেগনার তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপে যেতে উৎসাহিত হয়েছেন– ওভাবে সংলগ্ন অবস্থায় দুপাশের কিনারার শিলার মধ্যে একটি নিরবিচ্ছিন্নতা দেখতে পাওয়া। এভাবে করে করে দেখার মাধ্যমে ভেগনার সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিলেন যে মহাদেশগুলো কোটি কোটি বছর ধরে একটু একটু করে নানা দিকে সরে যাচ্ছে।

ওটি ছিল একেবারেই তাত্ত্বিক কারণে করে করে দেখা। কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে খুবই কাজে লাগবে এমন জিনিসের খোঁজেও প্রায়ই দীর্ঘদিন ক্রমাগত করে করে দেখা ছাড়া উপায় থাকেনা। অতীতে ব্যাপারটি খুবই অনিশ্চিত ও পরিশ্রমসাধ্য ভাবে করতে হতো। যেমন ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিনের ওপর গবেষণাটি করতে করতে নানা দিকে কেমন করে বিস্তৃত হয়েছিলো দেখা যাক। এটি একটি প্রাকৃতিক ওষুধ সিনকোনা গাছের বাকলের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৮২০ সালে বিজ্ঞানীরা ওই বাকল থেকে কার্যকর ওষুধের অংশটি রাসায়নিক পদ্ধতিতে আলাদা ও বিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন– সেটিই কুইনিন অণু, আর সেটিই ম্যালেরিয়ার ওষুধ। কিন্তু এভাবে সিনকোনা গাছের বাকল থেকে আলাদা করে নিয়ে যে পরিমাণ কুইনিন পাওয়া সম্ভব তাতে বিশাল চাহিদা কিছুতেই মিট্‌তোনা। প্রয়োজন ছিল প্রাকৃতিক এই কুইনিনের গঠনটি উদ্ঘাটন করে কৃত্রিম সংশ্লেষণে তা তৈরি করা। এটি মোটেই সহজ কাজ ছিলনা– ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম পারকিন্স নামের একজন তরুণ ছাত্রকে এর চেষ্টা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। ওই দেখে দেখে করে করে এই রকম সেই রকম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া খুব বড় কোন পথ-নির্দেশ তাঁর সামনে ছিলনা। এরকম একটি চেষ্টায় পারকিন্স কুইনিনের অণুর কাছাকাছি রকম চারটি ভিন্ন অণুর একটি মিশ্রণ পেলেন– তবে কঠিন কুচকুচে কালো একটি পদার্থ হিসেবে তার যেই রূপ দেখলেন তাতে বুঝলেন এটি কুইনিন ওষুধের মতো কিছু হতে যাচ্ছেনা, এ যাত্রায়ও তাঁর করে দেখা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই মন খারাপ করে এলকোহল দিয়ে ফ্লাস্ক থেকে ওই কালো জিনিসটি ধুয়ে ফেল্‌তে যখন গেলেন তখনই চোখে পড়লো এক অবাক দৃশ্য– ফ্লাস্কে দেখা দিলো সুন্দর বেগুনী রঙের একটি তরল। তিনি বরং ওটি না ফেলে তা দিয়ে কিছু সিল্ক ও অন্যান্য কাপড়ের টুকরা রাঙিয়ে নিলেন। দেখলেন অত্যন্ত চমৎকার ভাবে রঙটি পাকা হয়ে কাপড়ে ধরেছে। কুইনিনের চিন্তা বাদ দিয়ে পারকিন বরং দুনিয়ার এই প্রথম সিনথেটিক রঙ (সংশ্লেষিত বা কৃত্রিম) নিয়ে লেগে পড়লেন। তখন অবধি

কাপড় রাঙাবার একমাত্র উপায় ছিল প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে; যেমন নীল রঙ পাওয়া যেতো শুধু নীল গাছের চাষ করে- যা ইংরেজরা আমাদের দেশের চাষীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। অন্যান্য রঙের ক্ষেত্রে আরো দুষ্প্রাপ্য প্রাকৃতিক জিনিস থেকে। এবার সাধারণ রাসায়নিক উপাদান থেকে রঙ তৈরির সুযোগ পুরো বস্ত্র শিল্পে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেল্‌লো- পারকিন্স তাঁর ওই কালো কঠিন বস্তুটিকে 'পারকিন্সের বেগুনী' এই নামে প্যাটেন্ট করে অতি ধনী মানুষে পরিণত হতে দেরি করেন নি। শুধু বেগুনি নয়, রঙের জৌলুষ ও কম দামের কারণে এভাবে তৈরি নানা রঙ শিগ্‌গির বাজার ছেয়ে ফেল্‌লো। কিন্তু যেটি নিয়ে করতে করতে এই বিরাট কর্মকাণ্ড শুরু হতে পেরেছিলো সেই কুইনিন সংশ্লেষণের কোন সুরাহা হয়নি।

কুইনিন সংশ্লেষণ সত্যি সত্যি সম্ভব হতে আরো প্রায় এক শ' বছর লেগে গিয়েছিলো– যদিও কখনো বিজ্ঞানীরা চেষ্টা ছাড়েননি। কিন্তু ইতোমধ্যে কুইনিনের ভালো বিকল্প ওষুধ চলে এসেছিলো, এবং মজার কথা হলো সেই বিকল্প এসেছিলো করে করে দেখে দেখে রঙ সংশ্লেষণের চেষ্টায়– যেনো রঙের গবেষণা ওষুধের গবেষণার কাছে তার পূর্ব ঋণ শোধ করে দিচ্ছিলো। ১৮৯১ সালে পল এল্‌রিখ রঙের আবিষ্কার করতে গিয়ে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলেন– তাঁর রঙ মেথিলিন ব্লু ম্যালেরিয়ার একটি ভাল ওষুধ। কিন্তু সমস্যা হলো এটি খেলে শরীরটাকে নীল রঙের করে ফেলতে চায় আর কাজও কুইনিনের মত এত ভাল করেনা। কিন্তু ওই সূত্র ধরেই আরো নানা কৃত্রিম রঙকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে দেখা গেলো, কোন কোনটা কুইনিনের মত ভালো কাজ করলেও এত বেশি ডোজে খেতে হতো যে তাতে শরীরে স্থায়ী রঙ দেখা যাওয়া ছাড়াও নানা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতো। এই সবই কিন্তু রাসায়নিক ভাবে কুইনিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশেষে এমনি ভাবে করে করে দেখে দেখে ১৯৩৫ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে ক্লোরোকুইন এবং কিছু পরে হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন। এগুলো রাঙানো বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কুইনিনের চেয়েও ভাল কাজ করে এবং এখনো প্রচলিত। তবে গবেষণা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে এই অর্থে যে এগুলো কেন ওষুধ হিসেবে কাজ করে, কেন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম তার কারণগুলো এখনো বোঝা যায়নি।

করে করে দেখে দেখে কোন কিছু উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হলেও কারণ জানার মূল কাজটি বাকি থেকে যেতে পারে– বিজ্ঞানে যেটি খুব দরকার। তাই ২০২০-

২১ সালে কোভিড-১৯ যখন বিশ্বমারী হিসেবে দেখা দিলো তখন শুরুতেই কেউ কেউ ম্যালেরিয়ার এই ওষুধকে কোভিডের বিরুদ্ধে কার্যকর বলে ঘোষণা দেন হয়তো এমনি ভাবে কিছু ক্ষেত্রে করে দেখে ফল পাওয়ার কারণে। বিশ্বমারীর প্রাথমিক ওই অসহায় সময়ে তাই কোথাও কোথাও বাজার থেকে ম্যালেরিয়ার এই ওষুধ আগেই কিনে রাখার হিড়িক লেগে যায়। এতে আরো ইন্ধন যোগালো কিছু প্রভাবশালী মানুষের অতিকথন। কোভিডের বিরুদ্ধে এই ওষুধের কার্যকারিতা ও তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হবার আগেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জোরেশোরে বলতে শরু করলেন যে আর ভয় নেই কোভিডের ওষুধ এসে গেছে, তিনি নিজেই এটি এমনি এমনি আগে থেকে খাচ্ছেন, যেন কোভিড না হয়– যার সবই অবৈজ্ঞানিক কথা ও কাজ। পরে দেখা গেছে ক্লোরোকুইনের কোভিড সারানোর প্রমাণ ছিল খুবই ভাসা ভাসা, ভুল এবং বিপজ্জনক।

আজকাল অবশ্য সাধারণ ভাবে অণুসংশ্লেষণ এতটা পরিশ্রম সহকারে, অনেক সময় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত করে করতে হয়না। এর তত্ত্ব ও অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশেষ ধরনের অণুসংশ্লেষণের জন্য বিশাল সব ডিজিট্যাল তথ্য ভাণ্ডার গড়ে ওঠেছে। ওষুধ খুঁজে পাবার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট ভূমিকা রাখে, তাছাড়া নতুন নতুন প্লাস্টিক, পলিমার, ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে ইত্যাদির উদ্ভাবনে ওরকম তথ্য ভান্ডার ও কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার সহায়ক হচ্ছে। তারপরেও দেখছি জনস্বাস্থ্যের মত গুরুতর বিষয়ে আমাদেরকে করে করে দেখার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাতে অভাবনীয় ফল পাওয়া গেছে শুধু বার বার ব্যর্থ হয়ে ঠেকে ঠেকে করে দেখে কাজ করার মাধ্যমেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বলেও প্রমাণিত হয়েছে। তবে বিজ্ঞানের মহাকাব্যে এমনি ভাবে কাহিনী সৃষ্টির সুযোগ যে রয়েছে তা বলা বাহুল্য।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আরো বেশি ঘটে। বিখ্যাত উদ্ভাবক টমাস এডিসনের কিছু কিছু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই চেষ্টা রীতিমত কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের চিরপরিচিত ইলেকট্রিক লাইট বাল্‌বের কথাটাই ধরা যাক। এর নীতিটি জানা ছিল কোন উচ্চরোধ সম্পন্ন তারের (ফিলামেন্ট) মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করলে রোধ ঠেলে যেতে হয় বলে তারটি খুব উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করবে। পুড়ে না যাওয়ার জন্য তারটি একটি বদ্ধ বায়ুশূন্য

কাচপাত্রে থাকা উচিত- ওটিই বাল্‌ব। সমস্যাটি হলো সঠিক তার খুঁজে পাওয়া– উচ্চ রোধক হবে, সহজে গলে ছিড়ে যাবেনা; আর বাল্‌বে বায়ুশূন্যতা বজায় রাখা। অন্য উদ্ভাবকরা চেষ্টা করেও সফল হচ্ছিলেননা। এডিসন ও তাঁর গবেষণাগারের সহযোগীরাও চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। বিশেষ করে বাল্বের ভেতর আলো দেবার ফিলামেন্ট হিসেবে তিনি সম্ভাব্য হেন কোন জিনিস নেই যা নিয়ে চেষ্টা করেননি- যার মধ্যে ধাতু, অধাতু, প্রাকৃতিক, কৃত্রিম সব কিছু ছিল। অবশেষে ১৮৭৮ সালে তিনি এর যে প্যাটেন্ট করলেন তাতে পাকানো তুলাকে পুড়ে সরু কার্বন-অঙ্গারের মত করে নেয়া হয়েছে। তবে এটি খুব যুৎসই হলোনা– আবার নানা জিনিস নিয়ে চেষ্টা চল্‌লো, শেষ পর্যন্ত যেটি যথেষ্ট সফল হলো তা হলো বাঁশ থেকে সূতার আকৃতির কিছুটা নিয়ে তাকে পুড়ে অঙ্গার করে তা দিয়ে ফিলামেন্ট তৈরি। এভাবে বাল্‌বের মধ্যে বাঁশের পোড়ানো সূতাকে তিনি একটানা ১২০০ ঘন্টা পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখতে পারলেন। ১৮৮০ সাল থেকে এটি বহুদিন ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে– সবই করে করে দেখার ফলে উদ্ভাবিত। আমরা এখন যে ফিলামেন্ট দেখি তা টাংস্টেন ধাতুর তৈরি যার গলে যাওয়ার উত্তাপ ৩০০০ ডিগ্রির মত উচ্চ উত্তাপ হওয়াতে নির্ভয়ে তাকে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল করে তোলা যায়। এটি ১৯০৬ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীতে উদ্ভাবিত হয়েছিলো। এডিসন টাংস্টেনের এই গুণের কথা জানতেন– কিন্তু তখন তাঁর কাছে একে তারে রূপ দেবার কোন উপায় জানা ছিলনা।

এডিসনের এলকেলাইন ব্যাটারি উদ্ভাবনের ব্যাপারটিও তেমনি ভাবে একটানা চেষ্টা করার ফল। ১৮৮০ সালে তাঁর মাথায় এসেছিলো ব্যাটারির বিদ্যুৎ দিয়ে পুরো শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার আইডিয়া। কিন্তু পরে দেখা গেছে সেই কাজে ব্যাটারি নয় বরং জেনারেটর তৈরি বার বার দিক-পরিবর্তী (অলটারনেটিং) বিদ্যুতই বেশি উপযোগী। এখন তিনি ভাবলেন মোটর গাড়ি চালাতে হবে ব্যাটারি দিয়ে বিদ্যুতে; যদিও তখন ইঞ্জিন চালিত গাড়ি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিলো সেই ১৮৯০ সালের দিকে। সীসা আর সালফিউরিক এসিডের (লেড-এসিড) যেই রিচার্জেবল ব্যাটারি আজ অবধি একমাত্র ব্যাপক ব্যবহৃত ব্যাটারি, সেটি তখনো তাই ছিল। কিন্তু বৈদ্যুতিক গাড়ি চালাবার জন্য ব্যাটারিকে হতে হবে হালকা, বার বার পানি দাও, এসিড দাও এমন হলে চলবেনা। সেই যে ভাবা তিনি নতুন রকম ব্যাটারি তৈরির জন্য হেন কিছু নেই যা দিয়ে চেষ্টা করে করে দেখেননি। বছরের পর বছর এই কাজ করে গিয়ে অবশেষে তিনি এসিডের বদলে এলকেলী তরল ও সীসার বদলে আয়রন-

নিকেল ব্যবহার করে এলকেলাইন ব্যাটারি উদ্ভাবন করলেন। এটি ওজনে অপেক্ষাকৃত হালকা, বেশি স্থায়ী ও দক্ষ, ইলেকট্রিক কারের জন্য বেশি উপযুক্ত। কিন্তু হায় ততদিনে ১৯০০ শতকের বেশ কিছু বছর গড়িয়ে গেছে, পেট্রোলে চালিত ইঞ্জিনের মোটর গাড়ি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, প্রচুর পরিমাণে তৈরিও হচ্ছে। ইলেকট্রিক কারের কথা কেউ কানেই তুল্‌লোনা। এডিসন অন্যান্য শিল্পে তাঁর এলকেলাইন ব্যাটারি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মূলস্রোতে লেড এসিড ব্যাটারিটাই টিকে রইলো। এডিসনের স্বপ্নের ও পরিশ্রমের ফলটি আমরা দেখতে পাচ্ছি শতাব্দী ঘুরে যাবার পর একুবিংশ শতাব্দীতে এসে। এলকেলাইন ব্যাটারি সহ আরো নতুন ও দক্ষ ব্যাটারি বিশেষ করে লিথিয়াম ব্যাটারি এখন আবার গাড়িকে ইঞ্জিনচালিত রূপ থেকে ইলেকট্রিক কারের রূপে ফেরৎ নিয়ে যাবার উপক্রম করেছে। এবার উদ্দীপনাটি এসেছে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের সংকল্প থেকে।

## অলৌকিকতার কোন স্থান নেই

নানা ভাবে নানা কাহিনীর সূত্রপাত বিজ্ঞানের মহাকাব্যে হয়েছে; কিন্তু সাহিত্যের মহাকাব্যের সঙ্গে তার একটি বড় পার্থক্য হলো তার কোথাও অলৌকিক কোন কাহিনীর স্থান হয়নি। যেই কাহিনীই আসুক তার বাস্তব ভিত্তি দরকার হয়েছে, অন্য ভাবে কিছু নয়। কাহিনীকে একের পর এক বিজ্ঞানের শর্ত পূরণ করে এগুতে হয়েছে। যেমন ওটি রচনার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে সবাই বলেছে এটি যে মিথ্যাও হতে পারে এর মধ্যে সেটি প্রমাণের সুযোগ আছে কিনা দেখিয়ে দাও। যদি সে রকম সুযোগ না থাকে তাহলে এই মহাকাব্যে তার জায়গা নেই। মিথ্যা প্রমাণিত হলে এখনো তার জায়গা থাকবেনা, তবে সুযোগটাই যদি না থাকে তা হলে প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার আগেই সেটিকে বাদ দিতে হবে। অলৌকিক কাহিনী তো অলোকিকই– তার আবার পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণের প্রশ্ন কোথায়? বড় জোর জাদু-মন্ত্রের দোহাই দেয়া যেতে পারে। সাহিত্যে এটি দোষ নয়- সেখানে এটি মনের আবেগ, বিশ্বাস ইত্যাদির রূপ নিয়ে একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের কস্টি পাথরে এটি টিকবেনা, বর্জিত হবে। এখানে ভাষা দিয়ে, আবেগ দিয়ে, বর্ণনার গভীরতা দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক শর্ত পূরণকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু শেষ অবধি ওর মধ্যে জাদু-মন্ত্রের মত ব্যাপারটি বিজ্ঞানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, সে রকম বিজ্ঞান অচল বলে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এরিস্টোটল যখন পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বছবির তত্ত্ব দিয়েছেন তা তিনি কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপরেই খাড়া করার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে একটি যুক্তি ছিল পৃথিবীর গ্র্যাভিটি অর্থাৎ ভার রয়েছে, মহাবিশ্বে অন্য কোন জ্যোতিষ্কের অর্থাৎ চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা ইত্যাদির ওটি নেই। ভারী জিনিস সব সময় নিচের দিকে যায় ভাবহীন জিনিসের মধ্য দিয়ে; পৃথিবীও তাই করেছে মহাবিশ্বের নিচের দিকে, অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে গিয়ে সেখানে স্থির হয়ে গেছে। পৃথিবীতে যে বাস্তবতা বিজ্ঞানীরা দেখেন সেই নানা বস্তু, তার মৌলিক উপাদান পানি, মাটি, বাতাস, আগুন; তাদের ওপর বলপ্রয়োগে নড়াচড়া, সব কিছুর ভেজা, শুকনা, গরম, ঠান্ডা এই চারটি মৌলিক গুণ থাকা; বস্তুর তারল্য, কাঠিন্য ইত্যাদি; এরিস্টোটল ধরে নিয়েছেন যে এগুলো একান্তই পৃথিবীর ব্যাপার। এর বাইরে যে মহাজগত এসব ওখানে অবান্তর, ওগুলো স্বর্গীয়, জাদুর মত একটি জিনিস ইথারে তৈরি– তাই তারা ভারহীন, স্বচ্ছ, জ্যোতির্ময় ইত্যাদি। মহাবিশ্বের একেবারে বাইরে রয়েছে স্থির তারা মণ্ডলী, তারও পরে আছে নিজে গতিহীন এক গতি-উৎস। ওই গতি-উৎস থেকেই ইথারের মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ্কগুলোতে গতির সঞ্চার হয়, এমনকি পৃথিবীর কিছু কিছু স্বাভাবিক গতি ওই গতিহীন গতি-উৎস থেকেই এসেছে। এরকম অলৌকিক কথা, জাদুর কথা বিজ্ঞানে আসার কথা নয়, কিন্তু এরিস্টোটলের মত দার্শনিকরা তা এনেছেন এবং প্রায় দু'হাজার বছর ধরে সেটিই বিজ্ঞান হিসেবে মেনে নেয়াও হয়েছে। অবশেষে ১৬০০ শতকে এসে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাতে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ দিয়ে জ্যোতিষ্কদের দেখে বুঝতে পেরেছেন ওই সব কথা ভুল। যেমন চাঁদের ভূমির দিকে তাকিয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে পৃথিবীর ভূমির সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই- সেই সমতল, সেই খাদ, সেই পাহাড়, সেই সাগর– শুধু তাতে পানি নেই এই যা। আধুনিক বিজ্ঞানে সচেতন ভাবে কোন রকম অলৌকিক বর্ণনা থেকে বিজ্ঞানের গল্পকে দূরে রাখতে হয়েছে।

কখনো যদি এর ব্যত্যয় হয়েও যায়, সেটি বেশিদিন টেকার সুযোগ পায়নি। যেমন গ্যালিলিওর সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলার পর্যবেক্ষণের চুলচেরা তথ্য ব্যবহার করে প্রায় নিখুঁত বিশ্বছবি আবিষ্কার করলেন– গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে যেটি সেই সব উপবৃত্তের দুই

ফোকাসের একটিতে রয়েছে। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তিনি তাঁর একেবারে নির্ভুল তিনটি নিয়ম আবিষ্কারও করলেন– প্রত্যেক গ্রহ যার যার দূরত্বে থেকে যার যার সময় মত যেভাবে পরিক্রমণ করছে তার সুন্দর গাণিতিক নিয়ম দাঁড় করিয়ে। কিন্তু কেন এমন সুন্দর গাণিতিক নিয়ম সব গ্রহ মিলিত ভাবে মান্‌ছে? নিশ্চয়ই যাকে ঘিরে তাদের সবার পরিক্রমণ তাদের ওপর সেই সূর্যের প্রভাবেই এমনটি ঘট্‌ছে। কী সেই প্রভাব? এ প্রশ্নের কোন বৈজ্ঞানিক জবাব কেপলার দিতে পারেন নি বলে তিনি শেষ পর্যন্ত এই এখানটিতে এসে অলৌকিকতার আশ্রয় নিলেন। তিনি এই সুন্দর গাণিতিক নিয়মগুলোর পেছনে দেখলেন একটি 'মহাজাগতিক সঙ্গীত' কে যার সুরে সুরে পরিক্রমণ হয়ে চলেছে। শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু কথাটি বৈজ্ঞানিক নয়। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে বেশিদিন এরকম কথাকে সহ্য করতে হলোনা, কিছুদিন পরেই নিউটন তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়ে দিলেন কেন কেপলারের এতো নিখুঁত নিয়মগুলো কাজ করে, এর জন্য অলৌকিক 'মহাজাগতিক সঙ্গীতের' প্রয়োজন হলোনা।

প্রকৃতিকে ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্য করে তুলেছিলেন যেই নিউটন তিনিও বেশি বয়সে জাদু-মন্ত্রের এক বিদ্যার আকর্ষণ এড়াতে পারেননি। ওটি বিজ্ঞান নয়, কিন্তু গ্রীক আমল থেকে শুরু হয়ে মধ্যযুগে আরবদের হাতে, এবং আরো পরে ওটি কোন কোন বড় বিজ্ঞানীদের হাতেও আদর পেয়েছে– এর নাম আলকেমি। আরবদের কারণেই নামটি পাওয়া। এটি আধুনিক কেমিস্ট্রির পূর্বসূরি তার এক অবৈজ্ঞানিক রূপ। এর পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তার মধ্যে অলৌকিকতা ছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল লোহার মত সস্তা ধাতুকে সোনায় পরিণত করা, আর আরবরা তার সঙ্গে যোগ করেছিলেন আবে হায়াত (অমৃত) নামে অমরত্ব লাভ করার ওষুধের লক্ষ্যকে। মূল উদ্দেশ্য দুটি কখনো সফল হবার ছিলনা, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে যে পরিমাণ ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে করে দেখা হয়েছে তাতে পরবর্তী কালের কেমিস্ট্রির কিছু কিছু উপাদান তৈরি হয়েছিলো বৈ কি। তবে ওসব বাস্তব রাসায়নিক কাজের সঙ্গে তুকতাকের সম্পর্কে এত বেশি ছিল বিষয়টি কখনো বিজ্ঞানের কাছেধারে আসতে পারেনি, নিউটনের মত মানুষের সান্নিধ্য সত্ত্বেও। তুকতাকগুলোকে অনেকটা বিজ্ঞানের কথার মত করে তোলা হতো, মুদু রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য কিছু মেশালে, বা উত্তপ্ত করলেই হতো না তার সঙ্গে জাদু-বিদ্যার মতো কিছু অলৌকিক প্রভাবকেও যোগ করতো হতো। ফলে দীর্ঘদিনের চর্চায় থাকা

এই বিদ্যার তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের কাছে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়নি– এই গল্প বিজ্ঞান মহাকাব্যের বাইরেই রয়ে গেছে।

বিজ্ঞান বরং ক্রমে ক্রমে গাণিতিক ও যান্ত্রিক ব্যাখ্যার দিকেই ঝুঁকেছে- গ্যালিলিও-নিউটনদের হাতে পদার্থবিদ্যা যে রূপ পেয়েছে বিজ্ঞানের সবগুলো শাখা যেন সেটিই হয়ে উঠতে চেয়েছে। জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদিতে কতগুলো ধারণা যা কিছুটা অস্পষ্ট ভাষায় এক সময় আনা হতো যেমন আত্মা, জীবনীশক্তি, অবচেতন মন ইত্যাদি, সেই সবকে বাদ দিয়ে শারীরবৃত্তিক বিবর্তন ও মস্তিষ্ক ভিত্তিক ব্যাখ্যা দানের চেষ্টাটাই ক্রমাগত বড় হয়ে ওঠেছে। যান্ত্রিক ব্যাখ্যা মানে অবশ্য যে যন্ত্রের মত ব্যাখ্যা নয় সে তো আমরা পদার্থবিদ্যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো তত্ত্বের প্রাধান্য দেখেই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক মানে সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণের ওপর ভিত্তি করা ব্যাখ্যা– ধোঁয়াটে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ না রেখে। এভাবে পদার্থবিদ্যা বা ভৌত বিজ্ঞানের মত হয়ে ওঠাকে কেউ কেউ একটি দোষ হিসেবে দেখেছেন, যে কথা বিজ্ঞানীরা খুব গায়ে মাখেননি। তাই আত্মার আলোচনায় ভড়কে না গিয়ে তাঁরা জীববিদ্যাকেও ল্যাবোরেটরিতে নিয়ে গেছেন, তাকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, তার ভেতর পদার্থবিদ্যা, কেমিস্ট্রির গুণাগুন আরোপ করেছেন– ওভাবেই ধীরে ধীরে আজকের অণুজীব বিদ্যাতেও পৌঁছে গেছেন। মন জিনিসটাকেও রহস্যাবৃত রাখতে অনিচ্ছুক তাঁরা। তাই এই মহাকাব্য থেকে এখন সেদিনের প্রচ্ছন্ন কথাগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে যেগুলো মনের ভেতর কাজ করে বলে ধরে নেয়া হয়েছিলো কিন্তু বাস্তবে তাদের অস্থিত্ব কোনদিন প্রমাণ করা হয়নি। ফ্রয়েডীয় ইড, ইগো, সুপার-ইগো ইত্যাকার জিনিসগুলো তার মধ্যে পড়ে। এর কারণ বিজ্ঞানের মহাকাব্যে সামান্য সময়ের জন্যও, সামান্য কোথাও কোন 'কালো বাক্স' থাকতে দেয়া হয়না, যাকে এমনিতেই মেনে নিতে হবে। বাক্সের ভেতরটা খুলে কার্য-কারণের মূল সুরটি তাতেও প্রয়োগ করতে হয় অনিবার্যভাবে। ভারী সুন্দর এই মহাকাব্য। বিশেষ করে তার অসম্ভব ব্যাপ্তির মধ্যে এই কার্য-কারণ নীতি যে রকম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রমাণিত গল্প বুনে গেছে তার থেকে তৃপ্তিকর ও উপভোগ্য আর কী হতে পারে?

# তত্ত্বের ও পরীক্ষার ক্রমাগত আলাপ

অদ্ভুত এক যুগলবন্দী

**প্রাচীন বিজ্ঞানেও আলাপের কিছু আলামতঃ**

বিজ্ঞান মহাকাব্যের কল্পিত বইটির যে কোন পাতা খুল্‌লে সেখানে একটি চেষ্টা সব সময় চোখে পড়বে; তা হলো তত্ত্ব ও পরীক্ষায় একত্রে একটি যুগলবন্দীর চেষ্টা। এ যেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দুই গায়ক অথবা যন্ত্রীর 'আলাপের' মত– এর সৃষ্টির জবাব ও দেয়তো, ওর সৃষ্টির জবাব এ দেয়। ওই আলাপ যেভাবে সঙ্গীতকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তত্ত্বে-পরীক্ষায় অন্য রকম আরেক আলাপ যেন বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তত্ত্বের সৃষ্টিটি চিন্তার মাধ্যমে আসে, আর পরীক্ষার সৃষ্টিটি ঘটে দেখার মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হবার মাধ্যমে। বিজ্ঞানী নিজে ভেবে কোন তত্ত্ব দিতে পারেন আর যুক্তির মাধ্যমে সেই তত্ত্ব থেকে নানা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরীক্ষায় সত্য প্রমাণিত হলে তবেই তত্ত্বটি গৃহীত হতে পারে, নইলে নয়। পরীক্ষাটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে ঘটতে পারে, আর আধুনিক বিজ্ঞানে যেটি বেশি হয় আয়োজন করে এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ঘটনাগুলো দেখার মাধ্যমে হতে পারে। এসব পরীক্ষায় যা দেখি যা পাই তার ব্যাখ্যার জন্য আবার নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন হতে পারে। এভাবেই চলে যুগলবন্দী।

প্রাচীন বিজ্ঞানে তত্ত্বে-পরীক্ষায় এই আলাপটি সব সময় স্পষ্টভাবে হতোনা; কখনো মনে হতো ওরা যা দেখছে বা পরীক্ষা করছে তা রেকর্ড করে চলছে তত্ত্ব দিচ্ছেনা; অথবা একটি দীর্ঘ সময় মনে হয়েছে মনের আনন্দের ভেবে চিন্তে তত্ত্ব দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখছেনা। কিন্তু আলাপের কিছুটা হলেও আলামত তখনো ছিল– নইলে ওটা বিজ্ঞান হতোনা, এই আলাপ যে বিজ্ঞানের চরিত্রের সঙ্গেই মিশে আছে। একেবারে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কালে বড় বড় দার্শনিকরা জগত-জীবন সম্পর্কে তাঁদের ভেবে দেখা ব্যাখ্যাগুলো দিতেন। হয়তো সাধারণভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বল্‌তেন, কিন্তু সেগুলোকে পরীক্ষার কষ্টি পাথরে আনার প্রয়োজন তেমন অনুভব করেননি। তাই সেগুলোকে বিজ্ঞানের আজকের সংজ্ঞায় আনা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তার মধ্যে যেগুলোতে ওই ব্যাখ্যাগুলো প্রকৃতির পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে মিলে

যেতো সেগুলোকে আমরা সেদিনের বিজ্ঞান বা 'প্রাকৃতিক দর্শন' বলতে পারি। সাধারণ মামুলি পর্যবেক্ষণ থেকে কিংবা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ থেকে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার একটি সম্পর্ক তখনো খোঁজা হতো, তার বৈজ্ঞানিক চরিত্রটিকে আনার জন্য। এক এক সময় অবশ্য তত্ত্বের কথা এমনি সব পর্যবেক্ষণের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যেতো, কিন্তু তাত্ত্বিকের জ্ঞানী খ্যাতির কারণে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এই সব ভুল তত্ত্ব বহুদিন পর সংশোধিত হতে হয়েছে। কিন্তু সেই ভুল তত্ত্বের মধ্যেও চেষ্টা থাকতো কোন রকম বাস্তব পরীক্ষার সাক্ষ্যকে ব্যবহার করার। তাই এরিস্টোটল যখন পৃথিবীর বাইরে সব জ্যোতিষ্ককেই অপূর্ব গুণ সম্পন্ন 'ইথারে' গড়া বলেছেন, বা ডেমোক্রিটাস যখন পানির 'এটমকে' মসৃণ জিনিস বলেছেন তখন জ্যেতিষ্কগুলোর উজ্জ্বলতা বা পানির পিচ্ছিলতার মামুলি অভিজ্ঞতাকেই এক রকম সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ওতে পরীক্ষার কোন ব্যাপার ছিলনা, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে হলেও ওই মামুলি অভিজ্ঞতাকেই পরীক্ষার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাটিকে সব সময়েই কোন না কোন ভাবে মেনে নেয়া হয়েছে।

**আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু থেকেই প্রকৃত যুগলবন্দীঃ**

আধুনিক বিজ্ঞানের শুরু থেকেই তত্ত্বের পরীক্ষাকে সমান তালে নেবার আবশ্যকতা চালু হয়েছে– ওটি বিজ্ঞানের আধুনিকতার বড় একটি শর্ত। বিজ্ঞানের তত্ত্ব যেমন একটি বিশেষায়িত সূক্ষ্ম কাজে পরিণত হয়েছে তেমনি তার সঙ্গে ক্রমাগত আলাপে রত হয়েছে বিজ্ঞানের পরীক্ষণ– এক্সপেরিমেন্ট, পর্যবেক্ষণ, জরিপ ইত্যাদি রূপে যারও কাজের একটি সূক্ষ্ম নীতিমালা গড়ে ওঠেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বিশ্বছবির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা যাঁরা করেছিলেন সেই কপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন এই নীতিই অনুসরণ করে পরবর্তী বিজ্ঞানের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কপারনিকাস তাঁর সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত যার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবটির সূচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক নানা পর্যবেক্ষণ উপাত্তের ভিত্তিতে গাণিতিক ভাবেই তিনি তাঁর তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে বদ্ধমূল ভাবে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের তত্ত্বকে তাঁর আগে কেউ যে বদলাবার চেষ্টা করেননি তা নয়। গাণিতিক যুক্তিতেই এরিস্টোটলের প্রায় সমসাময়িক গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী এরিস্টারখাস এটি করেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারেননি বলে তখনকার প্রবল

বিরোধিতায় সফল হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট একই রকমের সূর্য-কেন্দ্রিক তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, কিন্তু সেটিও বেশি এগুইনি। শেষ মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিজ্ঞানী বুরিডান গাণিতিক ভাবে সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বকে অধিক যৌক্তিক প্রমাণ করেও ধর্মীয় প্রশ্নে এর ওপর গুরুত্ব দিতে রাজি হননি। কিন্তু কপারনিকাসের তত্ত্বটি এতই বিশদ ও এতই স্পষ্টভাবে পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্ব ছবির থেকে শ্রেষ্ঠতর ছিলো যে একই ধরনের সব বাধা সত্ত্বেও শিগ্‌গির অধিকাংশ বিজ্ঞানীকে তা মেনে নিতে হয়েছিলো। অবশ্য তারপরও কপারনিকাসের তত্ত্ব নিখুঁত ছিলনা, আগের তত্ত্বের বেশ কিছু বৈশিষ্ট এতে থেকে যাওয়াতেই। বিশেষ করে এরিস্টোটলের কথিত আদর্শ কক্ষপথ হিসেবে গ্রহের বৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা থেকে বেরিয়ে না আসার কারণে বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তার খুব সামান্য কিছু ফাঁক ধরা পড়েছিলো।

এই ফাঁকটুকু ধরতে পেরেছিলেন কেপলার, এবং তার সুবাদে তিনি কপারনিকাসের তত্ত্বকে সংশোধন করে প্রায় আজকের বিশ্বছবিতে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, ইতোমধ্যে যে প্রসঙ্গ আমরা এনেছি। কেপলারের কাছে পরীক্ষায় পাওয়া উন্নত উপাত্ত থাকা এই সুযোগ করে দিয়েছে– তত্ত্ব-পরীক্ষার দ্বৈরতের চমৎকার সব উদাহরণ তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ওই উন্নত উপাত্ত এসেছিলো আরেকজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন দূরবীক্ষণ-পূর্ব জ্যোতির্বিদ্যার আমলের সব থেকে নিখুঁত পর্যবেক্ষণকারী; ডেনমার্কের মানুষ ব্রাহে সেদেশের উপকূলের কাছে উরানিবোর্গ নামের দ্বীপে যে অত্যন্ত দক্ষ যন্ত্রপাতি সম্বলিত মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন সেখানেই এই পর্যবেক্ষণ খুবই সমৃদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যার উপাত্ত-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলো। কেপলার নিজে ছিলেন গণিতবিদ ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী, এবং ব্যক্তিগত জীবনে অভিজাত ব্রাহের ঠিক বিপরীত, বিনীত ভাবে উরানিবোর্গে তাঁর অধীনে কাজ নিয়েছিলেন। ব্রাহে কপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্ব মেনে নেন্‌নি, আবার প্রচলিত পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বও মানতে পারছিলেননা; তিনি এ দুয়ের মাঝামাঝি নতুন তত্ত্ব দেবার চেষ্টা করেছিলেন যা সফল হয়নি। মঙ্গল গ্রহের পরিক্রমণের যে অত্যন্ত নিখুঁত তথ্য তাঁর পর্যবেক্ষণে জমা হয়েছিলো তা তিনি কেপলারকে দিয়েছিলেন এর থেকে নতুন কিছু ধরা পড়ে কিনা দেখতে। এরকম আরো নানা তথ্যের বিশ্লেষণ ভার তাঁর ওপর আসলেও মঙ্গলের ওই তথ্যগুলো তাঁর জন্য ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। কারণ কপারনিকাসের তত্ত্বের থেকে হিসেব করে যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই তথ্যের খুব ছোট্ট একটু গরমিল রয়েছে, যা দেখিয়ে দিচ্ছে

যে মঙ্গলের কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়, বরং অল্প কিছুটা উপবৃত্তাকার। ব্রাহের মাপা উপাত্তের ওপর কেপলারের এমনই আস্থা ছিল যে এর ওপর নির্ভর করে তিনি বহুকালের প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত নিখুঁত বৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে রাজি ছিলেন। ইতোমধ্যে ব্রাহের মৃত্যু হলে কেপলার উরানিবোর্গ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ হন এবং এর সকল উপাত্ত ব্যবহার করতে পারেন। তিনি দেখেন যে শুধু মঙ্গল নয় সব গ্রহের কক্ষপথই উপবৃত্তাকার, যদিও বৃত্ত থেকে সেগুলোর বিচ্যুতি মঙ্গলের থেকে কম।

এসব ও উরানিবোর্গের অন্য সব উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করলেন সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণরত গ্রহগুলো নিয়ে তাঁর তিনটি নিয়ম– কেপলারের নিয়ম। প্রথমটি বল্‌ছে সব গ্রহের কক্ষ উপবৃত্তাকার, আর সূর্যের অবস্থান এই সবগুলোর একটি ফোকাসে (উপবৃত্তের দুটি ফোকাস থাকে যা কেন্দ্রের দুই পাশে তার থেকে সমান কিছু দূরে)। দ্বিতীয়টি বলছে প্রত্যেক গ্রহ সূর্য থেকে তার দূরত্বের কমবেশি হবার কারণে কখনো দ্রুত কখনো ধীর চল্‌লেও সূর্য আর গ্রহের সংযোগ রেখাটি একই সময়ে একই পরিমাণ এলাকার ওপর দিয়ে কুড়িয়ে যায়। তৃতীয়টি বল্‌ছে সূর্য থেকে গ্রহের গড় দূরত্বের কিউব ও তার পূর্ণ পরিক্রমণের সময়ের বর্গ– এই উভয়ের অনুপাতটি সব গ্রহের জন্য সমান। এগুলো সবই খুবই বিস্ময়কার আবিষ্কার– কিন্তু নিখুঁত উপাত্তের থেকে সরাসরি পাওয়া গেছে বলে এদের মেনে নিতেই হয়। এরা একটি কথাই বলছে একই কেন্দ্রে থাকা সূর্যের বিশেষ কোন প্রভাব সব গ্রহকে সুনির্দিষ্ট সব গাণিতিক নিয়ম মানতে বাধ্য করছে। কিন্তু কী সেই প্রভাব? এটি জানতে হলে পরীক্ষার ওপর নির্ভর করা কেপলারের নিয়মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেপলার নিজে সেই ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলেন, দার্শনিকের মত একে 'মহাজাগতিক সঙ্গীত' বলে ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন পর এই কাজে সফল হলেন নিউটন তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বের মাধ্যমে। আলাপটি এভাবেই চলেছে– কপারনিকাসের তত্ত্ব, তারপর ব্রাহের পরীক্ষা-উপাত্তের ভিত্তিতে কেপলারের নিয়ম, তারপর নিউটনের তত্ত্ব। এই যুগলবন্দী আলাপ আধুনিক সৌরজগতের বা যে কোন তারা জগতের ও মহাবিশ্বের মূল কাঠামোটি তৈরি করে দিয়েছে। এখানে সত্যিকারের পরীক্ষা করেছেন একজন– টাইকো ব্রাহে, বাকি সবাই কপারনিকাস, কেপলার, নিউটন সবাই তাত্ত্বিক, কিন্তু আলাপটি ওভাবেই এগিয়েছে।

বিজ্ঞানের আর একটি ক্ষেত্র আলোকবিজ্ঞানে নিউটন নিজেই পরীক্ষার কাজও করেছেন, সেগুলোর ব্যাখ্যায় বড় তাত্ত্বিকের কাজও করেছে; আলাপটি সেখানে

নিউটনের সঙ্গে নিউটনের। অন্তত এই ক্ষেত্রে পরীক্ষণ বিজ্ঞানী হিসেবে নিউটনের কৃতিত্ব অমর হয়ে আছে যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো প্রিজমের সাহায্যে সাদা আলো বিশ্লেষণ করে সাত বিভিন্ন রঙকে বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়ে আলাদা করে ফেলা। তিনি একটি লম্বা কাঠের ওপর এই সাত রঙের বর্ণালীকে ফেল্‌লেন এবং তার মধ্যে বিশুদ্ধ একটি রঙ পড়েছে এমন জায়গায় একটি ছিদ্র করলেন। তার ভেতর দিয়ে শুধু সেই রঙের আলোর যে রশ্মি গেল এবার তাকেই আগের মত প্রিজম দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবার প্রিজমের ভেতর দিয়ে বাঁকা হয়েও এটি একই রঙের রইলো, অন্য কোন রঙে বিশ্লিষ্ট হলোনা। এর মাধ্যমে তাত্ত্বিক নিউটন প্রমাণ করলেন রঙ হলো আলোর একটি মৌলিক গুণ। আগের বার কয়েকটি রঙ মিশ্রিত ছিল বলেই তারা বিশ্লিষ্ট হয়েছিলো।

আলোর যে সব গুণ আগে থেকে জানা ছিল, আর নিউটন নিজে যে নতুন পরীক্ষণগুলো করেছেন সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তিনি আলোর মূল চরিত্র নিয়ে তত্ত্ব দিলেন যে এটি ক্ষুদ্র কণিকায় গড়া– এ তত্ত্বকে বলা হয় আলোর কণাতত্ত্ব। এই কণাতত্ত্ব দিয়ে তিনি আলোর পরীক্ষালব্ধ অধিকাংশ গুণকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন। কিন্তু বাকিগুলোতে তাঁর ব্যাখ্যাকে হতে হলো বেশ দুর্বল ও কষ্টকল্পিত। অন্যদিকে ওই নিউটনের সময়েও হাইগেন ও অন্যান্য কয়েকজন বিজ্ঞানী আলোর একটি বিকল্প তত্ত্ব দিয়েছিলেন যেটি হলো আলোর তরঙ্গতত্ত্ব, কারণ এতে আলোকে এক রকম তরঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছে। তাঁরা এই তত্ত্ব দিয়ে নিউটনের তত্ত্বের দুর্বল ব্যাখ্যাগুলোতেও ভাল ব্যাখ্যা করতে পারলেন, যদিও সে সময়ের এই তরঙ্গতত্ত্বের কিছু ভুল ছিল। উভয় তত্ত্বই প্রচলিত থাকলেও নিউটনেরটিই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিলো। উভয়ের পরীক্ষাগুলো মোটামুটি একই হলেও তত্ত্ব একেবারে ভিন্ন ছিল। ইতোমধ্যে তরঙ্গতত্ত্বের ভুলগুলো শোধরানো হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত টমাস ইয়াং তাঁর বিখ্যাত দুই ফাটল পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে আলোর তরঙ্গতত্ত্বটিই সঠিক, কণাতত্ত্ব নয়। এখানেও তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষার যুগলবন্দীগুলো ফুটে উঠেছে।

**একেবারে তরতাজা উদাহরণঃ**

এই ২০২২ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যে তিন জন বিজ্ঞানী, তাঁদের প্রত্যেকে আলাদা ভাবে নিজের মত করে বিভিন্ন পরীক্ষায় একই তত্ত্বের সঙ্গে আলাপ করেছেন। প্রত্যেকেই দেখিয়েছেন সেই খুবই অদ্ভুত

তত্ত্বটি একেবারে বাস্তব, কাজেই সঠিক। তত্ত্বটি ১৯৩৫ সালে স্বয়ং আইনস্টাইনের দেয়া, আরো দু'জন বিজ্ঞানী পডোলস্কি ও রোজেনের সঙ্গে মিলে। আর তার এত বছর পর অন্য তিনজন বিজ্ঞানীকে তার পরীক্ষণ প্রমাণ দেয়ার জন্য পুরস্কৃত করা হলো তাঁরা হলেন অ্যালাইন আসপেক্ট, জন ক্লাউজার এবং এ্যান্তন জেইলিঙ্গার; পুরস্কার এখন দিলেও তত্ত্বে-পরীক্ষায় এই আলাপটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছে। আগের তিনজনের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে ইপিআর নামে পরিচিত এই তত্ত্বে তাত্ত্বিক ওঁরা দেখিয়েছিলেন যে দুটি কণিকাকে এমন ভাবে পরস্পর সম্পর্কিত করে তোলা সম্ভব যার ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়মে এদের একটিতে কোন পরিবর্তন আনা হলে সেই সম্পর্ক অনুযায়ী অন্য কণিকাতেও একটি পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয় ভাবে আসতে বাধ্য। ইতোমধ্যে পরস্পর আলাদা হয়ে কণিকা দুটি যদি লক্ষ বা কোটি মাইল দূরে থাকে একে অপর থেকে, তবুও! এভাবে যে কোন দূরত্ব সত্ত্বেও পরস্পরের ওপর তাৎক্ষণিক প্রভাবে উভয়কে জড়িত রাখতে পারে বলে এই ঘটনাকে বলা হলো 'কোয়ান্টাম বিজড়ন' (কোয়ান্টাম এনটেঙ্গলমেন্ট)।

তত্ত্বে ব্যাপারটিকে দু'ভাবে দেখা যায়। সহজ করার জন্য একে উপমার মাধ্যমে দেখা যাক। মনে করি একটি গর্ত থেকে এক সঙ্গে দুটি বল বেরিয়ে আসছে যার একটি সাদা ও অন্যটি কালো। ওপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বল দুটি দু'জনের হাতে ধরা পড়ে। তাঁদের একজন যদি দেখেন যে তাঁর বলটি সাদা তাহলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বুঝতে পারবেন যে অন্যের বলটি কালো, নিজে কালো পেলে অন্যেরটি সাদা।

এটি তাঁরা পারবেন কারণ সাদা ও কালো হওয়ার ব্যাপারটি একটি অন্তর্নিহিত ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে আছে যাকে বলা যায় 'অন্তর্নিহিত অপেক্ষক'– একটির ওপর অন্যটি যে ভাবে অপেক্ষা করে। এই অন্তর্নিহিত থাকার বিষয়টি যদি ধরে নেয়া যায় তা হলে এখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো অদ্ভুত কিছুর প্রয়োজন হবেনা। এই একই উপমায় কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আনা যায় এভাবে: গর্তের থেকে বেরুবার সময় দুটি বলই সাদা ও কালোর উপরিপাতিত অবস্থা ছাই রঙের থাকে, যতক্ষণ দুজনের কারো হাতে ধরা না পড়ে অথবা তিনি এর দিকে না তাকান ততক্ষণ দুই বলই তাত্ত্বিক ভাবে ছাই রঙের থাকে। হাতে নিয়ে তাকানো মাত্রই সেটি হয় সাদা রঙে, নয় কালো রঙে পরিণত হয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এভাবে কোন জিনিসের অবস্থা বহু অবস্থার উপরিপাতন হিসেবে থাকে,

তত্ত্ব থেকে হিসেব করে এই উপরিপাতিত অবস্থাটি তাত্ত্বিক ভাবে জানা যায় যা জিনিসটি বাস্তবে কোন এক একটি অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা কত সেটিই শুধু বলে। যেমন উপমায় হিসেব করলে বলটি সাদা পাওয়ার সম্ভাবনা কত, কালো পাওয়ার সম্ভাবনা কত ইত্যাদি জানা যায়, ওভাবে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত সব সম্ভাবনা বজায় থাকে। কিন্তু যেই মাত্র জিনিসটিকে বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা যাবে তখন ওই সম্ভাবনা অনুযায়ী ওটি ওই সব অবস্থার মধ্যে একটিই শুধু ধারণ করে। আমাদের স্বাভাবিক বোধশক্তির কাছে এটি এতই অদ্ভুত ভাবে দৈব নির্ভর যে আইনস্টাইন প্রমুখরা চাচ্ছিলেন যে প্রথম প্রক্রিয়াটিই ঠিক হোক, অর্থাৎ ওর মধ্যে হয়তো একটি 'অন্তর্নিহিত অপেক্ষক' আছে যা এখনো আমরা বুঝতে পারছিনা। সেটি উদ্ঘাটিত হলে কোয়ান্টাম তত্ত্বও হয়তো আরো স্বাভাবিক হয়ে পড়বে– কোয়ান্টাম বিজড়নের অদ্ভুত ঘটনাও প্রয়োজন হবেনা। পরীক্ষণে এমনটি পাওয়ার কথাও নয়। তা ছাড়া অনেক দূরে থেকেও একটির পরিবর্তনে অন্যটির তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হওয়া আলোর থেকেও বেশি বেগে তথ্য যাওয়ার ব্যাপার হবে, সেটি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের বিরোধী।

কিন্তু হায় আসপেক্ট প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কোয়ান্টাম বিজড়নের ব্যাপারটি আসলেও বাস্তব, আর সেটি তাঁরা করেছেন খুবই জটিল সব বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে। এজন্যই তাঁদের ২০২২ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ। আসপেক্ট এই পরীক্ষা করেছেন ১৯৮০-৮২ সালে আলোর কণিকা ফোটন দিয়ে, জন্ম একই এটমে বলে এগুলো বিজড়িত অবস্থায় থাকে। ফলে তাদের একটি ভূমি-সমান্তরাল পোলারাইজেশনে থাকলে তার সঙ্গে বিজড়িত ফোটনটি ভূমি-সমকোণ পোলারাইজেশনে থাকে। মূল এটম থেকে জন্ম নেয়ার পর এদের দুটি দুই বিপরীত মুখে যায় এবং তখন অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে উভয়ের পোলারাইজেশন মাপার সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করা হয়। বিশাল সংখ্যক জোড়ার ক্ষেত্রে পোলারাইজেশন মেপে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে কোয়ান্টাম বিজড়নটি একেবারেই বাস্তব, এবং জোড়ের উভয় ফোটন পরস্পরের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ রাখে। এতে আইনস্টাইনের তত্ত্ব লংঘিত হওয়া না হওয়া নিয়েও তাত্ত্বিকরা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। অন্য বিজ্ঞানী জেলিঙ্গার ভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এমন বিজড়িত ভিন্ন কণিকা কী ভাবে দূরে থেকেও পরস্পরের সঙ্গে তাৎক্ষণিক তথ্য বিনিময় করে (টেলিপোরটেশন); শুধু তা নয় তিনি এমন বিজড়িত কণিকার সুযোগ নতুন যুগের কম্পিউটার কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কীভাবে নেয়া যায় তাও

বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। তারও বহু আগে জন ক্লাউজার ১৯৭২ সালে তাঁর পরীক্ষায় কোয়ান্টাম বিজড়নটি বাস্তব হবার প্রথম ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। এভাবে আইনস্টাইন ও সহযোগীরা যে অদ্ভুত তত্ত্বের সূচনা এক রকম ভাবনার এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছিলেন তার উপযুক্ত জবাব সাম্প্রতিক ৫০ বছরে পরীক্ষণ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন; এবং এসবের মুখ্য বিজ্ঞানীরা এ বছর এই কারণেই নোবেল পুরস্কার পেলেন।

খানিকটা কাকতালীয় ভাবেই এই ২০২২ সালের চিকিৎসা ও জীববিদ্যা বিষয়ক নোবেল পুরস্কারও গিয়েছে এমন একজন বিজ্ঞানীর কাছে যিনি পরীক্ষার একটি নতুন দিগন্তকে সম্ভব করে প্রাচীন মানুষের বংশগতি সংক্রান্ত তত্ত্বকে প্রমাণের সম্মুখীন করতে পেরেছেন। সুইডেনের এই বিজ্ঞানী সোয়ান্তে পাবো প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল থেকে ডিএনএ পরীক্ষা সম্ভব করেছেন। ৩০-৪০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে আমাদের প্রজাতির হোমো সেপিয়েন্স মানুষ আর কিছুটা ভিন্ন প্রজাতির প্রাচীন মানুষ হোমো নিয়ানডার্থালরা পাশাপাশি বাস করেছে এমন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বহুদিন ধরে ছিলো। উভয়ের ফসিল ও জীবনযাত্রার মিল-অমিল জানা গেলেও জেনেটিক সম্পর্কগুলো স্পষ্ট ছিলনা। এসব নিয়ে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে সে সময় তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্কের ফলে কিছু নিয়ানডার্থাল জিন আজকের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এরকম তত্ত্ব বেশ কৌতূহল ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। এমন তত্ত্বের সপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দিকে যুক্তি ছিল। সেটি ঘটলে এ হবে মানুষের এই দুই প্রজাতির মধ্যে একেবারে সাম্প্রতিক সম্পর্ক, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী এরা প্রায় আট লক্ষ বছর আগেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক প্রজাতি হিসেবে গড়ে ওঠেছিল। দৈহিক ও মানসিক বেশ কিছু পার্থক্য এই দীর্ঘ সময়ে তাদের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিলো। ৩০-৪০ হাজার বছরের মত কাছাকাছি সময়ের এই নতুন সম্পর্ক সত্য হলে তা একেবারেই অভিনব। এসব তত্ত্ব গ্রহণ করা বা বাতিল করার ভাল উপায় হতো আজকের বংশধরদের ডিএনএ'র পাশাপাশি প্রাচীন ডিএনএ ও পরীক্ষা করতে পারলে।

পাবো যখন এই ক্ষেত্রে পরীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন, প্রাচীন হাড় থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করে তাকে মোটামুটি অবিকৃত ও বিশ্লেষণযোগ্য করে তোলার কৌশলগুলো তখন একেবারেই শৈশবে। এগুলোকে তিনি এমন নির্ভরযোগ্য অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত নিয়ানডার্থাল

ডিএনএর বিভিন্ন অবিকৃত অংশের পাঠোদ্ধার করে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নিয়ানডার্থাল মানুষের পুরো জেনোম (জিন-সমগ্র) গড়ে তুলতে পেরেছেন। আজকের মানুষের সম্পূর্ণ জেনোম যখন প্রথম গড়া হয়েছে তখনো এভাবে নানা মানুষের ডিএনএ ব্যবহার করা হয়েছে– কাজেই এটি কোন নিম্ন মানের প্রক্রিয়া নয়। শেষ পর্যন্ত প্রাচীন নিয়ানডার্থাল, তাদের সমসাময়িক প্রাচীন সেপিয়েন্স, আজকের সেপিয়েন্স এমনি সবার জেনোমের তুলনামূলক বিশ্লেষণে প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে আজকের ইউরোপীয় এবং অন্তত কিছু এশীয় মানুষের জেনোমে নিয়ানডার্থাল জিনের উপস্থিতি প্রাচীন কালে কাছাকাছি বসবাসের সময় তাদের মধ্যে যৌন মিলনের তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার পাবোর পরীক্ষণ থেকেই আরো চাঞ্চল্যকর একটি তত্ত্ব ৩০-৪০ হাজার বছর আগে এশিয়ার কিছু কিছু জায়গায় ডেনিসোভান নামের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানব প্রজাতির অস্থিত্ব এবং সেপিয়েন্স মানুষের সঙ্গে তাদেরো সম্পর্ক ঘটার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তখনকার ডেনিসোভান মানুষের একটি আঙ্গুলের হাড় আবিষ্কার এবং এর ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার এই নতুন তত্ত্ব সম্ভব করেছে। পাবো এভাবে পরীক্ষার নতুন দিগন্ত আনতে যেমন বড় ভূমিকা নিয়েছেন, এটি অনুসরণ করে নতুন তত্ত্ব আনাতেও ভূমিকা রেখেছেন।

## দুই রকম বিজ্ঞানী

**বেশি তত্ত্ব, অল্প পরীক্ষাঃ**

বিজ্ঞান একটিই মহাকাব্য, কিন্তু বিজ্ঞানীর কাজের দুটি পৃথক চেহারা দেখে অনেক সময় তাঁদের চর্চাটিকে একই ধরনের মনে নাও হতে পারে। ইতোমধ্যে বিজ্ঞান মহাকাব্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে, এবং সেখানে তত্ত্ব ও পরীক্ষার যুগলবন্দী দেখে এই দুই পৃথক চেহারা পাঠকের কাছে যথেষ্ট ধরা পড়েছে। একই বিজ্ঞানীর বিভিন্ন সময়ের কাজে যেমন এটি দেখা গেছে, দুই বিজ্ঞানী সব সময় ভিন্ন চেহারার কাজ করেছেন তাও। এর কারণ অন্তত অতীতে একই বিজ্ঞানীকে তত্ত্ব ও পরীক্ষা উভয়টি করতে দেখার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে; তেমনি সাম্প্রতিক কালে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ও পরীক্ষণ বিজ্ঞানী এই দুই জনকে আলাদা দেখতেই আমরা বেশি অভ্যস্ত। তবে কাজের দিক থেকে আলাদা হলেও তত্ত্ব যিনি সৃষ্টি করছেন তাঁর মাথায় পরীক্ষণের চিন্তা সব সময় ভর করছেনা, বা পরীক্ষা যিনি করছেন তাঁর মাথায় তত্ত্বের চিন্তা ভর করছেনা তা

বলা যায়না। বরং সেটিই স্বাভাবিক, কারণ এমন চিন্তা ছাড়া আজকাল কোন বিজ্ঞানে এগুনো কঠিন। কিন্তু কাজের ভঙ্গিটি এই দুইজনের খুবই আলাদা, এবং দিন দিন আরো আলাদা হচ্ছে।

ইতিহাসের দিকে তাকাতে গেলে বিজ্ঞানে তত্ত্ব খাড়া করার কাজটি দার্শনিকদের কাছ থেকেই প্রথম এসেছে। একেবারে শুরুতে যাঁরা নানা বিষয় নিয়ে এমনিতেই বেশি ভাবতেন– যেমন পুরোহিত, পরামর্শ করার মত জৈষ্ঠ মানুষ, অসুখ সারানোর কাজে সহায়ক এমনি মানুষ থেকেই বিজ্ঞানের বিষয় নিয়েই কিছু কিছু চিন্তা আসতো। তবে গ্রীক সভ্যতার সময়ে অনেক জ্ঞানী মানুষ বিশুদ্ধ দার্শনিক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন, এবং তাঁদের দার্শনিক চিন্তায় বিজ্ঞানের সমস্যা নিয়ে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মত তত্ত্ব খাড়া করাটি বিজ্ঞানের একটি নিয়মিত বৈধ পদ্ধতির রূপ লাভ করেছিলো। তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের অর্থাৎ সে কালের ভাষায় 'প্রকৃতির দার্শনিকদের' কাজে তত্ত্ব খাড়া করাটাই বেশি বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। এর আগে তত্ত্বের মত যেটুকু ছিল সেটুকু সাধারণত পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির একটি বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকতো এবং তার সঙ্গে বর্ণনার ভেতরেই কিছু কিছু কল্পনা যোগ, যেমন তারামণ্ডলীর মধ্যে দেব-দেবীদের ছবি কল্পনা। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকদের বিজ্ঞান তত্ত্ব অনেকটাই তাঁদের যৌক্তিক মনের আন্দাজে গড়ে তোলা কাল্পনিক এক একটি ইমারতের মত। প্লেটো ও অন্যান্য গ্রীক জ্যোতির্বিদদের সৃষ্ট বিশ্বছবি; এরিস্টোটলের বস্তু, গুণ, জ্যেতিষ্ক, গতি ইত্যাদি সংক্রান্ত তত্ত্ব; ডেমোক্রিটাসের এটমের তত্ত্ব ইত্যাদি এভাবেই দার্শনিকের ভাবনার থেকেই সৃষ্টি, যার মধ্যে অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষার উল্লেখ থাকলেও তার ভূমিকা খুবই গৌণ। অন্য কেউ যে সে তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা করেছে তাও নয়। তখন থেকেই তত্ত্বের কাজটি প্রায় সর্বাংশে চিন্তার কাজ; যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ দু'হাজার বছর এই তত্ত্বকেই শুধু যৌক্তিক তর্ক-বিতর্কে প্রতিষ্ঠিত করার বাইরে বড় কিছু হতোনা। অনেক সময় তর্ক-বিতর্কের ফলে বিপরীত তত্ত্বের সৃষ্টি হতো, কিন্তু উভয়ের মধ্যে নিষ্পত্তির কোন উপায় থাকতোনা। সেক্ষেত্রে অধিক বিখ্যাত দার্শনিকের তত্ত্বটিই দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত থাকতো। বড়জোর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলাবার জন্য পরে তত্ত্বকে এদিক-ওদিক কিছুটা দুমড়ে মুচড়ে নেয়া হয়েছে। কিছু কিছু তত্ত্ব অবশ্য গণিত অথবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতো যে সেগুলোর কোথাও কোন ঘাটতি ছিলনা। আর্কিমিডিসের সেই মুকুট সমস্যা থেকে আসা প্লবতার নিয়ম, অথবা লিভারের নিয়মকে এই দলে ফেলা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান আসার

পর থেকে অবশ্য তত্ত্বের এই একছত্র ভূমিকা বদলে গেছে, এবং তত্ত্ব ও পরীক্ষার যুগলবন্দী তার স্থান দখল করেছে। তবে এতে তত্ত্বের নিজের চেহারা বদলায়নি। এটি এখনো সর্বাংশে চিন্তার এবং যুক্তির কাজ হিসেবেই রয়ে গেছে।

তত্ত্ব মানে মস্তিষ্কের ঝড়। সমস্যার সমাধান, পরীক্ষণের ব্যাখ্যার চেষ্টায় মস্তিষ্কের এই ঝড়, যেখানে শুধু পরীক্ষণের সঙ্গে নয় বাদবাকি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর সঙ্গে সাজুয্যের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়। খুঁজে নিতে হয় যুক্তির বুনোট, অনেক ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক গণিতের সূক্ষ্ম অগ্রসরমানতার মধ্যেই খুঁজতে হয় যুক্তির সেই বুনোট। এ বিষয়ে অন্য যাঁরা তত্ত্ব দিয়েছেন তাঁদের যুক্তিজালকেও অনুসরণ করে দেখতে হয় সেগুলো কতখানি ঠিক পথে এগিয়েছে কোথায় বাধার সম্মুখীন হয়েছে, নাকি বিশেষ কোন 'ইউরেকা' মুহূর্তে বাস্তব ঘটনা থেকে সৃষ্টিশীলতার স্ফূরণ পেলে তবেই সঠিক তত্ত্বের সমাধান আসবে। সংখ্যা ও গণিতের আবিষ্কার হাজার পাঁচেক বছর আগে চিন্তার রাজ্যে এক বিমূর্ত দিগন্ত নিয়ে আসার পর থেকে বিজ্ঞানীরা যেখানেই সম্ভব হয়েছে তাঁদের তত্ত্বকে গণিতের বিমূর্ততার হাতে সমর্পণ করেছেন। আজ সেটি অনেক গুণে বেড়ে গেছে বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখার জন্যই, তবে কোন কোন শাখার তাত্ত্বিক কাজকে তো গণিত থেকে আলাদা করাই অসম্ভব। এ কারণেই বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাজ অনেকটাই গণিতকে নিয়েই। এক সময় তো বড় বড় অনেক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী একই সঙ্গে গণিতও সৃষ্টি করেছেন, আবার বিজ্ঞানের তত্ত্বও দিয়েছেন সে গণিত ব্যবহার করে। আর্কিমিডিস, নিউটন, গাউস এঁরা তার বড় বড় উদাহরণ। তবে অধিকাংশ তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী গণিতবিদদের দ্বারা ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত গণিতকেই তাঁদের কাজে লাগিয়ে দেন। সাধারণ এলজেব্রার নানা অংশ এতে হরদম ব্যবহৃত তো হয়েছেই, গণিতের ক্যালকুলাস শাখাটি বিশেষ করে তার ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন নামের রূপে এই ব্যাপারে অদ্বিতীয়। তবে আরো বিরল সব উচ্চ মাপের গণিতকে কখনো কখনো তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা নিজ নিজ কাজের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত মনে করেছেন। এই সব গণিত যেই গণিতবিদরা সৃষ্টি করেছেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গণিত সৃষ্টির আনন্দেই সেটি করেছেন, বিজ্ঞানের কাজে লাগাবার জন্য নয়। সেখান থেকে নিয়ে কাজে লাগাবার চিন্তাটি মাথায় আসাটি কোন কোন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর বিরাট বাহাদুরি। বিজ্ঞানের কিছু শাখায় উচ্চ গণিতের থেকে নয়, বরং তাত্ত্বিকদের বাহাদুরি দেখাবার বড় জায়গাটি আসে ঝিলিক দেয়া কোন গঠনের ছবি, কোন বিন্যাস,

কোন প্যাটার্ন যদি তাঁর মাথায় ধরা দেয়। এটি সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তির ব্যাপার। তবে এতে যে জিনিসটি সবচেয়ে সহায়ক হয় তা হলো বিষয়টিকে মডেলের আকারে খাড়া করতে পারা।

**মডেল তৈরির মাধ্যমে তত্ত্বঃ**

মডেল মানে প্রকৃতির একটি সরল অনুকরণ, যাবতীয় বাহুল্যকে বাদ দিয়ে এক্ষেত্রে যেগুলো কেন্দ্রীয় বিষয় তাকেই শুধু মডেলের মধ্যে রাখা হয়। ফলে বিজ্ঞানী তাঁর চিন্তাকে সঠিক জায়গায় নিবদ্ধ করতে পারেন। খুব সহজ একটি উদাহরণ নিলে একটি গ্লোব হতে পারে পৃথিবী সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্য একটি মডেল। গ্লোবের ওপর কাজ করে এমন সব তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব, যা পৃথিবীর ক্ষেত্রে সত্য হবে। আর গ্লোবকে সব সময় গ্লোব হিসেবে নেয়া হয় তাও নয়, যখন ম্যাপ ব্যবহার করা হয় তখন তা গ্লোবেরই একটি অন্য রূপ, আবার একেবারে আধুনিক জিআইএসও (জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম) অন্য রূপ হতে পারে। এই শেষের রূপে কম্পিউটার ও জিপিএস (উপগ্রহের সাহায্যে নিখুঁত ভাবে একটি জায়গার অবস্থান নির্ণায়ক) ব্যবহার করে একই জায়গার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে দেখানো অনেকগুলো ম্যাপের উপরিপাতন ঘটানো হয়। সাদা চোখে গ্লোবের ব্যাপারগুলোকে অতিরিক্ত গাণিতিক মনে না হতে পারে– কিন্তু এরও রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে গণিত– যেমন গোলকের গায়ে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা আঁকার জ্যামিতি, গোলককে চেপ্টা ম্যাপে পরিণত করার গণিত, কম্পিউটারের গণিত, সবকিছু। কখনো বিজ্ঞানের মডেলগুলো গাণিতিক মডেল হয়ে ওঠে– তাতে শুধু গাণিতিক ভাবেই তত্ত্বের মূল ধারণাটি প্রকাশ করার সুযোগ ঘটে যায়।

আধুনিক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর নিত্য সঙ্গী কম্পিউটার। এটি হতে পারে সাধারণ ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে শুরু করে অত্যন্ত শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার। কম্পিউটার তা যতই শক্তিশালী থেকে, সেটি কাজ করবে তাকে যেভাবে নির্দেশনা দেয়া হবে তা অনুসরণে– অর্থাৎ এর জন্য তাত্ত্বিককে তাঁর সমস্যাগুলোকে প্রোগ্রামের ভাষায় কম্পিউটারকে দিতে হবে। আজকাল তাত্ত্বিকের অনেকটা কাজ এই প্রোগ্রাম বা সফ্‌টওয়্যার খাড়া করার ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় আবার ওই বিশেষ ধরনের কাজে অনেকের ব্যবহারের জন্য বহু উপাত্ত ও বহু প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সফ্‌টওয়্যার ইতোমধ্যেই তৈরি করা থাকে। যেমন জীববিজ্ঞানে বিশেষ করে অণু-জীববিজ্ঞানে (ডিএনএ

ইত্যাদি সংক্রান্ত বিজ্ঞান) বায়োইনফরমেটিক্স নামের একটি ব্যাপক বিজ্ঞান এমনি সব সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে।

মডেল তৈরির একটি বড় ক্ষেত্রই হলো কম্পিউটার মডেলিং। এতে বিজ্ঞানী পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত নানা তত্ত্ব থেকে নতুন তত্ত্বের মালমশলা পেতে পারেন। ওই প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোকে গাণিতিক অথবা কম্পিউটারে প্রকাশ করার মত অন্য রূপে কম্পিউটারে সন্নিবেশিত করার মাধ্যমেই ওই কম্পিউটার মডেলটি গড়া হয়। এর ওপর কম্পিউটারের কাজের জন্য জানা কিছু উপাত্ত দিয়ে দেয়া হলে কম্পিউটার নিজেই প্রক্রিয়াকরণকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং নতুন তত্ত্বের চেহারাটি কম্পিউটারেই কিছুটা ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী হলেই তাঁকে কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। অনেকেই শুধু খাতা কলম নিয়েই তাঁদের তত্ত্বের কাজ করে যেতে পারেন। সেই কাজ গণিতের মাধ্যমে হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যেমন কোন রসায়নবিদকে সারাক্ষণ নানা সম্ভাব্য অণুর গঠনচিত্র খাতায় স্কেচ করতে দেখলে অবাক হবোনা, যদিও কিছুটা জটিল অণুর এরকম স্কেচিঙের ভার কম্পিউটারকে দেয়াটাও স্বাভাবিক। ওই গঠনচিত্রের মধ্যেই তিনি আন্তঃএটমিক বন্ডগুলোর (সংযোজন গুলোর) প্রতিনিধিত্বকারী রেখাগুলো– তাদের দৈর্ঘ, কোণ ইত্যাদি মাপামাপি করে বাস্তবে এর সম্ভাব্যতার কথা ভাবার চেষ্টা করেন।

কম্পিউটার মডেলিং অবশ্য এখন বিজ্ঞানের বড় অংশের দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে– তা তাত্ত্বিক ও পরীক্ষা উভয় দিক থেকে। পরীক্ষার কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানের অনেক এলাকা আছে যেখানে সরাসরি পরীক্ষা করা সম্ভব নয়– না পর্যবেক্ষণ, না এক্সপেরিমেন্ট। যেমন মহাজাগতিক বিষয়গুলোর কথা ধরা যাক্। বিগব্যাঙ মুহূর্তে মহাবিশ্বের জন্মের সময় ঠিক কী হয়েছিলো; তার ক্ষুদ্র সময় পরেও বা কী হয়েছিলো; তারার জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর সময় ঠিক কী ঘটে– এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে সরাসরি সেই সব প্রক্রিয়ার ওপর কোন পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়, কোন এক্সপেরিমেন্টে ঠিক সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভব। অথচ আমরা এমন সব মাপজোকের কথা বল্ছি যার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত তত্ত্বগুলো প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেল্তে পেরেছি। এটি কীভাবে সম্ভব হলো? হয়েছে একমাত্র কম্পিউটার মডেলিঙের মাধ্যমে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নানা বিজ্ঞানের নিয়মগুলো দিয়েই মডেল গড়েছি বলে তার ওপর আমাদের আস্থা আছে; সেই মডেলই বলে দিচ্ছে কিসের পর কী হয়েছিলো। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

আজ এই ২০২২-২৩ সালে এসে কী কী ঘট্‌ছে তা আমরা দেখতে পারছি, মাপতে পারছি। কম্পিউটার মডেলিং কিন্তু এসব কথা আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগেই হুবহু বলে দিয়েছিলো– আমাদের আচরণ কী রকম হলে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন কী হবে এক এক করে নানান্ দৃশ্যপটেই সেই ভবিষ্যদ্বাণী মডেল থেকে এসেছিলো। আজ তা হুবহু মিলে যাচ্ছে; ৫০ বছর, ১০০ বছর পর কী হবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও যে মিলে যাবে তা বলাই বাহুল্য। কাজেই এসব আমাদেরকে গুরুত্ব সহকারে নিতে হচ্ছে বিশ্বকে ও নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

কম্পিউটার মডেলিং হুবহু এক্সপেরিমেন্টের কাজও করতে পারে- অর্থাৎ শুধু মডেল ও জানা উপাত্ত থেকে হিসেব নিয়ে এটি ভবিষ্যদ্বাণী করেনা, বরং সম্পূর্ণ অজানা, সম্পূর্ণ অভিনব এক্সপেরিমেন্ট ফলাফলও এটি দিতে পারে– ল্যাবেরোটরিতে যন্ত্রপাতি নিয়ে করা এক্সপেরিমেন্ট যেভাবে দেয় সেভাবে। যন্ত্রপাতি দিয়ে কোন দিন করা যাবেনা এমন এক্সপেরিমেন্ট এখন কম্পিউটার করতে পারছে। আবার করা যায় এমনগুলোও করছে, নানা কারণে। দু'রকমের এক্সপেরিমেন্ট মিলিয়ে দেখার জন্য সেটি করা হয়; যন্ত্রপাতি নিয়ে সত্যি সত্যি প্রকৃতির ওপর করলে তাতে প্রকৃতির ও মানুষের ক্ষতি হতে পারে এমন আশঙ্কার কারণে তা কম্পিউটারের ওপর করা হয়– যেমন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ সংক্রান্ত এক্সপেরিমেন্ট। দ্রুত অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করতে বা ছাত্রদেরকে স্বল্পব্যয়ে এক্সপেরিমেন্টের চর্চা করাতে এগুলো সুবিধাজনক। এই সঙ্গে কম্পিউটার সংক্রান্ত আরো একটি জিনিসের ব্যবহার এখন খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে– তা হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অকল্পনীয় সংখ্যক উপাত্ত যোগাড় করা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রয়েছে বলে এটি অনেক ফলাফল দ্রুত ও অত্যন্ত দক্ষ ভাবে নিংড়ে আনতে পারে। এই সুবাদে 'মেশিন লারনিং' নামে পরিচিত ব্যবস্থায় সে নিজেই নিজেকে অধিকতর সক্ষম করতে পারে, নিজের কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজেই লিখতে পারে। তত্ত্ব ও পরীক্ষা এই যুগলবন্দীর দুই দিকেই দারুণ অংশ নিতে যাচ্ছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

**পরীক্ষণ কাজের চেহারাঃ**

পরীক্ষণ কাজের একেবারে আধুনিকতম চেহারার খানিকটা আমরা ইতোমধ্যে দেয়া উদাহরণগুলোতে দেখে ফেলেছি। একজন পরীক্ষণ বিজ্ঞানীর কাজের কিছু স্বকীয়তা রয়েছে, যা শত শত বছর ধরে তেমন পরিবর্তিত হয়নি। এমনকি বিজ্ঞান ইতিহাসের একেবারে শুরুতে গিয়ে, যখন লিপিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বর্ণনার

চল্ হয়েছে তখনকার চিত্র থেকেও এই চেহারা খুব ভিন্ন নয়। ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয় পুরোহিত বিজ্ঞানীরা যেভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন, সরু নলকে ফ্রেমে কয়েক রাতের জন্য স্থায়ীভাবে আটকিয়ে তার ভেতর দিয়ে একটি গ্রহের ওপর দৃষ্টি ফেলতেন, জ্যামিতি বাক্সের চাঁদার মত জিনিস দিয়ে সেই গ্রহের কৌণিক অবস্থান নির্ণয় করতেন– আজও ভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেরকম কিছুই তো পরীক্ষণরত জ্যোতির্বিদ করে থাকেন। তখন এবং এরপর বিজ্ঞানীদের কারো কারো মধ্যে এভাবে পর্যবেক্ষণের রীতিটি প্রচলিত ছিল এবং তা জ্যোতির্বিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রকৃতিতে এবং মানুষের কাজের ফলে যে সব ধাতব ও অধাতব বস্তু তৈরি হচ্ছিলো সে সবের পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে প্রকৃতিতে উদ্ভিদজগত ও প্রাণিজগতের নানা দিকের পর্যবেক্ষণ এটি বিস্তৃত ছিল। এ সবের ওপর ভিত্তি করে কালে কালে যে সব ক্যাটালগ, তালিকা বা নথি তৈরি হয়েছে সেগুলো থেকে আমরা এসব জানতে পারি। তাত্ত্বিকরা তাঁদের পছন্দমত যত তত্ত্বই দেননা কেন এই সব সরাসরি পর্যবেক্ষণের ফলাফলকে তাতে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া এসব ক্যাটালগ বা তালিকার হাতেনাতে অনেক ব্যবহার ছিল যা মানুষের কাজে লাগতো। যেমন জ্যোতির্বিদ্যার ক্যাটালগ থেকে দীর্ঘতম দিন ইত্যাদি, চাঁদ বা সূর্যের গ্রহণ, কৃষির বিভিন্ন উপযুক্ত সময়, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদির দিন জানা যেতো; চিকিৎসাবিদ্যার ক্যাটালগ থেকে রোগের লক্ষণ বা শরীরের অবস্থা, উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথ্য থেকে তার ছবি, বর্ণনা, ব্যবহার ইত্যাদির। কিন্তু পরীক্ষণের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদ্ধতি সেই এক্সপেরিমেন্টের প্রচলন আধুনিক বিজ্ঞান আসার আগে খুব বেশি দেখা যায়নি। কিন্ত তারপর থেকে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা বিজ্ঞানীর একটি নিত্যকাজ হয়ে দাঁড়ায়– বিশেষ করে পরীক্ষণ বিজ্ঞানীদের। এক্সপেরিমেন্টে থাকে বিজ্ঞানীদের নিজস্ব আয়োজন যেখানে তাঁরা ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন; যেমন উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ নিয়ন্ত্রিত চাপে, অথবা তাপে পরীক্ষণ পাত্রকে রেখে কোন কিছুর আচরণ কী হবে তা যখন যে ভাবে দরকার সেভাবে নির্ণয় করতে পারেন, কোন একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রেখে সে অবস্থায় ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। অথচ সাধারণ পর্যবেক্ষণে প্রাকৃতিক পরিবেশেই তা করতে হয়, বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণ থাকেনা।

আধুনিক বিজ্ঞানের শুরুতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ একজন সৃষ্টিকারের নিজের ভাষায় এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দেখে আমরা বুঝবো যে বিজ্ঞানীর এই ধরনের কাজটির

ধারণা যেন সনাতনভাবে সবার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। নিউটনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অপটিক্সের' (আলোকবিদ্যা) থেকে খানিকটা দেখা যাক।

"এক নম্বর এক্সপেরিমেন্ট।

ত্রিভূজাকৃতি একটি কাচের প্রিজম যোগাড় করলাম যার সাহায্যে নানা রঙের ছটা দেখতে পাওয়া যায়– যে ব্যাপারটি ইতোমধ্যে জানতে পেরেছিলাম। আমার কামরাটি অন্ধকার করে নিলাম, শুধু জানালার শাটারে ছোট একটি ছিদ্র রাখলাম যার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় অল্প পরিমাণ সাদা আলো ঢুকতে পারে। আলো যেখান দিয়ে ঢুকছে প্রিজমটি সেখানে রেখে এর মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত আলো বিপরীত দেয়ালে পড়তে দিলাম। শুরুতে ওখানে পড়া উজ্জ্বল তীব্র নানা রঙের আলো দেখে মোহিত হয়ে রইলাম বটে তবে শিগ্‌গির একটু গভীর চিন্তা করতেই এলো অবাক হবার পালা। লম্বা আলোকিত ওই অংশটি উপবৃত্তাকার হয়ে কেন পড়লো, প্রতিসরণের জানা নিয়ম অনুযায়ী এটি তো বৃত্তাকার হয়ে পড়ার কথা। দুই পাশে আলো সরল রেখায় পর্যবেশিত হয়েছে বটে তবে প্রান্তে এতো ধীরে ধীরে কমে এসেছে যে আকৃতি বুঝতে পারা কঠিন, অবশ্য অর্ধবৃত্ত বলেই মনে হলো। এই উজ্জ্বল বর্ণালীর দৈর্ঘটি প্রস্থের প্রায় পাঁচ গুণ বড়, অনুপাতটি এতই বেঢক যে এর কারণ বের করতে আমি বেশ উৎসাহিত হলাম।"

"দুই নম্বর এক্সপেরিমেন্ট।

সন্দেহ হচ্ছিলো রঙগুলোর এভাব লম্বাটে হয়ে পড়াটি প্রিজমের কাচের ভেতরের কোন বিকৃতির কারণে ঘটেনি তো। এটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ঠিক একই রকম আরেকটি প্রিজম এমন ভাবে রাখলাম যেন পর পর দুটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রথমটি আলোকে যে পথে প্রতিসরিত করেছে দ্বিতীয়টি তাকে উল্‌টো আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ভাবছিলাম এর মাধ্যমে প্রথম প্রিজমের নিয়মিত গুণ আলোকে যা করবে দ্বিতীয় প্রিজমের নিয়মিত গুণ তা পুরো নাকচ করে দেবে। কিন্তু প্রথম প্রিজমের বিশেষ প্রকৃতির কারণে সৃষ্ট বিষয় দ্বিতীয় প্রিজমের কারণে বরং দ্বিগুণ হবে। প্রকৃত পক্ষে যা পেলাম তা হলো প্রথম প্রিজম আলোকে যেভাবে লম্বাটে করছিলো দ্বিতীয় প্রিজম তাকে আবার বৃত্তাকার আকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো, যেন আলো এই দুই প্রিজমের মধ্য দিয়ে কখনো যায়ইনি। কাজেই বোঝা গেলো আলোর ওই লম্বাটে হওয়াটির কারণ আর যাই থেকে তার উৎস প্রিজমের অনিয়মিত কোন গুণের মধ্যে নয়।"

প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে করা নিউনের এই প্রথম দিককার এক্সপেরিমেন্টের মত সোজা-সাপটা পরীক্ষণ এখনো যে হয়না তা নয়, যদিও অধিকাংশ এক্সপেরিমেন্ট আকারে-বহরে-ব্যয়বহুলতায় তাকে অনেক অনেক গুণে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সব সময় বিজ্ঞানে পরীক্ষণের যে মূল প্রেরণা তা এতে সুন্দর ফুটে উঠেছে; এবং তার থেকে বিজ্ঞানীর এই কাজের স্বকীয়তাটি বেশ বোঝা যায়। যতই বিজ্ঞান এগিয়েছে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সংবেদনশীলতা ততই বেড়েছে– ফলে এর পরিমাপগুলো আরো অনেক নিখুঁতভাবে প্রকৃতির সত্যিকার মানের সঙ্গে মিলতে পেরেছে। প্রাসঙ্গিক কারণের বাইরে অন্য কোন কিছুর প্রভাবে এই সংবেদনশীল যন্ত্র যেন ভিন্নতর পরিমাপ না দিতে পারে যেই আশঙ্কাগুলো দূর করাও পরীক্ষার একটি বড় কাজ হতে লাগলো। এমন বাইরে প্রভাবকে বলা যায় নয়েজ বা কোলাহল। সংবেদনশীলতা বাড়ানো আর কোলাহল কমানো পরীক্ষণ বিজ্ঞানীর বড় কাজ হিসেবে দেখা দিলো; তা ছাড়া মূল কাজটি তো অবশ্য সব থেকে জরুরি– সঠিক এক্সপেরিমেন্ট অথবা পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা ও ডিজাইন করা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পরম স্থান ও পরম কালের বিষয়গুলোকে বোঝার জন্য এবং ইথার নামক যে কাল্পনিক বস্তুতে এই পরম স্থানের সর্বত্র সম্পৃক্ত মনে করা হচ্ছে তার প্রকৃতিকে স্পষ্ট করার জন্য মাইকেলসন ও মর্লি তাঁদের বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্টটি আয়োজন করেছেন। আলোক তরঙ্গ সর্বত্র ব্যাপ্ত ইথার সমুদ্রেই ঢেউ তোলে। তাই পৃথিবী থেকে আলো পৃথিবীর পরিক্রমণের দিকে নিক্ষেপ করলে আলোর যেই বেগ হবে পরিক্রমণের দিকের সঙ্গে সমকোণে তা নিক্ষেপ করলে ভিন্নতর বেগ পাওয়ার কথা– এই ভিন্নতা ঠিকঠাক ইথার তত্ত্বটি সমর্থন করে কিনা সেটিই তাঁরা দেখার চেষ্টা করছিলেন। বেগের পার্থক্যটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও তা যেন ধরা পড়ে সে জন্য তাঁরা ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করছিলেন যা অত্যন্ত সংবেদী। তখন বেগের কোন ভিন্নতা না পাওয়ার যে অতি বিস্ময়কর ফল তাঁরা পেয়েছিলেন সমসাময়িক বিজ্ঞানে দ্বারা সমর্থিত না হলেও সবাই সেই ফলাফলের ওপর আস্থা রেখে বরং তত্ত্বকেই আগাগোড়া বদলে দেয়াটিই মেনে নিয়েছিলেন।

এই ইন্টারফেরোমিটারের নীতির ওপর ভিত্তি করেই তারও শত বছরেরও বেশি সময় পর ২০১৬ সালে আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী করা মহাকর্ষ তরঙ্গ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের আবিষ্কারের পর

১০০ বছর এই উদ্ঘাটন সম্ভব হয়নি মহাকর্ষ তরঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় পৃথিবীতে পৌঁছানোর ফলে একে ধরতে পারার মত কোন সংবেদনশীল যন্ত্র তৈরি সম্ভব হয়নি বলে। কিন্তু ওই ইন্টারফেরোমিটারের প্রক্রিয়াকে আরো অনেক বেশি সংবেদনশীল করে লিগো (লেজার ইন্টারফেরোমেট্রিক গ্র্যাভিটিওয়েভ অবজারভেটরি) নামক ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছিলো নানা দেশের বহু সংখ্যক বিজ্ঞানীর সম্মিলিত চেষ্টায়। যুক্তরাষ্ট্রের পরস্পর থেকে অনেক দূরত্বে থাকা দুই শহরে একই আয়োজন করে এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছিলো ২০১৬ সালে। যেই অতি ক্ষুদ্র প্রকৃত সিগন্যাল মহাকর্ষ তরঙ্গের উপস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছে– তার মতো সিগন্যাল আরো নানা কারণে সৃষ্টি হতে পারে– যেমন দূরে ট্রাকের চলাচল, চাঁদের আকর্ষণ, বা এমনিতরো আরো বহুতরো জিনিস। এগুলো সবই সেই নয়েজ বা কোলাহল। এগুলো যেন না ঘটে, ঘটলেও যেন নাকচ করা যায় তা ছিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের একটি বড় কাজ। তাছাড়া নয়েজ হলে তা বোঝা যাবে কারণ পরস্পর এত দূরে থাকা দুই শহরের লিগো যন্ত্রে একই নয়েজ ঠিক একই সময় ঘটার সম্ভাবনা নেই বল্‌লেই চলে।

এক্সপেরিমেন্টে বিজ্ঞানী নিজস্ব চাহিদামত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। ধরা যাক যেই বদ্ধ পাত্রের মধ্যে এক্সপেরিমেন্টটি ঘটবে তার ভেতর বলতে গেলে বাতাসের বা অন্য কোন গ্যাসের কোন অণুই থাকতে পারবেনা। উদাহরণ স্বরূপ কোন কৃস্টালের সুনির্দিষ্ট তলটিকে যদি উন্মুক্ত ('পরিস্কার') অবস্থায় রেখে তার ওপর গবেষণা চালাতে হয় তাহলে সে রকম অতিমাত্রার শূন্যস্থানের প্রয়োজন আছে। অল্প কিছু গ্যাস অণুও যদি আগে থেকে থাকে তা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ওই তলটির ওপর সেই অণুগুলো আটকে গিয়ে তার উন্মুক্ত থাকার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। অন্তত পরীক্ষা চলাকালীন ঘন্টা খানেকের জন্য হলেও ওই পাত্রে এমন 'শূন্য' অবস্থা সৃষ্টি করা চাই যা গভীর মহাশূন্যের সঙ্গে তুলনীয়। এমন অবস্থা সৃষ্টি খুব দক্ষ পাম্পের দিনরাত নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভব যেরকম পাম্প খুবই সামান্য যে দু'চারটি গ্যাসের অণু ভেতরে দেখা দেয় তাকেও বের করে দিতে সক্ষম। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ নয়, গ্যাস পাম্প হচ্ছে বটে কিন্তু নতুন নতুন উৎস থেকে আরো গ্যাস অণু ভেতরে এসেও যাচ্ছে। যেমন আপাত নিশ্ছিদ্র ওই পাত্রে অদ্ভুত রকম সূক্ষ্ম কিছু ছিদ্রই তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া যে বস্তুগুলো দিয়ে এর দেয়াল তৈরি এবং এর ভেতরে থাকা পরিমাপ যন্ত্র ও কৃস্টাল ইত্যাদি ধারণের অংশগুলো তৈরি,

সে সবের গায়ের সঙ্গেও কিছু অণু থেকে যায়। এর প্রত্যেকটিকে গ্যাসমুক্ত করতে হয়, নইলে ওই গ্যাস অণু সাধারণত বস্তুর সঙ্গে লেপটে থাকলেও ওরকম নিম্ন চাপে এগুলোও উঠে এসে ভেতরে গ্যাস অণু বাড়াতে থাকে। কাজেই সব কিছুকে দিনের পর দিন উত্তপ্ত করে পুরো গ্যাসমুক্ত করা যেমন চাই, তেমনি ওই অত্যন্ত লুক্কায়িত সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো একে একে উদ্ঘাটন করে সেগুলো বন্ধ করাটিও জরুরি। এ বইয়ের লেখকের নিজের একটি গবেষণার অংশ হিসেবে করা এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে মূল এক্সপেরিমেন্টের নানা খুঁটিনাটি পরীক্ষণকারীকে যতখানি ব্যতিব্যস্ত রাখে চাহিদামত পরীক্ষণ-পাত্রের ভেতরের পরিবেশটি তৈরি করা ও তা বজায় রাখাটিও তাঁকে কম ব্যতিব্যস্ত রাখেনা।

ওপরের অতিমাত্রার শূন্যস্থানের বর্ণনাটি একটি ছোটখাট পরিসরের পাত্রের মধ্যে করা এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে, যা একজন বিজ্ঞানীই দিব্যি করে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের মত অত্যন্ত বিশাল ও শক্তিশালী কণিকা ত্বরকের কথা চিন্তা করি যার মাইলের পর মাইল নলের মধ্যে সে রকমই অতি বিশেষায়িত, গ্যাসশূন্য শুধু নয় সম্ভাব্য সব রকম প্রভাবমুক্ত পরিবেশ যদি সৃষ্টি করতে হয় তার আয়োজন ও সতর্কতাকে যে কতদূর নিয়ে যেতে হয় তা ভাবতেই মাথা ঘুরে যাবে। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ মানুষকে সার্বক্ষণিক এর সঙ্গে জড়িত থাকতে হয়। যাকে এক্সপেরিমেন্টের এপারেটাস অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, পাত্র ইত্যাদির সমষ্টি বলা হয় তার উৎস-বৈচিত্রটিও দেখার মত। এখনো এমন এক্সপেরিমেন্ট বিজ্ঞানীরা করেন যেখানে নিজের হাতে এই এপারেটাসের একটি বড় অংশ গড়ে তোলেন। ওপরে বর্ণিত অতিমাত্রার শূন্যস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত এক্সপেরিমেন্টে লেখক অনেকটা তাই করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষায়িত কোম্পানী সমূহের তৈরি অতি সূক্ষ্ম অংশের সঠিক সংযোজনের মাধ্যমেই আজকের এপারেটাস গড়ে ওঠে। এসব থেকে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী ও পরীক্ষণ বিজ্ঞানীর কাজের চেহারার যে ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এটি আগেও ছিল, কিন্তু ক্রমাগত বেড়েছে।

## তত্ত্ব-পরীক্ষা আলাপের ফলশ্রুতি

### উভয়ের ফল মিলে যাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণঃ

বিজ্ঞানের তত্ত্বের পেছনে প্রায়ই যথেষ্ট আন্দাজ থাকে, কল্পনা থাকে, তাত্ত্বিকের নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা থাকে। এসব সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক এক্সপেরিমেন্টের সকল

জটিলতা অতিক্রম করে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলটি যখন ওই আন্দাজ বা কল্পনা করা তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যায়, সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি মহাকাব্যেরই উপযুক্ত বটে! এটি আরো বিস্ময় সৃষ্টি করে যখন দেখি সাম্প্রতিক কালের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এমন সব পরিস্থিতির কথা বলে, যেগুলো আমাদের সাধারণ চিন্তায় আসার কথাতো একেবারে নয়ই, আমাদের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক চিন্তাতেও ধারণ করা যায়না। তারপরেও এক্সপেরিমেন্টে সেগুলো কড়ায় গণ্ডায় প্রমাণিত হতে দেখা যায়। তত্ত্বের ও পরীক্ষার উভয়ের খুঁটিনাটিতে যে যার যার মত অসংখ্য চ্যালেঞ্জ আছে সে তো আমরা দেখেছিই। তারপরও নিখুঁত মিলটি বলে দিচ্ছে যে ওই প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ ভাল মতে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, নইলে ওই মিল সম্ভব হতো না। তবে এদের চ্যালেঞ্জ যে বহুদিন ধরে অধরা থেকে যায় সেই উদাহরণও কম নেই। তাই কোন কোন তত্ত্ব অত্যন্ত সুচারু ভাবে, অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বহু দিন বিরাজ করলেও তার ওপর রায় দিতে পারার মত কোন পরীক্ষা করা ওই সময় সম্ভব হয়নি। আবার পরীক্ষায় এমন অভিনব অদ্ভুত কিছু পাওয়া গেছে যে তার কোন গ্রহণযোগ্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া অনেকদিন সম্ভব হয়নি। এরকম অনেক উদাহরণ আমরা এ বইয়ে দেখেছি। উভয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিস্থিতি এনে এর সুরাহা হতেও দেখেছি।

এদিক থেকে পরীক্ষার একটি অগ্রগণ্যতা আছে। কোন খুঁত না থাকলে পরীক্ষার ফলাফলকে সব সময় আমাদেরকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়, কারণ তা তো প্রকৃতিরই প্রতিফলন, প্রকৃতি তো ভুল কথা বল্‌তে পারেনা। এসব ক্ষেত্রে দায়টি সব সময় তত্ত্বের ওপরেই থাকে– ওই সত্যের উপযুক্ত তত্ত্ব খুঁজে নেয়া। প্রাচীন কালে গ্রীক দার্শনিকদের হাতে যখন তত্ত্বেরই জয় জয়কার ছিল তখনো পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের কথাটি মেলাবার জন্য নানা কসরৎ তাত্ত্বিকদেরকে করতে হয়েছে; কখনো কখনো তাকে গোঁজামিলের মত মনে হলেও। নিজে যা দেখেছি তার সম্মান সেদিনও কম ছিলনা, আজ তো বটেই। তাত্ত্বিক দিক থেকে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার হলও অতিপরিবহনের ঘটনা পরীক্ষার মধ্যে দেখা যাবার পর, মাইকেলসন-মর্লি পরীক্ষায় আলোর গতিবেগের অদ্ভুত সমতা দেখার পর, এসব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক ভাবে অপ্রত্যাশিত পরীক্ষণ-ফলের ব্যাখ্যার দায়টি তাত্ত্বিকদের উপরেই বর্তিয়েছিলো। অন্য দিকে তত্ত্ব যত ভালভাবেই দেয়া হোকনা কেন, তা বড়জোর আপাত সত্য; যতদিন পরীক্ষায় সত্য প্রমাণিত হয়না ততদিন ওভাবেই থেকে যায়। এমনকি

পরে অন্য পরীক্ষায় উল্‌টো কিছু পাওয়া গেলে ওই তত্ত্ব পরিত্যক্তও হতে পারে। তারপরও ওই আলাপ, ওই যুগলবন্দী, ওই মিলে যাওয়াটিই বিজ্ঞানের আসল ম্যাজিক সৃষ্টি করতে পারে। এ আলাপেরই ফলশ্রুতি বিজ্ঞানের সাফল্য। যখনই আলাপের সুর কেটে যায়, তখনই সাবধান হতে হয়। বিজ্ঞানকে তখন থম্‌কে দাঁড়াতে হয়।

আধুনিক যুগে এসে এটমের ছবি কেমন করে বার বার বদলাতে হয়েছে তা স্মরণ করা যাক। এর শুরুতে বিশেষ করে কেমিস্ট্রিতে এটমকে যেভাবে নিরেট মার্বেলের মত সব থেকে ক্ষুদ্র উপাদান মনে করা হয়েছে সেটি দু'হাজার বছর আগের গ্রীক এটমের ছবি থেকে খুব ভিন্ন ছিলনা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে এসে যখন পরীক্ষায় দেখা গেলো এটমের ভেতর থেকে ইলেকট্রন ইত্যাদি আরো ছোট জিনিস বের হবার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তখন দু'হাজার বছরের যে অবিভাজ্য এটমের (এটম কথাটির অর্থ 'কাটা যায়না') ধারণা তার থেকে বের হয়ে এসে স্বীকার করতে হলো এটমের ভেতরেরও একটি ছবি আছে– ওটি আবিষ্কার করা দরকার। জে জে থমসন সেই ছবির তত্ত্ব দিলেন 'কিসমিস ছিটানো পুডিঙের' মডেল দিয়ে। এই উপমায় পুডিংটি গোটা এটমের দেহ– পুরোটাই ধনাত্মক চার্জ, আর কিসমিসগুলো ঋণাত্মক কণিকা। তখনকার পরীক্ষাগুলো এর সঙ্গে মিল্‌ছিলো। কিন্তু তাঁর ছাত্র রাদারফোর্ড এমন এক এক্সপেরিমেন্ট করে একে নিখুঁত প্রমাণ চাইলেন যে তখনই ঘটলো বিপত্তি। এতে খুব পাতলা সোনার পাতের দিকে ধনাত্মক আলফা কণিকা বুলেটের মত ছুঁড়ে দিয়ে দেখা গেলো বেশ কিছু এরকম কণিকা সোনার এটমের ধনাত্মক অংশ থেকে সজোরে বিকর্ষিত হয়ে সোজা পেছনে চলে আসছে। বোঝা গেলো এটমে ধনাত্মক চার্জ পুরোটা জুড়ে নেই, মাঝখানে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। আর এতে না মিশে যাবার জন্য ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণাগুলোকে একে কেন্দ্র করে ঘুরতে হবে, যার যার কক্ষপথে। এটমের ছবি নিয়ে তত্ত্ব বদলে গেলো, এলো রাদারফোর্ডের 'সৌর জগতের মডেল' নিয়ে এটমের ছবি। উপমায় নিউক্লিয়াসটি হলো সূর্য আর ইলেকট্রনগুলো গ্রহ। ওটি দিয়ে প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছু জিনিস ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিলো।

কিন্তু এ তত্ত্বের মধ্যেও বিপত্তি যে রয়েছে তা স্পষ্ট। ঘুরন্ত ইলেকট্রন তো বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে শক্তি হারিয়ে ফেলবে, ইলেকট্রন ধনাত্মক

নিউক্লিয়াসে চলে আসবে কক্ষপথ ছোট করতে করতে, এটম চুপসে যাবে। এবার প্রাথমিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসে এটমকে রক্ষা করলো। ইলেকট্রন কক্ষপথেই থাকবে কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিজস্ব অদ্ভুত নিয়মে সেটি সম্ভব। কিন্তু চূড়ান্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বে তাও সইলোনা। অনিশ্চয়তার নিয়মে ইলেকট্রন কোন সুনির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে পারেনা– তাকে কিছুটা জায়গায় কুয়াশার মতো ছড়িয়ে থাকতে হয়। কাজেই সৌরজগতের মত ছবিও চল্‌লোনা, এলো কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক 'কুয়াশার' মত ছবি। এভাবেই চলেছে তত্ত্বে-পরীক্ষায় আলাপ। আর আমরা পেয়েছি তার ফলশ্রুতি এটমে নিখুঁত ছবি যা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এভাবেই বিজ্ঞান যেন দুই পায়ে হেঁটে যায়, একবার পরীক্ষার পা'টি বাড়ায়তো পরের বার তত্ত্বের পা'টি বাড়ায়। একটিকে এগিয়ে দিয়েছে বলেই অন্যটিকেও এগুতে হয়– নইলে হয়তো এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এই প্রক্রিয়াটি মনে হয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে কমবেশি সব সময় ছিলো। এক সময় তত্ত্বের পা বেশি চল্‌তো বলে হাঁটাটি কিছুটা টলোমলো ছিলো। আধুনিক বিজ্ঞান শুরুর পর থেকে হাঁটার স্থিতিশীলতা এসেছে।

**বিজ্ঞানী এখন হয় তাত্ত্বিক, নয় পরীক্ষকঃ**

আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক দিন পর্যন্ত আমরা একই বিজ্ঞানীকে তত্ত্ব ও পরীক্ষা উভয় রকম কাজ করতে দেখেছি। এখনো যে একাধারে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষক এমন বিজ্ঞানী যে দেখা যায়না তা নয়। কিন্তু প্রবণতাটি হলো এই দুইয়ের যে কোন একটি ভূমিকায় বিশেষায়িত হওয়া। কারণটি স্পষ্ট– তত্ত্ব ও পরীক্ষা উভয়েরই জটিলতা এখন এত বেশি যে দুটিতেই উচ্চ সাফল্য আশা করা কঠিন। বরং এখন আরো প্রবণতা হলো বড় বড় দলে কাজ করা– সেটি তাত্ত্বিকদের যেমন দল তেমনি পরীক্ষকদেরও দল। উভয় ক্ষেত্রেই দলের সবাইকে যে এক জায়গায় থেকে কাজ করতে হবে তাও নয়। পরস্পরের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা, একসঙ্গে কাজ করা, এসব পরস্পর থেকে অনেক দূরে থেকেও সম্ভব। একই সমস্যা নিয়ে প্রত্যেকে যার যার জায়গায় থেকে কাজ করেন, ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকে সম্মিলিত ভাবে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। একই ভাবে তাত্ত্বিকের দল ও পরীক্ষকের দলের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। বিজ্ঞান জিনিসটি এতই উদার যে কোম্পানীর ব্যবসায়িক স্বার্থ যেখানে জড়িত নেই সেক্ষেত্রে প্রতিযোগী বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী দলের মধ্যেও

খোলামেলা যোগাযোগ থাকাটিও বিচিত্র কিছু নয়। প্রতিযোগীরা জানেন সমস্যা সমাধানে কে কোনপথে এগুচ্ছেন। যাঁরা যেদিকটিতে অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে সেই অনুযায়ী স্বীকৃতিও দেয়া হয়।

এক সঙ্গে কাজ এখন শুধু বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘটেনা, অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীকে অনেক সামগ্রিক বিজ্ঞান-ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত ভাবে কাজ করতে হয়। কেমিস্ট্রি, জীববিদ্যা, জেনোম গবেষণা, পরিবেশবিদ্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক কেন্দ্রীয় সফ্‌টওয়্যার তথ্য ভাণ্ডার ইত্যাদি রয়েছে যা তাত্ত্বিক ও পরীক্ষণ উভয় দিকের কাজকে সহজতর করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের জেনোম বা সমগ্র জিনের ওপর যে কাজ চলমান রয়েছে তাতে কেউ যদি মানুষের বিশেষ কোন জিনের কাজ উদ্ঘাটন করতে চান তিনি অন্যান্য প্রাণীর ওই জিন অথবা অনুরূপ জিনের ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত জিনের কাজের যাবতীয় খুঁটিনাটি ওই তথ্যভান্ডারে খুবই সহজে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় পাবেন। এভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি বা ইনফরমেটিক্স তত্ত্ব বা পরীক্ষা নির্বিশেষে কাজে আসে এবং উভয় ধরনের বিজ্ঞানীকে এই দিকে তৎপর হতে হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারটিও এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক কালে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষকদের কাজ যে কোন একটিতে বিশেষায়িত হয়ে পড়ার ফলে বিষয়টি নিয়ে অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনীরও জন্ম হয়েছে। কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই বলার চেষ্টা করা হয় যে তাত্ত্বিকরা পরীক্ষণের ব্যাপারে এত আনাড়ি হন যে সাধারণ ল্যাবোরেটরির পাত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নাড়াচাড়ায়ও তাঁরা অস্বস্থি বোধ করেন। একই ধরনের কথা পরীক্ষণ বিজ্ঞানীদের সম্পর্কেও বলা হয় যে তাঁরা শুধু খাতা পেন্সিল সম্বল করে বিজ্ঞান চিন্তা করতে মোটেই পারঙ্গম নন। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার একজন সৃষ্টিকার বিখ্যাত তাত্ত্বিক ভোলফগ্যাং পলি এই ব্যাপারে রীতিমত কিংবদন্তির নায়ক হয়ে পড়েছিলেন 'পলি এফেক্ট' নামের একটি মজার গল্পের নায়ক হয়ে। গল্পের নামটিই এমন ভাবে দেয়া হয়েছে যেন এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য কাহিনীর কথা বল্‌ছে। বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের জন্য খ্যাত এই বিজ্ঞানী অন্য বিজ্ঞানীদের ভুলকে নির্মম রসিকতার সঙ্গে সমালোচনা করতেন বলে তাঁরা তাঁকে বিদ্রুপ করার জন্য এই পলি এফেক্টের কথা ছড়িয়েছেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছিলো। গল্পটি বলার চেষ্টা করছিলো কোন ল্যাবোরেটরিতে পলি ঢুকলেই ওখানকার কাজে নানা বিপত্তি ঘটতে শুরু করতো, পরীক্ষণে তিনি

এতই আনাড়ি ছিলেন যে তিনি ঢুকলেই দু চারটা কাচের পাত্র এমনিতেই ভেঙ্গে পড়তো, যন্ত্রপাতি বিকল হতে শুরু করতো। কোন কোন বিখ্যাত সহকর্মীতো নিজের ল্যাবোরেটরির সামনে দিয়ে পলির হেঁটে যাওয়াটাই বারণ করে দিয়েছিলেন, পাছে তাতেই পলি এফেক্ট ঘটতে শুরু করে।

# মহাকাব্য প্রযুক্তিকেও জড়িয়ে নিয়েছে

## আদিপর্বে মানুষকে রাখা হয়েছিলো কেন্দ্রে

বিজ্ঞানের মহাকাব্যটি রচনা যাঁরা শুরু করেছিলেন কোন্ ভাবনাটি তাঁদেরকে বেশি তাড়িত করেছিলো বলে মনে হয় ? খুব সম্ভব তাঁদের কেন্দ্রীয় ভাবনাটি ছিল নিজেকে নিয়ে- চারিদিকের যে প্রকৃতি সবকিছু যেন তাঁর জন্য, তাঁর সঙ্গে জড়াবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনে মানুষ যখন বাকি সব প্রাণীকে ছাড়িয়ে গিয়ে আত্মসচেতনতার গুণটি পেয়েছিলো তখন থেকেই এক প্রকার মানব-কেন্দ্রিকতা তাকে পেয়ে বসেছিলো। সে কারণেই একেবারে প্রাচীনতম যে প্রাগৈতিহাসিক চিত্র, মূর্তি ইত্যাদি আমরা খুঁজে পেয়েছি সেখানে অন্য প্রাণীর মধ্যে এমনকি নির্জীব বস্তুর মধ্যেও মানুষের মত আচরণ, মানুষের মত চিন্তা আরোপের একটি চেষ্টা দেখা যায়। পরবর্তীকালের বিজ্ঞান চর্চার প্রথম যে সব লিখিত বর্ণনা আমাদের হাতে এসেছে তাতে মানব কেন্দ্রিকতাটি আরো স্পষ্ট হয়েছে। তাতে দেখি প্রায় সকল সভ্যতার বিজ্ঞান চর্চায় মানুষকে স্থাপন করা হয়েছে প্রকৃতি জগতের কেন্দ্রস্থলে। সে কারণেই পৃথিবীকে রাখতে হয়েছে মহাকাশে দেখা যাবতীয় জ্যোতিষ্কগুলোর কেন্দ্রস্থলে আকাশ গোলকের মাঝখানে। এটি স্থির, তাকে কেন্দ্র করে অন্য সবাই ঘুরছে। এর কোন ব্যতিক্রম তখন কারো মনে হয়নি।

আরো বহু পরে প্রাচীন গ্রীকদের সময়ে এসেও যখন তর্ক-বিতর্কে যুক্তি ব্যবহার নিয়মে পরিণত হয়েছে, গণিতের প্রয়োগে অনেক কিছুই স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে, তখনো দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও মানুষের ওই কেন্দ্রিকতা থেকে সরে আসেননি। বরং উচ্চ গাণিতিক সক্ষমতা সম্পন্ন ওই জোতির্বিদরা অনেক খুঁটিনাটি সহ জটিল বিশ্বছবি খাড়া করে নিজেদের ওই কেন্দ্রিকতার সপক্ষে সব রকম যুক্তি দিয়েছেন। অথচ এর অন্যথা হওয়ার ভাল সাক্ষ্য-প্রমাণ তখনই তাঁদের মধ্যেই ছিল। শুধু তাই নয়, মুখে বলুন আর না বলুন আকারে ইঙ্গিতে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক নিয়ম এসেছে মানব জাতির সুবিধার জন্য। যেমন এরিস্টোটল তাঁর 'ফিজিক্স' নামক বইয়ে কাঠের অন্তর্নিহিত গুণের মত মৌলিক গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে কাঠের ভেসে থাকার ও জ্বলতে পরার সক্ষমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক

নিরপেক্ষতা নিয়ে খুঁজলে বরং আরো মৌলিক গুণগুলোর দিকেই তাঁর দৃষ্টি যেতো। কিন্তু সে সময়ের গ্রীকদের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির দিকে তাকালে কাঠ দিয়ে তৈরি জাহাজ-নৌকার এবং জ্বালানি কাঠের ব্যবহারের যে দারুণ গুরুত্ব ছিল সেটি তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো। আজকের দিনে লিখলে তিনি হয়তো কাঠের আঁশ থাকাকেই বেশি মৌলিক গুণ মনে করতেন- কারণ কাগজের মণ্ড তৈরি উন্নত দেশে কাঠের বড় ব্যবহার, আর তা আঁশের কারণেই সম্ভব।

এভাবে বিজ্ঞানকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রঙে রাঙিয়ে তোলার অভ্যাসকে পরে সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ মানুষের অভ্যাস বা চাহিদাতো বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করা উচিত নয়। বিজ্ঞানের পরবর্তী ইতিহাস এই সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছিলো একে একে মানব-কেন্দ্রিক তত্ত্বগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে। যেমন মহাবিশ্বে পৃথিবী তার কেন্দ্রীয় অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি, কপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের আবিষ্কার পৃথিবীকে সূর্যের অন্যান্য গ্রহের মত আর একটি আবর্তনশীল গ্রহে পরিণত করেছে। জীব বিবর্তনের তত্ত্ব মানুষকে পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর একটিতে পরিণত করেছে; যদিও মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, উচ্চতর চিন্তার সক্ষমতা সহ অনেকগুলো ব্যতিক্রমী গুণ বিবর্তিত হয়েছে তবুও জীব হিসেবে সবার সঙ্গে একই প্রক্রিয়ায় তা হয়েছে, বিবর্তিত একই ডিএনএ কোডিঙের মাধ্যমে। ওই উচ্চতর চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার একচেটিয়া দখল পৃথিবীতে মানুষের থাকলেও পুরো মহাবিশ্বের কথা চিন্তা করলে মানুষ ওই স্থান হারাতেও পারে। মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী খোঁজার বৈজ্ঞানিক আয়োজনগুলো বেশ কিছুদিন ধরে পালে হাওয়া পেয়ে আসছে। এর কারণ মহাবিশ্বের ওপর গবেষণা যত এগিয়েছে হুবহু পৃথিবীর মত পরিবেশ নিয়ে গ্রহ-উপগ্রহ ততই আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং এদের সংখ্যাটি যে বিশাল সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রাণের জন্য অপরিহার্য বস্তুপুঞ্জের সন্ধানও পাওয়া গেছে। যদিও সত্যি সত্যি কোন প্রাণীর অস্থিত্বের খবর পৃথিবীর বাইরে কোথাও থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তেমনটি থাকার এবং তাদের মধ্যে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা প্রচুর বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই সেদিক থেকেও বিজ্ঞান মানুষকে বিশ্বে কেন্দ্রীয় স্থান দিতে পারছেনা।

অনেকে কিন্তু এরপরও বিজ্ঞানের মধ্যে অদ্ভুত কিছু মানব-কেন্দ্রিকতা এখনো দেখতে পারছেন। বিজ্ঞানে, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায় কিছু ধ্রুবক আছে যা প্রকৃতির দ্বারা একেবারে নিখুঁত ভাবে নির্ধারিত। মহাকর্ষের ধ্রুবক, ইলেকট্রনের

চার্জ, আলোর ধ্রুব গতিবেগ এমনি ধারার আরো বেশ ক'টি ধ্রুবক রয়েছে যা মহাবিশ্বের সর্বত্র হুবহু একই মান বজায় রাখে। এগুলো কোন ভাবেই বিজ্ঞানীর দ্বারা নির্ধারিত হয়নি, অথচ এগুলোর বেশ ক'টির মানের সামান্য একটু যদি এদিক ওদিক হতো তা হলে মানুষের আবির্ভাব হতে পারতোনা। যেমন কোনটি ওরকম সামান্যতমও কম বা বেশি হলে মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জ দানা বেঁধে তারা গঠন করতে পারতোনা, যা না হলে কোন গ্রহ হতে পারতোনা, পৃথিবীও নয়। আবার কোন ধ্রুবক এদিক-ওদিক হলে পৃথিবীতে কোন প্রাণের মত পরিবেশ আসতে পারতোনা; এমনি ভাবে এমন বহু সংকট পরিস্থিতিতে প্রকৃতির দেয়া ধ্রুবকটির মান ঠিক এমন হয়েছে যেন মানুষ আসতে পারে, বিবর্তনে বিকশিত হতে পারে। তা দেখে কেউ কেউ ভাবতেই পারেন যে প্রকৃতিতে অনেক কিছু একেবারে খাপে খাপে মানুষের স্বার্থেই তৈরি হয়েছে। এটি এক ধরণের চরম মানব-কেন্দ্রিক চিন্তা। বিজ্ঞানের পক্ষে এমন কথা মেনে নেয়া কঠিন।

এমন মানব-কেন্দ্রিকতার দায় যেন বিজ্ঞানকে না নিতে হয় সে জন্য বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক ভাবে এই ধ্রুবকগুলো এসেছে, কিন্তু তারপরও এর প্রত্যেকটি মানুষ আসার অনুকূল হবার কারণের একটি হতে পারে বহু-মহাবিশ্বের তত্ত্ব (ইউনিভার্সের বা এক মহাবিশ্বের বদলে মালটিভার্স বা বহু-মহাবিশ্ব)। মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের সর্বাধুনিক তত্ত্বে এর সম্ভাবনা প্রমাণ করেছেন। এতে বলা হয় যে অসংখ্য মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে ও হয়েছে, যদিও এগুলোর একটি থেকে অন্যটিতে তথ্য যাওয়ার উপায় নেই বলে একের কথা অন্যটি থেকে কোনদিন জানা যাবেনা। আমরা এর একটির অর্থাৎ আমাদের নিজের মহাবিশ্বের বাসিন্দা, কারণ এই মহাবিশ্বেই মানুষ এসেছে। এখানে প্রকৃতির সবগুলো ধ্রুবক মানুষ আসার ও এখানকার প্রাণীরা আসার উপযুক্ত ছিল বলেই তারা এসেছে। অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতে এরকম হতেই পারে, এতে জোর করে মানব-কেন্দ্রিক হবার কিছু নেই। অন্য মহাবিশ্বগুলোতে খুব সম্ভব সেটি হয়নি, তাই ওখানে হয়তো মানুষ আসেনি, অন্য রকম কেউ আসলেও আসতে পারে। আমরা তা কোনদিন জানতে পারবোনা।

বিজ্ঞান নামক ব্যতিক্রমী মহাকাব্যটি মানুষ রচনা করেছে বটে, কিন্তু তাই বলে সেই মহাকাব্যে নিজেকে জোর করে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তোলার অধিকার তার নেই। তবে একবার নিরপেক্ষ ভাবে সেই মহাকাব্যের মূল গল্পটি তৈরি করে ফেলার পর তাকে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবহার করার অধিকার তার

ষোল আনাই আছে। এ মহাকাব্য রচনার প্রথম দিকে না করলেও শেষ অবধি এই অধিকার মানুষ পুরোপুরিই ব্যবহার করছে, আর তা করেছে বিজ্ঞান থেকে প্রযুক্তির সৃষ্টি করার মাধ্যমে।

## অতীতে প্রযুক্তিকে পৃথক রাখা হয়েছে

প্রযুক্তি জিনিসটি কিন্তু বিজ্ঞান নয়, এটি যে বিজ্ঞান মহাকাব্যে স্থান পাচ্ছে সেটি আসলে এ কাব্যের নতুন সংস্করণের ব্যাপার। এখন নিত্য ব্যবহার্য প্রযুক্তির মধ্যেই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলো দেখার সুযোগ বেশি পান, তাই তাঁরা সহজেই প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। আসলে গোড়া থেকেই প্রযুক্তি জিনিসটি জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার কৌশলের বিষয়, বিজ্ঞানের মত কৌতূহল মেটাবার বিষয় নয়। অবশ্য দুটিতেই সৃষ্টির আনন্দ রয়েছে। অতীতে ওই কৌশলগুলো বিজ্ঞান থেকে তেমন আসতোনা– আসতো অভিজ্ঞতা এবং মাথা খাটানো হাতযশ থেকে। এখনো প্রযুক্তি মাত্রকেই যে বিজ্ঞানের থেকে আসতে হয় এমন কোন কথা নেই, তবে এখন উন্নত প্রযুক্তির বেশির ভাগেরই উৎস বিজ্ঞানের মধ্যে। বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কার নতুন প্রযুক্তিরও জন্ম দেবে এমনটিই এখন আশা করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই দুটি কথাকে এক নিশ্বাসে বলার রীতিটি তাই এখন চালু হয়ে গেছে। কিন্তু তা হয়েছে মাত্র গত দু'তিনশ বছর ধরে; তার আগে তারা পৃথক ছিল।

মানব বিবর্তনের যে পর্যায়ে এসে মানুষ অন্য সব প্রাণী থেকে উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েছে তখন সে মস্তিষ্কের দুটি অভিনব সক্ষমতা গড়ে ওঠেছে। এর একটি হলো হাতিয়ার তৈরির মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা ও জীবনযাত্রাকে সহজতর করার ও অন্যটি হলো সবকিছুর প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করে তার রহস্য ভেদ করার আকাঙ্খা সৃষ্টির। লেখাজোকায় বর্ণনা মানুষ যখন থেকে করেছে সেগুলো পড়ে আমরা উভয় দিকেই মানুষের চর্চা ও পারদর্শিতার খবর পেয়েছি– প্রথম দিকটি প্রযুক্তি হিসেবে এবং দ্বিতীয় দিকটি সেকালের বিজ্ঞান হিসেবে। কিন্তু সেতো মাত্র হাজার পাঁচেক ধরে লেখালেখির সময়টার কথা। তার আগেও লক্ষ লক্ষ বছরের যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বিকশিত হয়েছে তাদের প্রযুক্তির খবর আমরা অনেক ভাবে পেয়েছি- বিশেষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পাথরের, হাড়ের ও অন্যান্য টেকসই জিনিসে তৈরি হাতিয়ার, কুশলী জীবনযাত্রার নানা চিহ্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাদের

কতখানি ছিল, এবং সেই কারণে কোন্ কোন্ রহস্যের তারা উদ্ঘাটন করেছিলো তখন লেখাজোকার অভাবে আজ সেটি জানা সম্ভব নয়, অন্তত সরাসরিভাবে সম্ভব নয়। মানুষের চিন্তার অতীত ধারাবাহিকতাটি ধরে নিলে তাদের মধ্যেও বিজ্ঞান চিন্তা বিকশিত হয়েছিলো এটি আমরা ধরে নিতে পারি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চলে আসা কখনো বাস্তবধর্মী আবার কখনো বিমূর্ত নানা শিল্পকর্ম– চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি দেখে তাদের উচ্চতর চিন্তার যে সন্ধান পাই, একই মানুষগুলোর যে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তাও থাকবেনা, হঠাৎ প্যাঁচ হাজার বছর আগে এসে দেখা দিয়েছে এমন ভাবা ঠিক হবেনা, তবে তাদের প্রযুক্তি চিন্তার সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তার কোন সংযোগ ছিল কিনা তা জানা সম্ভব নয়। অন্তত পরবর্তী কালে যখন উন্নততর সভ্যতাগুলোতে লেখাজোকা চালু হওয়াতে আমরা এ সম্পর্কে জানতে পেরেছি তখন এমন কোন সংযোগ দেখতে পাইনি।

শিকারি-সংগ্রাহক মানুষরা কৃষিজীবী হয়ে যখন গ্রাম ও নগর সভ্যতার সৃষ্টি করেছে তখন জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশই শুধু কৃষিতে তাদের শ্রম ও কুশলতা দিয়েছে, অন্যরা ঘরামি, ছুতার, কুমোর, ধাতুশিল্পী ইত্যাদি পেশায় বিভক্ত হয়ে নিজেদের জীবিকাকে নানা দিকে নিয়ে গেছে। তবে অল্প কিছু মানুষ রাজন্য, শাসক, অভিজাত, পুরোহিত, পন্ডিত ইত্যাদি হিসেবে সামাজিক বিভাজনের উঁচু স্থানগুলো দখল করেছে। দেখা গেছে এই বিভাজনে সাধারণ কুশলী দক্ষ মানুষগুলোর মধ্য থেকেই এসেছে নানা নতুন নতুন প্রযুক্তি, আর শেষে বলা ওই উঁচু তলার মানুষদের হাতেই ছিল বিজ্ঞান চর্চার কাজ। যেহেতু সমাজের উভয় অংশের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান এবং দক্ষ কুশলী মানুষদেরকে সাধারণভাবে নিচু তলার মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কুশলীদের কাজের সুবিধা সবাই ভোগ করলেও বিজ্ঞানী পণ্ডিত-পুরোহিতরা ওই কুশলীদের কাজের খবর নেয়া বা তাতে অবদান রাখার গরজ অনুভব করেনি। প্রধানত এ কারণেই সেই গোড়া থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক কালের কাছাকাছি সময় অবধি বিজ্ঞানে আর প্রযুক্তিতে বিশেষ মুখ দেখাদেখি হয়নি।

ওই ব্যবধান এবং ওই কুশলীদেরকে নিচু ভাবে দেখার ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়েছে যখন মিশরীয়, মেসোপোটেমীয়, চীনা ইত্যাদি বড় বড় সভ্যতায় বড় বড় স্থাপনা ও প্রযুক্তির কাজ দেখতে পাই, কিন্তু তাদের বইপত্রে সেই প্রযুক্তির বর্ণনা তেমন দেখিনা। অন্যদিকে বিজ্ঞান গবেষণার নানা খুটিনাটি তথ্য-উপাত্ত, ক্যাটালগ ইত্যাদি প্রচুর তাতে রয়েছে। গণিত, জ্যোতির্বিদরা,

চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির বর্ণনা সেখানে পড়ে আমরা মুগ্ধ হই কী ভাবে এত আগে তাঁরা এই শাস্ত্রের শুধু গোড়া পত্তন করেননি, বরং তা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। উঁচু তলার পুরোহিত-বিজ্ঞানী, চিকিৎসক-বিজ্ঞানী, পন্ডিত-বিজ্ঞানীরাই এগুলো করেছেন, এবং লিখেছেন; লেখার ক্ষমতাও ছিল শুধু তাঁদেরই। তাঁরা কারিগর-মিস্ত্রিদের কাজ নিয়ে বেশি কিছু লেখেননি কারণ ততদিনে ওই কুশলীরা অনেকে এসেছেন একেবারে দাস করে রাখা মানুষদের কাছ থেকে– তাঁদের অধিকাংশ অমানুষিক শ্রম দিতে বাধ্য করলেও কেউ কেউ বিভিন্ন প্রযুক্তিতে উচ্চ কুশলতাও দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ মিশরের পিরামিড তৈরির মত অত্যন্ত বিশাল আকারের স্থাপনার খুবই দুরূহ প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা হয়েছিলো তা আধুনিক গবেষকরা ভেবে বের করছেন, পিরামিড নির্মাতারা লিখে যাননি। কীভাবে এত বড় পাথরকে বহু দূর থেকে আনা হলো, সাইজ করে কাটা হলো, ওপরে তোলা হলো, এত মসৃণ ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ফিট করানো হলো, স্থাপনাকে এমন নিখুঁত পিরামিড আকৃতি দেয়া সম্ভব হলো– সবই এখন ভেবে বের করতে হচ্ছে। অন্যদিকে চিকিৎসার অস্ত্রোপচার ও বিশেষ করে ফেরাউন ও অভিজাত মানুষদের মৃত্যুর পর তাঁদের দেহের মমি করার যে প্রযুক্তি তার খুঁটিনাটি প্রাচীন মিশরীয়দের প্যাপিরাসে পাওয়া যায়। এটি ব্যতিক্রম কারণ চিকিৎসকরা ছিলেন অস্ত্রোপাচারের, এবং পুরোহিতরা ছিলেন মমি করার দায়িত্বে– এ কাজ দুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মিশ্রণ এবং উঁচু দরের কাজ বলে বিবেচিত। কাজেই তাঁদের হাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরস্পর মিশতে পেরেছে, তা তাঁদের বইতে লিখিত হতে পেরেছে সম্মানের সঙ্গে।

পরবর্তী সময়ে গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগে বিজ্ঞান চর্চা অনেক উচ্চে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তা কালজয়ী বেশ কিছু গ্রন্থে লিপিবদ্ধও হয়েছে। কিন্তু তা শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লৌহ যুগের এই সভ্যতায় নানা প্রযুক্তির বিকাশের সুযোগ ছিল এবং সে সুযোগ গ্রহণ করাও হয়েছে। বিশেষ করে যখন রোমানরা ওখানে শাসন কর্তৃত্বে এসেছে তখন প্রযুক্তির বিকাশ তুঙ্গে উঠেছে- অস্ত্র-বর্ম ইত্যাদির সহ নানা ধাতব হাতিয়ারে তারা সুসজ্জিত ছিল। উন্নত দালান নির্মাণ; সাম্রাজ্য জোড়া টেকসই রাস্তা নির্মাণ; আকুয়াডাক্ট, পাইপ ইত্যাদির মাধ্যমে দূর থেকে নগরে পানি আনা এবং তা বাড়িতে বাড়িতে, স্নানাগারে, ফোয়ারায় সরবরাহ করা ইত্যাদির জন্য তারা এখনো বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এর বেশির ভাগেরই কৃতিত্ব তথাকথিত দাসদের- যারা নিজদেশে কুশলী ছিল, রোমানদের

হাতে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হয়েছিলো। আর এই যে উন্নত প্রযুক্তি তাতে গ্রীক দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের এতো উন্নত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ উপাত্তের মিশ্রণে ভালো ভবিষ্যদ্বাণী, এই সব খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ প্রযুক্তি গ্রীকদের বিজ্ঞানের কাজে কোন অবদান রাখেনি। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটি এসব হতে দেয়নি।

এতে দুই পক্ষেরই ক্ষতি হয়েছে, তবে গ্রীক সভ্যতার দিক থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে বিজ্ঞানের। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই বিজ্ঞান এত এগিয়েছিলো যে এর শীর্ষ বিকাশের সময় (যাকে এর হেলেনিস্টিক অধ্যায় বলা হয়) খৃষ্ট জন্মের আগে পরে দু'তিন শ বছরে গ্রীকরাই আধুনিক বিজ্ঞান প্রায় নিয়েই এসেছিলো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিকতা তখন আসতে পারেনি যে বড় কারণে তা হলো এক্সপেরিমেন্ট করার অনিচ্ছা ও অপরাগতা। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য তত্ত্ব ও পরীক্ষার যেই যুগলবন্দীর প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখেছি সেটি ওখানে অনুপস্থিত ছিল। তত্ত্বে গ্রীক বিজ্ঞানীরা স্বচ্ছন্দ ছিলেন কিন্তু এক্সপেরিমেন্টে নয়। শুধু এক্সপেরিমেন্ট নয়, হাতে কলমে কাজ করে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তা তত্ত্বের সঙ্গে সমান তালে করার তেমন কোন প্রেরণা তাঁরা অনুভব করেননি। পরে দীর্ঘ মধ্যযুগের বেশির ভাগ সময় অন্যরাও এই ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন, প্রযুক্তিকে হেয় করেছেন, বিজ্ঞানে বাস্তব অনুসন্ধানকে এড়িয়ে চলেছেন– কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।

যে সব বিষয় বিজ্ঞানের কাজের মধ্যে একটু বেশি প্রচলিত ছিল, এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও কিছুটা জনপ্রিয় ছিল সেগুলোর মধ্যে প্রযুক্তির কিছু ছোঁয়া দেখা গিয়েছিলো মধ্যযুগে, ইসলামী বিশ্বে, চীনে এবং পরে ইউরোপে তার নমুনা দেখা গেছে। এর মধ্যে কোন কোনটিকে এখন আমরা বিজ্ঞানের পর্যায়ে না ধরলেও তখন বিজ্ঞানীরাও এর সঙ্গে জড়িত হতেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এক সঙ্গে দেখার ফলে তার একটি জনপ্রিয়তা ছিল। লোহাকে সোনা করার লক্ষ্যে এবং অমৃত তৈরির লক্ষ্যে নানা দ্রব্যের মিশ্রণ-বিক্রিয়ার সঙ্গে মন্ত্র চুকতাক ইত্যাদির সংযোগে যে আলকেমি তা আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান না হলেও সে সময় জনপ্রিয় ছিল। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান জানার লক্ষ্যে আরবরা আস্ত্রালোব নামের এক ধরনের যান্ত্রিক কম্পিউটার উদ্ভাবন করেছিলেন যা পরে ইউরোপীয় বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হতো, আরবদের জ্যোতির্বিদ্যায় পর্যবেক্ষণে উৎকর্ষ ও যান্ত্রিক কুশলতার ফলে এটি সম্ভব হয়েছিলো।

আলোকবিদ্যার ওপর গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেন্ট আরব বিজ্ঞানীরা করেছেন। হয়তো তারই ফলশ্রুতিতে ওখানেই চশমার ও অন্যান্য লেন্সের প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে প্রযুক্তিগুলো বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি, বা বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সংযোগটিও ছিল ক্ষীণ।

মধ্যযুগের একেবারে শেষের দিকে এসে ইউরোপে কিন্তু ব্যাপারটি উল্‌টে যায়। যদিও তখন খৃষ্টান চার্চ ভিত্তিক নতুন স্থাপিত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়েছে- সেই অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রিজ, প্যারিস, বলোনিয়া, পাদুয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের চর্চা যত হতো তার সঙ্গে দর্শন, কিছুটা গণিত ইত্যাদির মধ্যেই বাকিটা সীমাবদ্ধ ছিল। শেষ অবধি গ্রীক বিজ্ঞানটিও সেখানে আদর পেয়েছে বটে কিন্তু খৃষ্টান কিছু ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে একে মিলে যাওয়ার ধুয়া তোলে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের সমালোচনা ও পরিবর্তন চেষ্টাকে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য ধর্মদ্রোহের অপরাধে পরিণত করা হয় সারা ইউরোপে। এ কারণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেখানে প্রায় থেমেই গিয়েছিলো। অন্যদিকে প্রযুক্তিতে অগ্রণী নানা দেশ থেকে বিচিত্র প্রযুক্তি এনে তার উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহারে ইউরোপ ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছিলো, বিশেষ করে চীনে উদ্ভাবিত বহু প্রযুক্তি আরবদের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা পেয়েছিলো। দাসপ্রথা আগেই শেষ হয়েছিলো সেখানে, সামন্ত্রতন্ত্রের মধ্য দিয়ে জমির সঙ্গে মানুষকে আবদ্ধ করে রেখে কৃষি ভিত্তিক যে অর্থনীতি তাও ক্রমে আলগা হয়ে গিয়ে বাণিজ্যই সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছিলো বেশি। কম জনসংখ্যার কারণে প্রযুক্তির আদর বেড়েছিলো যার কুশলীরা যথেষ্ট প্রভাব ও সম্মান ভোগ করতেন। প্রত্যেকটি প্রযুক্তি চর্চার আলাদা আলাদা গিল্ড বা সমিতি ছিল যারা দেশে, এমনকি আন্তর্জাতিক ভাবেও কুশলীদের স্বার্থরক্ষা করতো। এগুলো আগেকার পরিস্থিতির সঙ্গে যথেষ্ট ভিন্ন। এমনি একটি আবহের মধ্যে চীন থেকে আসা বারুদ প্রযুক্তি এখানে কামান-বন্দুকের জন্ম দিয়েছে, একই দেশের জাহাজী প্রযুক্তি বাতাসের বিপরীতে যেতে সক্ষম লাটিন পাল, পেছনের হাল, দিগদর্শক কম্পাস ইউরোপীয়দেরকে সারা বিশ্বের সমুদ্রে অভিযাত্রা করার সুযোগ দিয়েছে এবং নদীর জলশক্তি, বায়ুকল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতির শক্তি আহরণেরও। ইউরোপে তখন বিজ্ঞান স্থিমিত, কিন্তু প্রযুক্তি বর্ধিষ্ণু; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।

## শিল্প বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাছে এনেছে

আধুনিক বিজ্ঞান আসার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান-মহাকাব্যে প্রযুক্তির জায়গা হয়নি। এক্সপেরিমেন্টের চল ছিলনা বলে বিজ্ঞান নিজের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার তেমন করেনি। বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করেছে তার অধিকাংশ জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার জন্য দার্শনিকদের সৃষ্টি– দার্শনিক গোছের মানুষরাই তা উপভোগ করেছেন। কাজেই এই মহাকাব্যের সৃষ্টিকার ও উপভোগকারীরা ছিলেন প্রধানত কৌতূহলী চিন্তার রাজ্যেরই বাসিন্দা। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে প্রযুক্তির উন্নয়নও চল্‌ছিলো, এক এক সময়ে তার যথেষ্ট চমক সাধারণ মানুষদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিলো। কিন্তু তার সৃষ্টিকার কারিগর-কুশলীদের সামাজিক মর্যাদা এমন ছিলনা যে তা মহাকাব্যের অংশ হতে পারে। বড় জোর হয়তো মুখে মুখে জানতে পেরে ব্যবহারকারীরা তাঁদেরকে বাহবা দিতেন, কিন্তু নিজেরা তার মধ্যে হাত লাগাতেননা। বিজ্ঞানীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেননা। এক সময় এসে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে, ইউরোপীয় রেনেষাঁর একটি অংশ হিসেবে। শুধু প্রাচীন চিন্তাবিদদের যুক্তিতর্কের মধ্যে না থেকে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে সেই চিন্তাকে যাচাই করার নিয়ম দেখা দিলো বিজ্ঞানে। এভাবে জ্যোতির্বিদ্যায়-পদার্থবিদ্যায় কপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটনের হাত ধরে এটি আসলেও অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযুক্ত হলো যেমন ইংল্যাণ্ডে হার্ভে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া উদ্ঘাটন করতে এমনি এক্সপেরিমেন্টের প্রবর্তন করলেন এবং দেড় হাজার বছর ধরে প্রচলিত এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল গ্রীক ধারণার অবসান করে কৃতিত্ব দেখালেন।

ইংল্যান্ডে ফ্রান্সিস বেকন এই নতুন বিজ্ঞানের দার্শনিক হিসেবে দারুণ প্রভাব রাখলেন সেখানে। এক্সপেরিমেন্ট হবে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাণশক্তি আর ওটি মানুষের সামনে উন্মুক্ত থেকে মানুষের উপকারে কাজ করবে। এটিই ছিল বেকনীয় দর্শন যা রূপ দিলো প্রথম বিজ্ঞান সমিতি রয়্যাল সোসাইটির। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কাজে প্রযুক্তির কিছু কিছু প্রয়োজন হলো, আর তাপ-চাপ ইত্যাদি মাপা, পানি-বাতাস পাম্প করা– ইত্যাদি। বিজ্ঞানের কিছু কাজ সাধারণ জীবনের প্রয়োজনে আসলো বটে কিন্তু তখনো প্রযুক্তি বা প্রযুক্তিবিদরা বিজ্ঞানের কাছে আসতে পারলোনা।

ইতোমধ্যে অবশ্য বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন তাঁদের কাজ বেশি বেশি মানুষ বুঝুক, আলোচনা করুক। এ কারণেই রয়্যাল সোসাইটিতে নিয়মিত

এক্সপেরিমেন্টগুলো সর্বসমক্ষে করা হতো, যদিও বিজ্ঞানের বোদ্ধারাই বেশি জড়িত হতেন। এতদিন ইউরোপে সব বিজ্ঞান গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় লেখা হতো, সব চর্চাও হতো এই ভাষায়। এতে নানা দেশের সব পণ্ডিত এগুলো সহজে বুঝতে পারতেন– বিশ্ববিদ্যালয়ের জগতটাই ছিল ল্যাটিন ভাষার জগত যেমন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাকে এখনো ল্যাটিন কোয়ার্টার বলা হয়। কিন্তু তাতে সমস্যা হলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবার কোন রাস্তা তার থাকতোনা। ল্যাটিন একটি ধ্রুপদী ভাষা, কেউ এ ভাষায় আর কথা বলেননা– পণ্ডিতরা ছাড়া। এজন্য আধুনিক বিজ্ঞানীরা একই সঙ্গে কিছু কিছু বই যার যার জাতীয় ভাষায়, মানুষের ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন। গ্যালিলিও তাঁর ডায়লগ (আলাপ) বইটি ইতালিয়ানে লিখেছেন- যদিও অন্যগুলো ল্যাটিনে। নিউটন তাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গণিতপূর্ণ গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' ল্যাটিনে লিখলেও তাঁর অন্য বিখ্যাত বই 'অপটিকস' (আলোকবিদ্যা) ইংরেজিতে লিখেছেন। এভাবে বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে এলো কাজে ও লেখায়; অন্তত প্রয়োগের দিক থেকে সাধারণ মানুষের প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আগেই ঘটেছিলো। এভাবে একই মানুষ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের কাজে মুগ্ধ হবার সুযোগ পেলো, যদিও দুটি দুদিক থেকেই আসছিলো।

বাস্তব যন্ত্রপাতিতে হাত না লাগানোর যে মানসিকতা বিজ্ঞানীদের ছিল তা এই বিজ্ঞান বিপ্লবের মধ্যে কেটে যেতে আরম্ভ করেছিলো। গ্যালিলিও যেভাবে দূরবীক্ষণ জিনিসটিকে সাধারণ খেলনা থেকে জ্যোতির্বিদ্যার শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন একেবারে নিজের হাতে কাজ করে, তাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য তিনি শুধু এর কার্যপ্রাণালীর বিজ্ঞানটি বুঝে ক্ষান্ত থাকেননি, দিনের পর দিন নিজের হাতে কাচ ঘষে ঘষে এর উপযুক্ত লেন্সও তৈরি করেছিলেন। তাঁর ছাত্র টরিচেলি বিজ্ঞানের প্রয়োজনে নিজের হাতে চাপমান যন্ত্র তৈরি করেছিলেন; ইংল্যান্ডে ও জার্মানীতে বিজ্ঞানীরা বাতাস নিষ্কাশনের মাধ্যমে শূন্যস্থান সৃষ্টি করার জন্য পাম্প উদ্ভাবন করে চাপ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর মধ্যেই সেখানে আসতে পেরেছিলো পরবর্তী বিপ্লব– যেটি মূলত বিজ্ঞানীদের বিপ্লব ছিলনা, ছিল পুঁজিপতি ব্যবসায়ী আর কারিগর-কুশলীদের বিপ্লব। কিন্তু তাকে শিগ্‌গির বিজ্ঞানীদের শরণাপণ্ন হতে হয়েছে। সেটি শিল্প বিপ্লব।

শিল্প বিপ্লব ছিল কুটির শিল্প ও হালকা শিল্প থেকে খুব দ্রুত যন্ত্রচালিত ভারী শিল্পে উত্তরণের বিপ্লব। উন্নততর প্রযুক্তি একে সম্ভব করেছে, আর উচ্চ পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র এর পেছনে চাহিদার সৃষ্টি করেছিলো। এই বিপ্লবের সামনের সারির নায়ক ছিলেন প্রতিভাবান কুশলী-কারিগর-উদ্ভাবকরা। পুঁজি, শিল্প-অভিজ্ঞতা, খনির উপস্থিতি ইত্যাদি নানা কিছু মিলিয়ে উত্তর ইংল্যাণ্ড হয়ে পড়েছিলো শিল্প বিপ্লবের সূতিকাগার, ১৭ শতকের মাঝামাঝি বা তারো আগে থেকে। যা শিল্প বিপ্লবের বিজয়কেতন হয়ে ওঠেছিলো সেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও রেলওয়ের উদ্ভাবন এ অঞ্চলের কুশলী উদ্ভাবকদের হাতেই জাদু দেখিয়েছে। নিউকোমেন প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন কয়লা খনি থেকে পানি পাম্প করে সরাবার কঠিন কাজ থেকে শ্রমিকদেরকে মুক্তি দিয়ে কাজটি দ্রুততর করতে। জেমস্ ওয়াটের হাতে পড়ে এই ইঞ্জিন এতই দক্ষ ও আঁটসাট হয়েছে যে স্টিফেন্সন একে নিরাপদ রেলগাড়ি টানার কাজে লাগাতে পেরেছেন। জলস্রোতের শক্তিতে চলা মামুলি যন্ত্রপাতি থেকে এসব ভারী যন্ত্রে আসার জন্য উত্তর ইংল্যাণ্ডে পাশাপাশি প্রচুর থাকা লৌহ আকরিক ও কয়লার খনির সুযোগ কাজে লেগেছে। উন্নত লোহা ও ইস্পাত তৈরির প্রযুক্তি এমনি ভাবে বিকশিত হয়েছিলো। এসবের ফলশ্রুতিতে ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য কিছু কিছু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত বদলে গেলো। শুরুতে এতে বিজ্ঞানের তেমন ছোঁয়া ছিলনা।

কিন্তু এই অগ্রগতি একটি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে; অভিজ্ঞতা আর উদ্ভাবন শক্তিতে প্রযুক্তিকে একটি দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু তার থেকে বেশি নয়। প্রযুক্তিটি কেন কাজ করছে তার মৌলিক নীতিগুলো না জানলে, বা সেগুলোর সজ্ঞান প্রয়োগ না ঘটাতে পারলে ক্রমাগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেমন বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে ক্রমাগত আরো দক্ষ আরো আঁটসাট ও টেকসই করার যে প্রচণ্ড চাহিদা শিল্প বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলো তা শুধু একভাবেই সম্ভব ছিল। তা হলো ইঞ্জিনের মধ্যে তাপ শক্তি যেভাবে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তার বৈজ্ঞানিক নীতি ও সীমাবদ্ধতাগুলোকে আবিষ্কার করা। এজন্য নতুন বিজ্ঞানের সূত্রপাত হলো থার্মোডাইনামিক্স বা তাপ বলবিদ্যা। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের শরণাপণ্ন হতে হলো। এছাড়াও শিল্প বিপ্লব বিজ্ঞানকে আরো বহু দিকে প্রসারিত করার চাহিদা সৃষ্টি করলো। প্রকৃতির রহস্যগুলো উদ্ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানের মূল যে প্রেরণা কৌতূহল সেটি ঠিকই অব্যাহত রইলো, কিন্তু তার সঙ্গে একটি বাড়তি প্রেরণা যোগ হলো তা হলো প্রযুক্তি সৃষ্টি

ও প্রযুক্তি বিকাশের লাভজনক প্রেরণা। ওই থার্মোডাইনামিক্সের একটি অত্যন্ত মৌলিক নিয়ম হিসেবেই আসলো যে তাপকে যন্ত্রশক্তিতে রূপান্তর প্রকৃতির নিজের সীমাবদ্ধতার কারণেই কখনো পূর্ণাঙ্গভাবে করা যাবেনা– তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে সুদূরপ্রসারী স্থানে নিয়ে যাওয়ার মত আবিষ্কার এটি। অথচ এই মৌলিক নিয়মই আবার ইঞ্জিন উদ্ভাবকদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত করেছে।

লোহা আর ইস্পাতের অথবা যেকোন ধাতুর শক্ততা, দৃঢ়তা এসব অর্জন প্রযুক্তির কাছে অপরিহার্য। ঐতিহাসিক ভাবে কারিগরের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা আর কুশলতায় এসব অর্জিত হতো। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করে চলছিলো ধাতুর কৃস্টাল গঠনের, সেই কৃস্টালে অনিবার্য ভাবে ত্রুটি থেকে যাওয়ার গাণিতিক সমস্যাগুলোকে যেখানে থার্মোডাইনামিক্স, সংখ্যাতাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ইত্যাদিকে খুব মৌলিক ভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর এই কাজই হয়ে উঠলো ধাতু শিল্পকে যথাযথ প্রযুক্তি যোগাবার ভাল উপায়, কারণ বিজ্ঞানই দেখিয়েছে ধাতুর শক্ততা, দৃঢ়তা ইত্যাদি ওই ত্রুটির সঠিক পরিমাণে থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে।

কখনো বিজ্ঞানের চর্চার জন্য নতুন নতুন সমস্যা এনে দিয়েছে শিল্প বিপ্লবের চাহিদাগুলো, আবার কখনো শিল্প বিপ্লবের কাজ করতে গিয়ে কাকতালীয় ভাবে আরো কিছু কৌতূহল বিজ্ঞানীদের মনে জাগিয়েছে- বিজ্ঞান সেদিকে প্রসারিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের রসদ খুঁজতে গিয়ে উন্নত দেশের অভিযাত্রীরা যখন নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন, তাঁদের মধ্য বিজ্ঞানীরাও ছিলেন। তাঁরা ওভাবে পরিচিত হয়েছেন পৃথিবীর শিলাস্তর গঠন, বিচিত্র সব উদ্ভিদ আর প্রাণীর অদ্ভুত জীবন ইত্যাদির সঙ্গে, যেগুলো এতদিন অজানা ছিল। সেই কৌতূহল ভূ-বিদ্যা আর জীববিদ্যাকে নতুন বিজ্ঞানে পরিণত করেছে শেষ অবধি কয়েক শত বছরের ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে জীব বিবর্তন ও ভূত্বকের টেকটোনিক থিওরির মত বৈপ্লবিক সব তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে যা বিজ্ঞানেরই চেহারা পাল্টিয়ে দিয়েছে।

এসব ছিলো প্রধানত বিজ্ঞান জগতের খবর- কিন্তু তার উপজাত হিসেবে প্রযুক্তি ও সম্পদ সৃষ্টির কাজ ঠিকই চলেছে– স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিল্পদ্রব্য ইত্যাদির ওপর তার প্রভাব পড়েছে। অনেক সময় এর জীবনঘনিষ্ঠতা রীতিমত লক্ষ্যণীয় হয়েছে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছেও। শিল্প বিপ্লবের কালেই একটি উন্নত বিজ্ঞান হিসেবে কেমিস্ট্রির ব্যাপক বিকাশ ঘটে। শিল্প বিপ্লবের যেই বড় বড় উল্লম্ফন তার মধ্যে শুরু থেকেই ছিল বস্ত্র শিল্প যা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দুনিয়ার

মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা মেটাবার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। সে সময় বস্ত্র উৎপাদন উন্নত হলেও রঙের দিক থেকে বা নিষ্প্রভ ছিল কারণ সব রঙকে আসতে হতো প্রাকৃতিক উৎস থেকে, যা ছিল খুবই ব্যয় বহুল। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি রসায়নবিদরা ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিনকে সংশ্লেষণ করতে গিয়ে তাতে সফল না হলেও আবিষ্কার করেছিলেন অদ্ভুত সব উজ্জ্বল রঙের ছটা নিয়ে ক্যামিকাল রঙ যা পুরো বস্ত্র শিল্পকে পালটিয়ে দিয়েছিলো এবং সূত্রপাত করেছিলো ক্যামিকাল প্রকৌশল নামের বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে মিলিত একটি চর্চার বিষয়। এমনি ধারাতেই শিল্প বিপ্লব বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলো, যা ইতিহাসে এই প্রথম।

## বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মহাকাব্য

যা ছিল বিজ্ঞানের মহাকাব্য এটি এখন থেকে কার্যত হয়ে পড়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মহাকাব্য। প্রযুক্তিকে শেষ পর্যন্ত এই মহাকাব্যে স্থান দিতে হয়েছে যাতে ওটি মানুষের কাছে আরো উপভোগ্য হয়, মানুষের জীবনের কাজে যুক্ত হয়। এখন বিজ্ঞানে কোন কিছুর নতুন আবিষ্কার হলে, এমনকি বিজ্ঞানের কোন চর্চা শুরু করতে চাইলেও প্রশ্ন ওঠে এর থেকে প্রযুক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা কতখানি আছে। আমরা বিজ্ঞানের কাছ থেকে প্রযুক্তি আশা করতে এবং তার মাধ্যমে জীবনের জন্য আরো কিছু স্বাচ্ছন্দ্য আশা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। মৌলিক বিজ্ঞান চর্চার ব্যয় যখন দিন দিন যথেষ্ট বাড়ছে তখন এই ব্যয়বহুল কাজ করতে মানুষকে রাজি করানো হচ্ছে এর থেকে নতুন প্রযুক্তির আশা দেখিয়ে। এমনকি ওই নতুন প্রযুক্তির মধ্যে আমরা যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন উপকার দেখতে নাও পাই, যেমন মারণাস্ত্রের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, তখনো আমরা প্রতিরক্ষা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে এর সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করি। জীবনঘনিষ্ঠ প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক একদিক থেকে বিজ্ঞানকে যেমন জনপ্রিয় করেছে তেমনি আরেক দিক থেকে বিজ্ঞানের মর্মটি বুঝতে আমাদেরকে বাধাও দিচ্ছে। আমরা খুব সহজেই প্রযুক্তিকে বিজ্ঞান বলে ভুল করি কারণ প্রযুক্তির সঙ্গেই দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পরিচয় ঘটে। প্রযুক্তি এসে মৌলিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সর্ম্পকটি বরং দূরে সরিয়ে দিতে চায়– প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের যে মৌলিক বিজ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যখন বাঁশি, তবলা, দোতারা, বেহালা সরাসরি দেখে শুনি তাতে সুর সৃষ্টির বিজ্ঞানটি অনুভব করি; কিন্তু যদি একটি সিডি চালাবার কালো বাক্সের মত যন্ত্রের থেকে শুনি তখন মূল

সহজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি দেখিনা বলে বিজ্ঞান হারিয়ে যায়, অবোধ্য প্রযুক্তিটি শুধু থাকে। যাঁরা আজ বিজ্ঞান মহাকাব্যের ভাল পাঠক, এ কথাটি মনে রেখে তা উপভোগ করেই বরং তাঁরা এর মহাকাব্যিক মর্মবাণীটি খুঁজে পান।

শিল্প বিপ্লবের শুরুতে থার্মোডাইনামিক্সের মতো নতুন বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয়ে উপকৃত হবার যে ধারাটি শুরু হয়েছিলো তা আসলে কোনদিন শেষ হয়নি– নতুন নতুন ধারায় তা প্রবাহিত হয়েছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি শিল্প বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে এমন কথা যখন আমরা বলি, তখন এর শুরুর ধারাটির কথাই বলি। এখন অবশ্য ফ্যাশন হলো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনি করে আরো নতুন পর্যায়ের শিল্প বিপ্লবের কথা বলা একের পর এক। কিন্তু আসল কথাটি হলো কিছু কিছু রূপ বদলালেও ব্যাপারটি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলমান রয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি বলার মাধ্যমে আমরা শুধু তার ওই রূপ পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি মাত্র। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জন্য গুরুত্ব পাওয়া তাপের পর্যায়টি শেষ করে আমরা বিদ্যুৎ-চুম্বকের পর্যায় শুরু করেছি; সেখান থেকে বেতারে-ইলেকট্রনিক্সে, তারপর কম্পিউটারে তথ্য প্রযুক্তিতে, এবং সর্বশেষ বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়। প্রত্যেক পর্যায়েই বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে হাত ধরাধরি করে চল্‌তেই বেশি দেখা গেছে।

মধ্যে একটি প্রবণতাকে কাজ করে যেতে দেখা গেছে তা হলো প্রযুক্তিগুলো ক্রমাগত দ্রব্যে হালকা হয়েছে কিন্তু জ্ঞানে ভারী হয়েছে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন অথবা বিদ্যুৎ জেনারেটরের পর এসেছে তাই ইলেকট্রনিক ডিভাইস, সেখান থেকে মাইক্রোচিপ, জৈব প্রযুক্তি জিন কারিগরি, এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুরো যাত্রায় এই প্রবণতাটি রয়েছে। জ্ঞান ও কৌশল বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তাতে বস্তুগত মালের ভার ক্রমে হালকা হয়েছে, জিনিসটি এতে ক্ষুদ্র হয়েছে। এই 'দ্রব্যে হালকা জ্ঞানে ভারী' প্রযুক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেই আবার দূর-ভবিষ্যতের অনেক বড়, হয়তো জবড়জঙ্গ প্রযুক্তির কাজও এগিয়ে চলেছে যেমন মহাশূন্য যাত্রা কিংবা নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়্যাক্টরের গবেষণা।

এর সব কিছুতে অন্তরে বিজ্ঞান গভীরভাবে থাকলেও সবার চোখে পড়ার মত খবরগুলো সৃষ্টি করে প্রযুক্তি। আসল কথা হলো এই দুটি একটির সঙ্গে অন্যটি এমন ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে আছে যে সাধারণ মানুষ শুধু তাঁর আগ্রহের ও ব্যবহারের দিক থেকেই একে দেখেন, এর মধ্যে কী বিজ্ঞান রয়েছে সেটি খোঁজার সুযোগ থাকেনা। এর প্রভাবে বিজ্ঞানের পুরো ব্যাপারটির

ব্যবহারিক দিকটিই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। ব্যবহারিক দিকটি যথেষ্ট চমকপ্রদ না হলে বিজ্ঞানটিও নিষ্প্রভ ও আড়ালে থেকে যায়। অথচ এমন মহাকাব্যের স্বাদ না পাওয়া যে কারো জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

কিন্তু এমন অনেক বিষয়ের চর্চা বিজ্ঞানকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে গেছে যাতে এর কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই, কোন প্রযুক্তির জন্মও এটি দেয়নি। জ্যোতির্বিদ্যা থেকে গড়ে ওঠা কসমোলজি বা মহাজাগতিক বিজ্ঞান এমনি একটি বিষয়। এর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের জন্ম, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানাটিই উদ্দেশ্য। প্রশ্ন আছে মহাবিশ্ব একটি না বহু, একটিতে হয়তো শুধু আমরা ও পৃথিবীর প্রাণীরা এসেছি যেটি আমাদের মহাবিশ্ব; এর বাইরে আরো অনেকগুলো যে আছে তার কথা আমরা জানতে পারবোনা। আমাদের মহাবিশ্বটাই যা এতো বিশালের বিষয়, যাকে আমরা অনাগত বহুকাল ধরে শুধু দূর থেকে দূরবীক্ষণেই দেখবো, অত দূরে কোনদিন যাবোনা, তাকে নিয়ে কত কাজ হচ্ছে। কখনো কোন কাজে আসবেনা এমন আমাদের মহাবিশ্বটি নিয়ে, তার ইতিহাস নিয়ে, শত শত বছর ধরে প্রতিভাবান এতো বিজ্ঞানীর গবেষণার কারণ কী? কারণ একটিই, মানুষের চিরন্তন কৌতূহল, নিজের ঠিকানা জানার আনন্দ। বিজ্ঞানের অনেকখানির পেছনেই শুধু এটিই কারণ। তবে অতীত ইতিহাসে দেখি প্রযুক্তির জন্ম না দিলেও মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের দিকে নির্লিপ্ত ছিলনা বিজ্ঞানের অনেক অংশই। চার-পাঁচ হাজার বছর আগেও জ্যোতির্বিদরা আমাদের মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তখনো আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি বোঝার মাধ্যমেই তাঁরা চান্দ্র ক্যালেন্ডার ও সৌর ক্যালেন্ডার সৃষ্টি করেছেন যেগুলো থেকে জোয়ার-ভাটা, মৌসুম নির্ণয়ের মত কৃষি সহায়তা পাওয়া যেতো। বাস্তব জীবনে ব্যবহার এবং কৌতূহল নিবৃত্তি এই উভয়ের আকর্ষণই মানুষকে অধিকাংশ বিজ্ঞানের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

দার্শনিকদের হাতে গড়া গ্রীক বিজ্ঞানে উচ্চতর সব চিন্তা স্থান পেতো। সব কিছুর ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসেবে এটম আছে নাকি সে রকম কিছু নেই; গতি জিনিসটির প্রকৃতি কি, নাকি আসলে গতি বলেই কিছু নেই, ওটি একটি বিভ্রম; এমনি সব যুক্তি-তর্ক এবং তত্ত্ব এসব সেখানে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিলো। এসব চর্চা একদিন বিজ্ঞান মহাকাব্যের মূল কাহিনী-ধারাটিকে ঠিক করে দিয়েছিলো। কিন্তু জগৎ-প্রকৃতি নিয়ে এই অসাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তি করা ছাড়াও একই

সময়ে গ্রীক বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিগুলোই বিজ্ঞানীকে বিশাল পৃথিবীর পরিধিটি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে মাপার মত বাস্তব কৃতিত্ব দিয়েছিলো। এমন সাফল্য নিজের আশপাশের দেশ ও জাতিগুলোর ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি বুঝতে তাদেরকে সাহায্য করেছে, জীবনের কাজে অবদান রেখেছে। বিমূর্ত জ্যামিতির নিয়ম থেকে মূর্তিমান পৃথিবীর আকার নির্ণয় ওই ভাবনার চর্চার বাস্তব প্রয়োগের সুন্দর উদাহরণ। আরো কাছের জীবনে বিজ্ঞান অবদান রেখেছে যখন বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসাবিদরা মানুষের হাতের নাড়ীর স্পন্দনটিকে পর্যন্ত তার সার্বিক স্বাস্থ্য বা রোগাক্রান্ত হবার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পেরেছেন এবং এ ছাড়াও শরীরের তাপ, চোখ-মুখের রঙ, মূত্রের পরিমাণ ইত্যাদির মত সহজে পর্যবেক্ষণযোগ্য লক্ষণের দ্বারা রোগ নির্ণয় করতে পেরেছেন। এসবের পেছনে তাঁদের আবিষ্কৃত উচ্চতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও কাজ করেছে। এই যে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কৌতূহল নিবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে যেখানে সম্ভব বাস্তব জীবনে ব্যবহার করা এই দুইয়ের প্রেরণা বিজ্ঞানকে তার আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে। শেষোক্তটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞানকে সরাসরি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজে লাগানোর ব্যাপারটি। এর ফলে বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের দিকটি অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের কারণে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি আবার বিজ্ঞানেরই আরো অগ্রগতির কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে– এক শাখার বিজ্ঞানের অবদানে সৃষ্ট প্রযুক্তি অন্য শাখারও বিজ্ঞানের গবেষণায়, এক্সপেরিমেন্টে, চমৎকারভাবে ব্যবহার করে অকল্পনীয় সব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

আজ আধুনিক বিজ্ঞানের যে বড় বড় তত্ত্বগুলো মানুষের বিজ্ঞান-চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব এনেছে কেউ বল্‌বেননা যে এগুলো কোন বাস্তব ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। এর প্রায় সবই হলো প্রকৃতিকে এবং নিজেকে বোঝার জন্য বিজ্ঞানের এক অসাধারণ যাত্রা– বিজ্ঞান মহাকাব্যের সব চাইতে উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়গুলো। উনবিংশ শতাব্দীর জীববিবর্তন তত্ত্ব, বিংশ শতাব্দীর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব এমনি সব আবিষ্কার। এগুলো বিজ্ঞানীর ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে মহাপরিবর্তন এনেছে, কিন্তু কখনো বাস্তবে এর কোন প্রয়োগ হবে, বা এর থেকে কোন প্রযুক্তি সম্ভব হবে এমন কোন সম্ভাবনা সামনে রাখা হয়নি– তত্ত্বগুলোর ধরনই এমন। অন্য রকম অনেক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অবশ্য বাস্তব প্রয়োগ সম্ভাবনাটি অনিবার্য ছিল, আবিষ্কারের ধরন থেকেই তা বোঝা গেছে। যেমন অতিপরিবহনের বিষয়টি এবং আচরণগুলো আবিষ্কার হবার পর বোঝা গেছে যে এভাবে শূন্য রোধ বা বাধাবিহীন চিরচলমান বিদ্যুৎ

কারেন্টের ওপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি উন্নয়ন খুবই সম্ভব। রোগের জীবাণু তত্ত্ব আবিষ্কারের পর পর বোঝা গেছে কোন না কোন ভাবে এই জীবাণু ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ সারিয়ে এই আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদিতে এমনটি ভাবার সুযোগ ছিলনা। এর প্রধান কারণ যেই বিশেষ রকম জগতে এগুলো কার্যকর সেটি দৈনন্দিন জীবনের জগত নয়– অতি দ্রুত, অতি বিশাল, বা অতি ক্ষুদ্রের জগত এগুলো। জীববিবর্তনও ঘটে লক্ষ বছরে অতি ধীরে, আমাদের জীবনকালে তার প্রতিফলন ও প্রয়োগ পাওয়া কঠিন। অথচ আবিষ্কারের শ'খানেক বছরের মধ্যে এগুলোর প্রত্যেকটির প্রয়োগ ঘটেছে, নতুন প্রযুক্তিও এর থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। একবার এ তত্ত্বের জগত আমাদের বাস্তব জীবনে চলে আসার পর এর থেকে প্রযুক্তি সৃষ্টি অনিবার্য হয়েছে।

জীববিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোন কোন প্রাণীর মধ্যে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তার দেহ বা আচরণের স্পষ্ট কিছু পরিবর্তন বিবর্তনের ফলে দেখা যাচ্ছে– যেমন মানুষের অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে কোন কোন মাছের ক্ষেত্রে নিজেকে মানুষের কাছে অধরা করার জন্য তা পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ছোট হয়ে যাওয়া। আবার দেখতে পারি দেহের রোগজীবাণু ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিকের যখন তখন ব্যবহার অপেক্ষাকৃত জোরালো জীবাণুকে বেঁচে থাকার ও দ্রুত বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে এন্টিবায়োটিক অকার্যকর করে তোলার ঘটনা। বিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগই ঘটনাগুলো বোঝার সুযোগ দিয়েছে এবং তার প্রতিকারেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আগে আলোর বেগের কাছাকাছি অতি দ্রুত চলমান কোন বড় বস্তুর সঙ্গে আমাদের কারবার ছিলনা বলে আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রভাব বা প্রয়োগ দৈনন্দিন জীবনে ঘটার সুযোগ ছিলনা। কিন্তু যেই দ্রুতগামী কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তা নিয়ে আমরা প্রত্যেকে মোবাইল ফোনের জিপিএস এর মাধ্যমেই নিজেদের অবস্থান ও চলাফেরা নিখুঁত ভাবে জানার সুযোগ পাচ্ছি তখনই এই প্রযুক্তিতে আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রভাবটি এসে পড়েছে, এবং তত্ত্বটি প্রয়োগ করেই আমরা এই জিপিএস প্রযুক্তিটিকে নিখুঁত করতে পেরেছি। উপগ্রহগুলো আমার অবস্থান নির্ণয় করে আমার মোবাইল ফোনে সিগন্যাল পাঠিয়ে ও তা ফেরৎ নিয়ে আসা-যাওয়ার সময় থেকে দূরত্ব নির্ণয় করে। যেহেতু আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী দ্রুত চলা কোন বাহনের ঘড়ি স্লো হয়ে যায় এই উপগ্রহের ঘড়িও কিছুটা স্লো হয়

যাকে হিসেবের মধ্যে এনে সময়ের মাপকে শুদ্ধ করে জিপিএস সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। আপেক্ষিক তত্ত্ব না থাকলে জিপিএসকে কার্যকর করা যেতোনা। এভাবে আপেক্ষিক তত্ত্বের মত দৈনন্দিন ধরাছোঁয়ার বাইরের একটি তত্ত্বও প্রযুক্তি সৃষ্টি করবে তা প্রত্যাশিত ছিলনা।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো একেবারেই বিমূর্ত সব ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব থেকেও যে খুবই বাস্তব মূর্তিমান প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হতে পারে তার একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটার। যদিও প্রযুক্তিটি এখনো প্রাথমিক উন্নয়নের পর্যায়ে আছে সামনের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটারগুলো যে কোয়ান্টাম কম্পিউটারই হবে তা প্রায় নিশ্চিত। গত প্রায় সাত দশক ধরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কম্পিউটারের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে– একটি চিপে আরো আটসাট ভাবে আরো বহু গুণ বেশি ইন্টেগ্রেটেড সার্কিটকে জায়গা দেয়া সম্ভব হওয়াতে কম্পিউটারের দক্ষতা ক্রমাগত বেড়েছে, তার ব্যয় একই সঙ্গে কমেছে। এখন এই সেমিকন্ডাক্টর ভিত্তিক প্রযুক্তির উন্নতির শেষ সীমাটি এসে গেছে, কম্পিউটারের কাজের জন্য অন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির প্রযুক্তি না এনে আর এগুনো কঠিন হবে। এমনি একটি সমাধান নিয়ে এসেছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার। সাধারণ কম্পিউটারে সব প্রক্রিয়াকরণ করা হয় তার মৌলিক উপাদানে বিট নামে পরিচিত দুটি অবস্থার নিরিখে– যাকে বাস্তব রূপ দেয়া হয় ট্রানসিস্টরের অন্ অথবা অফ্ অবস্থাকে যথাক্রমে ১ ও ০ দিয়ে বুঝিয়ে। ০ এবং ১ ব্যবহার করেই এখানে সব সংখ্যা লেখা যায় এবং সব তথ্যের প্রসেসিং ঘটে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারে বিটের বদলে থাকে কোয়ান্টাম বিট বা 'কিউবিট' যাতে উপাদানগুলো সাধারণ সেমিকন্ডাক্টর ট্রানসিস্টর না হয়ে হয় কোয়ান্টাম কণিকা– ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদির মতো। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী এরা শুধু দুই পৃথক অবস্থায় নয় (যাদেরকে ০ এবং ১ সূচিত করা যায়) বরং এ দুইয়ের মাঝে অনেক উপরিপাতিত অবস্থায় থাকতে পারে। এরকম বহু মিশ্র অবস্থার সাহায্যে এক একটি কিউবিট বিশাল পরিমাণ বেশি সংখ্যা এক সঙ্গে লিখতে পারে এবং অনেক গুণ দ্রুত ও বেশি প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। এজন্য অবশ্য কম্পিউটারে লজিক প্রক্রিয়া করণের জন্য এমন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রোগ্রাম এবং কম্পিউট্যাশন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কম্পিউটারের গতি অনেক গুণে বাড়ে, সমান্তরাল ভাবে অনেকগুলো কাজ করতে পারে– এক ধরনের সুপার কম্পিউটার সম্ভব হয়।

কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি সমস্যা হলো কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকা কণিকাগুলো কোন ভাবে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা যন্ত্র বা পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তা হলে তার কোয়ান্টাম অবস্থা চুপসে যায়। এজন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ওই উপাদানগুলোকে অত্যন্ত কৌশলে বাকি সব থেকে পৃথক রাখতে হয়, যার একটি উপায় হলো সব কিছু অতি শীতল রাখা, পরম শূন্যের কাছে। তাছাড়া যেই না কিউবিটের অবস্থাটি মাপা হলো সেই মুহূর্তে ওই উপরিপাতিত অবস্থা চুপসে গিয়ে শুধু ০ অথবা ১ সুনির্দিষ্ট অবস্থাই দেখা যাবে। কম্পিউটারের আউটপুটকে পরিমাপ করলে তা এভাবে তার কোয়ান্টামগুণ হারাবে। এজন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়েছে সেই কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থার মতো অত্যাশ্চর্য তত্ত্বকেও। কম্পিউটারে ভেতরের কিউবিটের কোয়ান্টাম বিজড়িত কণিকাকে যদি বাইরে রাখা হয়, তবে সেটিকে পরিমাপ করলেই আমরা কম্পিউটারে তার দোসরটির অবস্থা জানতে পারি, তার কোয়ান্টাম চরিত্র নষ্ট না করেই। নানা সমস্যা সমাধানের কম্পিউটেশনের জন্য এমন একটি দুর্দান্ত প্রযুক্তি এসেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মত ধরাছোঁয়ার বাইরের একটি তত্ত্ব থেকে। এটি প্রায় অবিশ্বাস্য।

## প্রযুক্তি গতি আনে বিজ্ঞানে

বিজ্ঞানে পরিমাপের যন্ত্রগুলো ক্রমেই উন্নত এবং বেশি বেশি সংবেদী হয়েছে– শুধু এই একটি ব্যাপার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক আবিষ্কার সম্ভব করে দিয়েছে। শুধু পরিমাপের প্রযুক্তি নয়, বিভিন্ন ব্যতিক্রমী বা চরম অবস্থায় গবেষণার বস্তুকে নিয়ে যাবার প্রযুক্তিটিও এখানে খুব বড় ভূমিকা রাখছে। যেমন অসম্ভব রকম শীতল উত্তাপ সৃষ্টি না করতে পারলে এবং তা পরিমাপ করতে না পারলে অতিপরিবহনের আবিষ্কার সম্ভব হতোনা। শীতল পরিবেশে বিদ্যুৎ প্রতিরোধের ক্ষমতাগুলো এবং অন্যান্য নানা গুণাগুণগুলো পরীক্ষা করার জন্যই দীর্ঘ সময়ের প্রচুর প্রচেষ্টার ওই শীতল অবস্থার প্রযুক্তিগুলো আসতে পেরেছে। অতিপরিবহন ছাড়াও আরো বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এর ফলে সম্ভব হয়েছে। অতিপরিবহন আবিষ্কার যখন হয়েছিলো তখন উত্তাপকে পরম শূন্যের কয়েক ডিগ্রির মধ্যে নামিয়ে আনাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তার কিছু পর তাত্ত্বিক ভাবে আবিষ্কৃত বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশনের উপযুক্ত শীতল উত্তাপ সৃষ্টির জন্য সেটি যথেষ্ট ছিলনা, সেই অবস্থায় উত্তাপকে নিয়ে আসতে আরো শতবর্ষ লেগে গেছে, তারপর সম্ভব হয়েছে বোস আইনস্টাইন কনডেন্সেশন প্রত্যক্ষ করতে।

উত্তাপ মাপার কথা যদি বলি সেই গ্যালিলিওর সময়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে তাপমান যন্ত্র থার্মোমিটারের যাত্রা শুরু হয়েছে। বহু দিন পর্যন্ত শুধু তাপের সঙ্গে বস্তুর প্রসারণের ওপর ভিত্তি করে এই থার্মোমিটার তৈরি হয়েছে। কিন্তু অতি উত্তপ্ত অথবা অতি শীতল অবস্থায় বস্তুটির অবস্থা অপরিবর্তিত রাখা যায়না বলে সেখানে ওই নীতিতে উত্তাপ পরিমাপের কাজ চলেনা। সেখানে বিজ্ঞানের নতুন নীতি ব্যবহার করে উত্তাপ মাপার নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হয়েছে– যেমন অতি উত্তপ্ত অবস্থায় বিকীর্ণ আলোর উজ্জ্বলতা ও রঙের সঙ্গে উত্তাপের সম্পর্ক থেকে উত্তাপ নির্ণয় এবং অনেক কম উত্তাপের জন্য দুটি ধাতুর দুই সংযোগ স্থলের উত্তাপের পার্থক্যের সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি হওয়া ছোট্ট বিদ্যুতের ভোল্টেজের সম্পর্ক থেকে।

পরিমাপের নতুন প্রযুক্তি এখানে বিজ্ঞানের বড় সহায়ক হয়েছে। অত্যন্ত সংবেদনশীল উদ্ঘাটন প্রযুক্তির অভাবের কারণে এক একটি শক্তিশালী তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণকে যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে তা আমরা আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গ প্রমাণ ও পিটার হিগ্‌সের হিগ্‌স বোসন তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণের ক্ষেত্রে এই বইতে দেখতে পেয়েছি। প্রথমটি অবশেষে লিগো যন্ত্রে ইন্টাফেরোমিটারের নীতির অপূর্ব সংবেদনশীলতা এনে একশ' বছর পর আর দ্বিতীয়টি লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের মত অত্যন্ত শক্তিশালী কণিকা ত্বরক ও আনুষঙ্গিক অত্যন্ত সংবেদনশীল কণিকা উদ্ঘাটক যন্ত্রের কল্যাণে ষাট বছর পর সম্ভব হয়েছে।

এই যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির এতো মাখামাখি তার ফলে এদের একটি অন্যটির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করছে, প্রণোদনা সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানে যে কোন নতুন আবিষ্কারের পর সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান সৃষ্টি হয় এর থেকে কী নতুন প্রযুক্তির সৃষ্টি হতে পারে; সে রকম যে কোন সম্ভাবনা যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করে, কারণ সেভাবেই আবিষ্কারটি থেকে উপকার সৃষ্টি হবার পথ দেখা দেয় এবং অর্থনীতিতেও তা অবদান রাখতে পারে। গণমাধ্যমে এবং সর্ব সাধারণের মধ্যে আবিষ্কারের এই দিকটিই বেশি গুরুত্ব পায়। মূল বিজ্ঞান গবেষণার জন্য সরকারী বা বাণিজ্যিক বিনিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে তার থেকে অর্থকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভাবনাটি বিশেষ ভাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান গবেষণার প্রয়োজনে যখন বিভিন্ন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে বা নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় সেই খবরগুলোতে প্রধানত বিজ্ঞানীরা এবং প্রযুক্তিবিদরাই মনোযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞানের উপযুক্ত গবেষণা

উপকরণ ও কৌশলগুলো গড়ে তুলতে হলে উপযুক্ত প্রযুক্তির অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ছাড়া উপায় নেই।

## বড় প্রকল্পের উপজাত হিসেবে সর্বসাধারণের প্রযুক্তি

অনেক সময় বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে মিলিয়ে যে বড় বড় গবেষণা ও প্রায়োগিক উদ্যোগগুলো নেয়া হয় উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য থেকে, তাতে বড় প্রযুক্তি হয়তো সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের বেশি কাছাকাছি যায় এরকম আরো কিছু উপজাত প্রযুক্তি কিছুটা কাকতালীয় ভাবে সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়ার ফিশন বোমার (এটম বোমা) বিশাল মারণ গবেষণা থেকে কিছু উপজাত প্রযুক্তি পরবর্তী কালে মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ওই একই নিউক্লিয়ার ফিশন শক্তির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারটি দুনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি-উৎসে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া ওই একই নিউক্লীয় চুল্লীর ভেতর অনায়াসে কাম্য কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি সম্ভব হয় (সাধারণ পদার্থের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ) যা অনেক দৈনন্দিন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে আলফা কণা, বিটা কণা, গামা শক্তির রশ্মির বিকিরণ হয়। গামা রশ্মি নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার চিকিৎসা নামে কোন কোন রোগমুক্তিতে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর জীবাণুনাশী ক্ষমতার জন্য তাদেরকে কোন জিনিস বা জায়গাকে জীবাণুমুক্ত করতে অথবা কোন কোন খাদ্যকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করতে সাহায্য করে। আবার প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরে অথবা যন্ত্রপাতির মধ্যে কোথায় গিয়ে কোন্ জিনিস কী করছে তা তার সঙ্গে সামান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়েই জানা যায়, কারণ যেখানেই যাক বাইরে থেকে বিকিরণ মেপে তার উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব। এসব উপকারী মানব-বান্ধব প্রযুক্তি মূল মারণাস্ত্র তৈরির জন্য অপরাধ বোধও কিছুটা হয়তো কমিয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে মহাশূন্য অভিযানের উদ্যোগ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। শিগ্‌গির সেটি চাঁদে মানুষ অবতরণ করানোর ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার, এবং পৃথিবীকে পরিক্রমণকারী মহাশূন্য ষ্টেশন স্থাপন করার লক্ষ্যে কয়েকটি বিশাল প্রকল্পে পরিণত হয় এবং মূল উদ্দেশ্যগুলোতে যথেষ্ট সফল হয়। যথাযথ রকেট, মহাশূন্যযান ইত্যাদি তৈরি; চাঁদে যাওয়ার, নামার, এবং সেখান থেকে উঠে আসার, পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে আসার কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদিই ছিল মূল গবেষণার বিষয়। মহাশূন্য সম্পর্কে অনেক মৌলিক গবেষণা এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যবহার

করে খুবই উন্নত ও নিখুঁত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়েছে; একই ভাবে পরে মহাশূন্য ষ্টেশন স্থাপনের কাজও।

কিন্তু এই বিশাল উদ্যোগকে সফল করার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে অসংখ্য উপজাত প্রযুক্তি। এর মধ্যে আছে এবড়ো খেবাড়া জায়গার ওপর দিয়ে রোবট চালিত গাড়ি থেকে শুরু করে, প্রতিবন্ধী মানুষের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (রোবটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্নয়নের কৌশল থেকে), দাগ না পড়ার মত রঙীন চশমা, দমকল বাহিনীর জন্য আগুন নিরোধী পোষাক, তীব্র ঝাঁকুনি থেকে যন্ত্রপাতিকে ও মানুষকে নিরাপদ রাখার শক্ এবজরবার ইত্যাদি।

এভাবে ওই মহাশূন্য যাত্রার প্রয়োজনে সৃষ্ট কিছু প্রযুক্তি খুবই ব্যাপক ভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। সূর্য কিরণে মেলে ধরে যেই সোলার প্যানেল থেকে এখন সারা দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষের জন্য বিদ্যুৎ আসছে তার মূল আবিষ্কার ও প্রয়োগ হয়েছিলো শুধু মহাশূন্যযানের দৈনন্দিন বিদ্যুতের প্রয়োজন মেটাতে। তখন তা ছিল সদ্য উদ্ভাবিত ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অল্প কয়েকজন মহাশূন্যচারীর খাদ্য যোগান দিতে যে ফ্রিজ-ড্রাইড খাবারের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছিলো তা এখন অভিযানে থাকা সৈন্য বাহিনীতে, অভিযাত্রী দলের, জরুরী অবস্থায় সরবরাহ করতে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে। মহাশূন্যযানে বা মহাশূন্য ষ্টেশনে এটি প্রয়োজন হয়েছিলো মুখরোচক ভাবে রান্না করা সাধারণ খাবার থেকে সব পানি এমনভাবে সরিয়ে ফেলতে যাতে তার আয়তন ও ওজন একেবারে কমে যায়, এবং তা দীর্ঘ দিন ভাল থাকে– মহাশূন্যে নিতে যেসব গুণ খুবই দরকার। অথচ দরকার মত পানি যোগ করে নিলে ওই হুবহু একই মুখরোচক খাবারই সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া যায়। মহাশূন্যে নয় পৃথিবীতে যে অনেকের ক্ষেত্রে ওরকম ফ্রিজড্রাইড খাবারের কথা বলা হলো সেখানেও এর ঠিক ওই গুণগুলোই দরকার।

আজ প্রত্যেকের নিত্য সঙ্গী মোবাইল ফোনের ক্যামেরাতে ক্লিক করে যখন আমরা যথেষ্ট উচ্চ মানের ফটো সমানে তুলে যাচ্ছি তখন মনে রাখা দরকার মহাশূন্যচারীর সীমিত সংখ্যক কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান ফটোগুলো খুবই কম শক্তি ব্যয় করে তোলার সুবিধার জন্যই এই প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছিলো– এটি ছিল ফটো তোলার সম্পূর্ণ অভিনব প্রযুক্তি। মহাশূন্য অভিযানের বিশাল ব্যয়বহুল প্রকল্পে এই সব নানা প্রযুক্তির পেছনে যখন গবেষণা হয়েছিলো তখন হয়তো এগুলোর সর্বজনীন ব্যবহারের কথা চিন্তার মধ্যেই আসেনি, আসলেও সেই

গবেষকদের কাছে তার গুরুত্ব হয়তো তখন ছিলনা। কিন্তু তার পর পরই সে গবেষণার উপজাত হিসেবে এসে এসব যখন মানুষের হাতে হাতে ব্যবহৃত হতে দেখছি তখন আমরাই ভুলে যাই মূল গবেষণাটি কেন হয়েছিলো।

# মহাকাব্যটির লেখক-পাঠক

কাব্যটি জ্ঞান সম্পর্কে

**বিচিত্র তার রূপঃ**

বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতে ভালবাসেন এমন যে কারো জন্য নানা স্বাদের জ্ঞান আস্বাদনের কোন অভাব হবেনা। একই সঙ্গে তিনি ওসবের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও যেতে পারবেন। মস্তিষ্কের ঝড় কিছু না কিছু তাঁর থাকবেই যার ভেতর যুক্তির, গণিতের, সাক্ষ্য-প্রমাণের নানা হিল্লোল বইবে। একদিকে কল্পনা জগতের অন্যদিকে বাস্তব কাজের একটি দোলাচল ওই অভিজ্ঞতাগুলোকে অদ্ভুত এক রকম ভিন্ন মাত্রা দেবে। কারো কারো জন্য এই বাস্তব কাজ ল্যাবে, বাড়িতে, ছাদে, বাগানে, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে; কারো কারো জন্য এটি রীতিমত একটি অভিযাত্রা; অথবা নিজের দ্বারাই কোন এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন। বিজ্ঞান মহাকাব্যটির যাঁরা বড় লেখক তাঁরা খুব সম্ভব অনেকটা সময় এমনি সব আস্বাদনের ও অভিজ্ঞতার উচ্চতম পর্যায়ে কাটিয়ে সেই লেখার সক্ষমতা অর্জন করেছেন– যাঁর ভেতর প্রতিভার ও সৃষ্টিশীলতার ঝলকটি হয়তো ব্যতিক্রমী ধরনের। কিন্তু যে কাব্য তাঁরা সৃষ্টি করেছেন তা সবার জন্য উন্মুক্ত কাব্য, শুধু পড়তে নয় সমালোচনা করতে ও ভুল ধরিয়ে দিতে, এমনকি বিকল্প তত্ত্ব দিতে। জ্ঞানের কাব্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয় বলে সবাই একই বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারেন। এ কাব্যের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানী সমাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গেলে তবেই এটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বাকিরা যাঁরা ওই উন্মুক্ত কাব্য আস্বাদন করবেন, নিজের মত করে সমালোচনাও করবেন, তবে ওই উচ্চতর অভিজ্ঞতার অভাবে তত্ত্বের গ্রহণ-বর্জনে হয়তো ততটা অংশ নেবেননা। তাঁরা হতে পারেন ছাত্র-ছাত্রী, সৌখিন বিজ্ঞানী যাঁরা সদ্য বিষয়টি নিয়ে পরিচিত হয়েছেন, এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, কিছু কাজও করেছেন। কিন্তু তাঁদের মতামতেরও দাম রয়েছে; যেমন ছাত্রছাত্রীরা কেউ এতে পাকা হয়ে গেলে তাঁদের কারো হাতেই তত্ত্ব মার খেতে পারে। ওভাবে যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই বাছাই হয়ে পরিশীলিত মহাকাব্যের অংশ হয়েছে। যাঁদের ঐক্যমত্য ও আপত্তি ওই যাচাই বাছাইয়ে গুরুত্ব পায় তাঁদের সংখ্যাও অনেক, তাঁরা অগুণতি হতে পারেন যদি

এ তত্ত্ব ইতোমধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রে কাব্যের এই বিচিত্র রূপের কোন কোনটি বাকি সব পাঠকের কাছেও উপভোগ্য ও প্রশংসিত না হলে আমরা এ কাব্যকে মহাকাব্যিকে রূপে গণ্য করতামনা। নিজেদের বিভিন্ন ভূমিকায় জ্ঞান-কাব্যের ওই অংশের সঙ্গে জড়িত সবার ভাবনায় না এলে এটি মহাকাব্যের দ্যোতনা পাবে কী ভাবে? শুধু পণ্ডিতদের নয়, সাধারণ পাঠকেরও। 'ব্যাপারটি আমিও বুঝেছি'– এমন উপলব্ধি যদি অনেকের না হয় তাহলে অন্তত এই একটি দিক থেকে বিজ্ঞান মহাকাব্যিক হয়ে উঠতে পারেনা।

সেটি যাতে হতে পারে সে জন্য এখন শত রাস্তা খোলা রয়েছে। দিন দিন সে রাস্তার সংখ্যা বাড়ছে, রাস্তাগুলো আরো প্রশস্ত হচ্ছে, যাতে আরো বেশি পথিকের চলাচল ঘটতে পারে। এ রাস্তা হলো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষা, বিচিত্র গণমাধ্যমে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য, স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞানীদের নানা কার্যক্রম, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম ভিত্তিক বিজ্ঞানী নেটওয়ার্ক, এসবের আশ্চর্য রকম বিস্তার। এসব পথ ধরে বিজ্ঞানের পথে হাঁটা অনেকে ওটিকে জীবনে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করেছেন বিজ্ঞান-সংশ্লিষ্ট কাজের মধ্যে থেকে, বাকিরা তা করেন নিজ ভিন্ন উপায়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে– শুধুই হৃদয়ের টানে। তাঁদের অনেকেই বিজ্ঞানের নানা অগ্রগতিতে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে অংশ নেন এবং তাতে রীতিমত অবদান রাখেন।

একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেয়া যাক। বেশ কছুদিন আগে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ মহাশূন্যে কাজ শুরু করার পর থেকে মহাকাশের অত্যন্ত স্পষ্ট ও মূল্যবান সব ছবি পাওয়া যাচ্ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি জেম্‌স ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এদিক থেকে আরো একটি বড় উল্লম্ফন এনেছে। অনেকের কাছে মহাবিশ্বের প্রান্ত থেকে এর আদিতম গ্যালাক্সি সমূহের ছবি এবং আরো বহু মহাজাগতিক ঘটনার ঝকঝকে উজ্জ্বল ছবি যথেষ্ট রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে; বর্ণালীর ইনফ্রারেড অংশকে গুরুত্ব দিয়ে এ ছবিগুলো এমন সব প্রকৃত দৃশ্য ধারণ করতে পেরেছে যা আগে সম্ভব ছিলনা। কিন্তু ওই বিজ্ঞানের নানা পথের পথিকদের আরো অনেকে রয়েছেন যাঁরা আগে থেকেই মহাকাশের ঘটনাগুলোর চুলচেরা হিসেব রাখছেন, ওগুলো সম্পর্কে তত্ত্বগুলোকে বিশ্লেষণ করছেন। তাঁদের কাছে স্পেস টেলিস্কোপের এই ছবিগুলো আরো গভীর বার্তা নিয়ে আসছে, এবং তাঁরা নতুন উৎসাহে এগুলোরও বিশ্লেষণে লেগে গিয়েছেন, এ সম্পর্কে বড় বিজ্ঞানীরা

কী বল্‌ছেন তারও তত্ত্ব নিচ্ছেন। অথচ তাঁদের অনেকে প্রচলিত অর্থে পেশাদার বিজ্ঞানী নন।

২৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোন মহাজাগতিক বস্তু এভাবে মহাবিশ্বের জন্মের পরেপরের ঘটনার বার্তা নিয়ে এসেছে, তাই এটি নেহাত একটি ফটো মাত্র নয়। এটি দর্শককে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছে যেখানে তিনি ক্রম-প্রসারণশীল এই মহাবিশ্বের মধ্যে নিজের অবস্থানকে অনুভব করতে পারেন। এ অনুভূতি শুধু একটি চিন্তার ঘোর নয় বরং সত্যিকার দূরত্ব, ঔজ্জ্বল্য, গতি ইত্যাদির মাপে সম্পূর্ণ অর্থবহ একটি বিজ্ঞান। এভাবেই কাব্যটি মহাকাব্যিক রূপ ধারণ করতে পেরেছে সবার জন্য যার যার মত করে। বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মধ্যে থেকেই নানা রূপে অনুভব করা যায় কারণ এই অনুভূতিগুলো তার মধ্যেই আছে। যেমন বিজ্ঞানের একটি খুবই মুখ্য উপাদান হলো এর যান্ত্রিকতার রূপ– কেমন করে একটি জিনিসে গতি সঞ্চার হয়, কেমন করে তা অন্য কিছুতে গতি আনে ইত্যাদি পরম্পরায়গুলোর অনুসরণ– একটি যন্ত্রের কাজ করার মত। বিজ্ঞানী সব কিছুকে এমনি একটি যন্ত্রের মত করে দেখতে চান অনেক সময়। দু'হাজার বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানীরা লিভার, পুলি, ঢালু তল ইত্যাদি সরল যন্ত্রের কাজ বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা এগুলোর বাস্তব ব্যবহারও করছিলেন। তাতে অনেক উত্তেজনা ছিল, বোঝার তৃপ্তিও ছিল– এটি মানুষের সনাতন উত্তেজনা ও তৃপ্তি, জীবন সংগ্রামে হাতিয়ার ও যন্ত্র তৈরি করতে করতে বিবর্তনের ফল। আদিম মানুষের অনেক হাতিয়ারও ছিল সরল যন্ত্র। আজো এমনি সরল যন্ত্রের মত করে বিজ্ঞানটিকে বুঝতে পারাটি যে কারো জন্য একটি জ্ঞান-কাব্য।

বুঝতে গিয়ে এই যান্ত্রিকতার উপাদানটিকে বিজ্ঞানী কিন্তু এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখেননি। আজ যখন মস্তিষ্ক কী ভাবে চিন্তা করছে সেটি দেখতে চাই, বা কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করতে চাই, এমন জটিলের জটিলকে সহজ করে বোঝার তাগিদে ওই যান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টাটি সেখানেও করি। জটিলতম গণিতও তো যোগ-বিয়োগের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কাজ কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কিউবিটের কাজ বোঝার সময়ও সেই মৌলিক যান্ত্রিকতা আমাদেরকে সাহায্য করে। এটি একটি উপাদান বটে, কিন্তু বিজ্ঞানী ওখানে থেমে থাকেননা– যান্ত্রিকতাকে ছাড়িয়ে বিমূর্ত কল্পনা, উচ্চতর সব মাত্রা যা আমাদের সাধারণ বোধশক্তিতে

কূলায়না। এসব অদ্ভুত উপাদান ব্যবহার করতেও তাঁর ক্লান্তি নেই। কারণ এর প্রত্যেকটিই আসলে খুবই মানবিক।

বিজ্ঞানের কোন এক পথে হাঁটছেন এমন যে কোন পথিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা, অদৃশ্য তরঙ্গ, স্নায়ুকোষের স্ফুরণের প্যাটার্ন, কোটি বছরে কুকুরের মত প্রাণীর তিমিতে পরিণত হওয়া ইত্যাদি কোন কিছুর কল্পনাতে অস্বস্থি বোধ করেননা কারণ এগুলোর কোনটাই কল্পনায় ভেসে যাওয়ার ব্যাপার নয়, পরের মুহূর্তেই দেখা যায় এগুলো অত্যন্ত বাস্তব– তার ফলাফল আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কণিকাগুলো উদ্ঘাটক বাবল চেম্বারে তার পথরেখা দেখিয়ে দিচ্ছে, তরঙ্গ টেলিভিশন স্ক্রীনে ছবি বহন করে আনছে, কিংবা স্তন্যপায়ীর সকল বৈশিষ্ট নিয়েও তিমি সমুদ্রে বাস করছে। এই সব পথিকের সামনেই উন্মুক্ত জ্ঞান। তাঁরা প্রত্যেকে এর মধ্যে বিজ্ঞানটির নানা রূপের মধ্য থেকে নিজের অংশগ্রহণ বেছে নিতে পারেন– নিজেই ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে কাটাছেরা করে জানবেন, অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দিনের পর দিন কাটাবেন, কোমর বেঁধে বিজ্ঞান অভিযাত্রায় যাবেন, অন্যরা যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন এবং সেভাবে তার স্বাদ পাবেন। বিজ্ঞান মহাকাব্যটি একটি বই নয় যা প্রচ্ছদ থেকে প্রচ্ছদ পর্যন্ত পড়ে যাওয়ার মত। এটি আসলে অসংখ্য লেখায় ছড়ানো বই। এর রয়েছে বহুতর সংস্করণ বহু রকম পাঠকের উপযুক্ত করে তৈরি করা– এর মধ্য থেকে নিজের পছন্দের সংস্করণটি পাঠক বেছে নিতে পারেন। সব সংস্করণের মর্মটি অবশ্য একই।

কারো সংকল্প হলো যেহেতু এই বিজ্ঞানটি গণিত নির্ভর কাজেই আমি সে গণিত শিখে, চর্চা করে সেই বিশুদ্ধ রূপেই তাকে দেখতে চাই। কেউ হয়তো ভাবেন সে কাজে সময় দেয়ার চেয়ে আমি বরং গণিতবিহীন সংস্করণের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখি– সেখান থেকেই হয়তো মুক্তার ঝিনুক পেয়ে যাবো। আমার আনন্দটুকু আমি মহাকাব্যের ঐ সংস্করণেই খুঁজে নেবো। অবশ্য সব সংস্করণেই মূল কাহিনীকারদেরই সৃষ্টি এই বিজ্ঞান মহাকাব্য। তাঁরাই এর মধ্যে অন্যদের চিন্তা যোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদের আবিষ্কারের মাধ্যমে, এবং তাঁদের মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টির প্রেরণায় বেরিয়ে আসা তত্ত্বের মাধ্যমে। কখনো মনে হয় তাঁরা অন্যরকম দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকৃতির নাড়ীনক্ষত্র দেখতে পেয়েছিলেন, আবার কখনো মনে হয়েছে তাঁদের সৃষ্টিটিই এতো অনন্য সুন্দর যে প্রকৃতি নিজের থেকে তাতে সাড়া দিয়েছে। এ কারণে এই মূল কাহিনীকারদেরকে

আমরা মহাকাব্যটির থেকে আলাদা ভাবে দেখতে পারিনা, মনে হয় যেন তাঁদের জীবনটাও এই কাহিনীরই অংশ। তাই ভাবতে হয় একজন এরিস্টোটল, একজন নিউটন, একজন ডারউইন, একজন আইনস্টাইন না আসলে এ কাহিনী কী রকম হতো সেটিও একটি কৌতূহলী ভাবনা।

**আবিষ্কারকরা কী ভাবে কাহিনীরই অংশঃ**

বিজ্ঞানের অনেক ছাত্র শুধু রেফারেন্সের খাতিরে আবিষ্কারকের নামটুকু ব্যবহার করেন, তাঁদের কাজের পটভূমি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহলী না হয়েই বিজ্ঞানে নিজের দখল আনতে পারেন। কিন্তু সেটি করলে তাঁরা ভীষণভাবে বঞ্চিত হবেন বিজ্ঞানের পুরো অনুধাবন থেকে, কাহিনীর পুরো শিহরণ থেকে। বিজ্ঞান অনেক বেশি সজীব হয়ে ওঠে আবিষ্কারকের মস্তিষ্কের অনুরণনটা যখন আমরা ধরতে পারি, তাঁর অস্থির পরিকল্পনাগুলো যখন আমরা মাথায় আনি। বিজ্ঞানের মহাকাব্যের সমান্তরালে তাই আর একটি কাব্য আছে যা আবিষ্কারকদের অনুরণন কাব্য। এই দুই কাব্যকে এক করে দেখলেই তার পুরো মর্মটি ভাল অনুভব করা যায়। এই সমান্তরাল কাব্যে খেয়ালি মানুষের খেয়ালি কাজ আছে– যেমন কার্ল লিনিয়াস জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করেছেন সব জীবকে শ্রেণীভুক্ত করতে ও তাদেরকে বৈজ্ঞানিক নাম দিতে। আর্কিমিডিসের মত কেউ কেউ শুধু 'ইউরেকা' মুহূর্তেই সাফল্যের সন্ধান পেয়েছেন- এক্ষেত্রে বাথ টাবের পানি তাঁর দেহ ডোবার সময় ছলাৎ করে উপচে পড়ার কারণে।

কেউ কেউ আবিষ্কারটি মাথার মধ্যে চলে এলেও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন এটিকে নিশ্চিত করার সাধনায় যেমন ডারউইন করেছেন ত্রিশ বছর ধরে শত শত ভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধৈর্যশীল পরীক্ষণে– এমনকি কীট-পতঙ্গ, সমুদ্রের শিলাপাথরে আটকানো হাজার হাজার বিভিন্ন বার্নেকল ইত্যাদিকে দিনের পর দিন ব্যবচ্ছেদ করে। আইনস্টাইন দশ বছর অপেক্ষা করলেন আবিষ্কারের সঠিক প্রকাশে জন্য উপযুক্ত গণিত খুঁজে পেতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল পথে হেঁটে বিজ্ঞানকেই দীর্ঘ কালের জন্য ভুল পথে নিয়ে গিয়েছেন, যেমন এরিস্টোটল করেছেন। কিন্তু মহাকাব্যটি তো ওভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাঁদের কালটি গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের আশপাশে কারা ছিলেন, কাদের সঙ্গে তাঁরা তর্কবিতর্ক করেছেন, সবই।

আসলে সব কালেরই বিজ্ঞানীর কাহিনী মানে তার সমাজের কাহিনীও। যেমন সেই গ্রীক দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের তর্ক-বিতর্ক দেখলে বুঝতে পারি ওই সমাজে বেশ কিছু অদ্ভুত চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন যাঁদের কাছে আপাত খুব বিজাতীয় চিন্তাও খুব গুরুত্ব পেতো; সে কারণেই একেবারে মৌলিক বিজ্ঞান তাঁদের হাতে সৃষ্টি হতে পেরেছিলো। যেমন আমরা দেখেছি পারমেনাইড বল্‌ছেন কোন রকম গতিই সম্ভব নয়– এর পেছনে প্রচুর যুক্তি তিনি দিচ্ছেন, আর তাঁর সমর্থনে গণিতবিদ জেনো তো গতি দেখেও যুক্তিতে তা খুঁজে পাচ্ছেননা। অথচ ওই একই সময়ে আর এক গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস বল্‌ছেন সবকিছুই সব সময় গতিময়। তাঁর যুক্তিও কম প্রবল নয়। এ ধরনের বিতর্ক এরিস্টোটলকে তাঁর গতি তত্ত্বের দিকে নিয়ে গেছে।

পীথাগোরাস, প্লেটো প্রমুখ গ্রীক বিজ্ঞানীরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে পাওয়া জ্ঞানকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে আইডিয়ালিজমের কথা বলেছিলেন সেখানে আইডিয়াটাই আসল, যা দেখি তা নয়। অনেক গ্রীক দার্শনিকের মত এই আইডিয়ালিজমের অনুসারী এটমিক থিওরির প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস ছাত্রদেরকে বলছেন আমাকে অন্ধ করে দাও, যাতে চোখ আমাকে বিভ্রান্ত না করতে পারে। আবার একই সময়ে এরিস্টোটল বল্‌ছেন আইডিয়াকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে তা অচল। এই মৌলিক ভাবনার মানুষগুলোকে না চিন্‌লে, তাঁদের সমাজকে না বুঝলে বিজ্ঞানের মর্মকে বোঝা যায়না, কারণ আধুনিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের ভাবনা নিয়ে আরো ভেবেই এখানে এসেছেন।

আজও যে সৃজনশীল মানুষরা বিজ্ঞান সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁদেরকে চেনা, তাদের পটভূমি জানা জরুরী। কিংবদন্তীর বিজ্ঞানীদের বিশেষ চেহারা, আচরণ ইত্যাদি আরোপ করতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, সে তুলনায় আজকের বহু সৃষ্টিকারদেরকে নেহাত আটপৌরে চেহারার ছা-পোষা মানুষ মনে হতে পারে আর দশজন মানুষের মত। কিন্তু তাঁদের মনোজগতটি মোটেই ছা-পোষা নয়, অনেকের ক্ষেত্রে রীতিমত মহাকাব্যিক। এঁদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি কিংবদন্তীর বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও আটপৌরে জীবনের সবকিছু প্রাসঙ্গিক নয়, বিজ্ঞান সৃষ্টিকারী মনোজগতটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান-কাব্যের একজন মহানায়ক বলা যায় যে মানুষটিকে, সেই নিউটন শুধু বিজ্ঞানী হিসেবে প্রশংসিত ও মাথায় তুলে রাখার মানুষ ছিলেন না, বরং বড় বড় পদ, সরকারী খেতাব, যেমন টাকশালের অধিকর্তা ইত্যাদিও অধিকার করেছেন, যেগুলোর প্রতি তাঁর যথেষ্ট মোহও

ছিল। অত্যন্ত যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী হয়েও তিনি লোহাকে সোনা করার প্রয়াসে তুকতাক সহ আলকেমির যে বিদ্যা প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছিলো তার চর্চাও করেছিলেন। অন্যকে অগ্রাহ্য করে নিজের আবিষ্কারটি বড় করে তোলার দুর্বলতাও তাঁর ছিল– রবার্ট হুক ব্যস্তবর্গ নিয়মটি তাঁর আগেই ভেবেছিলেন এমন দাবী শুনে তিনি হুকের বর্তমানে তাঁর বিখ্যাত মহাকর্ষ তত্ত্ব (যাতে ব্যস্তবর্গ নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ) প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রয়্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ ব্যবহার করে তিনি লাইবনিজকে রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁর ক্যালকুলাস আবিষ্কার উপস্থাপন করতে দেননি। নিউটন মনে করতেন ক্যালকুলাস একা তিনি আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু ইতিহাস বলে লাইবনিজও স্বাধীন ভাবে সেটি করেছিলেন এবং লাইবনিজের পদ্ধতিটিই সবাই আজ অনুসরণ করে। একজন বিজ্ঞানীর পুরো জীবনকে দেখতে গেলে এসব হয়তো বাদ দেয়া যায়না, কিন্তু আমরা যখন বলি তাঁদের জীবন তাঁদের বিজ্ঞানের সঙ্গে একটি সমান্তরাল কাব্য রচনা করেছে তখন শুধু তাঁদের জীবনের বৈজ্ঞানিক মননের কথাটাই বলি। নিউটন সেই মননের সর্বশ্রেষ্ঠদের একজন। তিনি মহাবিশ্বকে নিয়মের একটি নিখুঁত মহাঘড়িতে রূপ দিয়েছিলেন, সৃষ্টি করেছিলেন সেই কয়েকটি বিশ্বনিয়মের যা মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রয়োগ করে গোলা নিক্ষেপ থেকে গ্যালাক্সির চলাচল সব কিছুর সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। এদিকটা লক্ষ্য করে সমসাময়িক বিজ্ঞানী লাপ্লাস বলেছিলেন আমাকে প্রত্যেক কণিকার আজকের অবস্থাগুলো এবং নিউটনের নিয়মগুলো দাও– আমি মহাবিশ্বের পুরো ভবিষ্যতকে হিসেব করে বলে দেবো।

বিজ্ঞানীর মনন নিয়ে যে কাহিনী তাতে তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তির ঘটনাগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজ জেনেটিক্স বিজ্ঞানটি সাফল্যের প্রথম সারিতে রয়েছে। কিন্তু এর যিনি সত্যিকার সফল সূচনা ঘটিয়েছিলেন সেই য়োহান মেন্ডেল ছিলেন অবহেলিত ও ভুলে যাওয়া একজন বিজ্ঞানী যাঁর এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি দীর্ঘকাল বাকি বিজ্ঞানীদের অগোচরে থেকে গেছে। বাবা মা'র বৈশিষ্টগুলো কীভাবে সন্তানের মধ্যে যায় এই প্রশ্নটির যে সব উত্তর তখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা দিচ্ছিলেন তার সবই ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা। কিন্তু মেন্ডেলের এই আবিষ্কার জেনেটিক্সের মূল নীতিটিই দিয়ে দিয়েছিলো। কী ভাবে সেটি আমরা এবইয়ে আগে দেখেছি। ভাগ্যিস তিনি তাঁর পরীক্ষাটি মটরশুটির ওপর করেছেন। অন্য বহু উদ্ভিদে ও প্রাণীতে এমন সব জটিলতা আছে যে তার ঘোরপেঁচে মেন্ডেল এত সহজে মূলনীতিটি ধরতে পারতেননা। মেন্ডেলের এই

জেনেটিক্স কিন্তু পরবর্তী একশ' বছরেরও বেশি সময় বিজ্ঞানীদের কাছে প্রায় অজানাই রয়ে গিয়েছিলো, যদিও এ আবিষ্কার নিয়ে প্রবন্ধ তিনি যথারীতি বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ করেছিলেন। সঠিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও এই পুরোটা সময় প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানীরা বংশগতির একেবারে ভুল বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে তাঁদের চর্চা করে গেছেন। ডারউইন তাঁর বিবর্তন তত্ত্বেও বংশগতির ভুল তত্ত্ব ব্যবহার করেছেন। ভাগ্যক্রমে তাঁর তত্ত্বে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে বংশগতিতে সন্তানদের মাধ্যমে জীবের গুণাগুণ বেশি বা কম ছড়ানোর ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও ঠিক কোন্ প্রক্রিয়ায় সেই বংশগতি কাজ করছে তার কোন গুরুত্ব ছিলনা। তাই বংশগতির নিয়মটি ভুল হয়েও তা বিবর্তন তত্ত্বের শুদ্ধতায় কোন বিঘ্ন ঘটায়নি। এত বড় আবিষ্কারের প্রতি এত অবহেলা নিশ্চয়ই মেন্ডেলের বিজ্ঞানী জীবনকে প্রভাবিত করেছিলো।

মনোকষ্টের কথা যদি বলি কোয়ান্টাম তত্ত্বের দু'জন প্রধান সৃষ্টিকার আইনস্টাইন ও শ্রোয়েডিঙ্গারেরও একই অনুভূতি হয়েছিলো তাঁদের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারকে নিয়ে। তাঁরা দু'জনেই জানতেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটি ব্যতিক্রমী তত্ত্ব– তাঁরা নিজেরাই একে ব্যতিক্রমী করে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু পরে এর যে ব্যাখ্যাটি সবার কাছে যথাযথ ও সফল বলে বিবেচিত হলো তা বল্লো এই তত্ত্বের ফলগুলো শুধু বিভিন্ন সম্ভাবনা দেয়– একটি বিশেষ কণিকা কোথায় আছে কোথায় যাচ্ছে সে কথা এটি জানাতে পারেনা, বরং শুধু জানায় অনেক সম্ভাব্য জায়গার মধ্যে কোথায় থাকার সম্ভাবনা কত, কোথায় যাওয়ার সম্ভাবনা কত। ফলে একটি বিশেষ বাস্তব পরিমাপে কী পাব তা অনেকটা লটারির কাগজ টানার মতো দৈব নিয়মে ঠিক হয়, তবে অনেক কণিকার গড় ফলগুলো খুবই সঠিক ভাবে জানাতে পারে। যদিও তাতেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব অত্যন্ত নিখুঁত বাস্তব ফলাফল দিতে পারে, কিন্তু চিরকাল বিজ্ঞান বলতে আমরা যে রকম সুনির্দিষ্ট ফল চেয়েছি, কোন কিছুর গতিবিধিকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতি মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও বেগের ভিত্তিতে অনুসরণ করতে চেয়েছি তা না পাওয়াতে শ্রোয়েডিঙ্গার ও আইনস্টাইন দু'জনেই মর্মাহত হয়েছিলেন। আইনস্টাইনের ভাষায় সৃষ্টিকর্তা কখনো জুয়া খেলতে পারেন না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরে বিশ্ব জয় করেছে, সবাই তার ওই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু শ্রোয়েডিঙ্গার ও আইনস্টাইন তা কখনো মেনে নিতে পারেননি।

পাঠকরাও লেখায় অবদান রাখেন

**তাঁদের অংশগ্রহণ জরুরীঃ**

অন্য মহাকাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞান-মহাকাব্যের একটি পার্থক্য হলো পাঠক এটি শুধু পাঠ করেন না চর্চার মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণও করেন। কোন লেখক একা যেহেতু এর পুরো মহাকাব্য সৃষ্টি করেন না তাঁদেরকেও এটি পড়তে হয়, অন্য অংশগুলো বোঝার জন্য, এবং সেই বোঝাটা প্রকারান্তে তাঁর লেখার ওপরও প্রভাব রাখে। কাজেই একদিক থেকে লেখকরাও এর পাঠক, এবং পাঠকদের কেউ কেউও লেখক। সবাই মিলেই বিজ্ঞানকে 'পাবলিক নলেজে' পরিণত করেছেন। অবশ্য মূল লেখকরা সবাই বিজ্ঞান সমাজের মধ্যমণি। আর যাঁরা মধ্যমণি নন্ হৃদয়ের টানে এ মহাকাব্যের পাঠক হয়েছেন, তাঁরাও কিন্তু বিজ্ঞান সমাজেই রয়েছেন– তাঁদের পাঠক-প্রতিক্রিয়াটিও কিন্তু মহাকাব্যের জন্য খুব জরুরী। এতে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ব্যাপারগুলো সবাইকে কীভাবে নাড়া দিয়েছে, তাঁদের মননে ও সার্বিক জীবনে তা কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা মহাকাব্যের পরবর্তী গতি প্রকৃতি অনেকটা নির্ধারণ করে দেয়।

বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা ও নতুন গবেষকরা এর একটি অগ্রণী অংশ। ভবিষ্যৎ বড় বিজ্ঞানী হিসেবে এরা সম্ভাব্য বড় লেখকও বটেন– কাহিনীর এগিয়ে যাওয়ার চক্রে তাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিজ্ঞানকে নতুন জীবন দিতে পারেন। আরেকটি বেশি সম্ভাবনাময় দল হলো তাঁদের যাঁরা বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং এর থেকে প্রযুক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল রয়েছেন। তাঁদের থেকেও বিজ্ঞানের পরবর্তী পথের কিছু দিগদর্শন সব সময় আসতে থাকে। বিজ্ঞানের কাহিনীকাব্য কোন্ কোন্ দিকে এরপর মোড় নেবে তার একটি প্রস্তুতি ক্ষেত্র তাঁরা তৈরি করে চলেছেন। স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক বিজ্ঞানীরাও এখন অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করছেন। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যের গুরুত্বের কারণে, লক্ষ্যমুখী সর্বসাধারণের আন্দোলনের ব্যাপকতার কারণে এই ভূমিকা আরো বড় হয়ে পড়েছে– যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, জীব-বৈচিত্র, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার সর্বত্র নিভৃতচারী হয়ে একা যেমন কাজ করছেন তেমনি সামাজিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িত হয়েও কাজ করছেন; অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক গতি-প্রকৃতিগুলো তাঁদের অনুসন্ধানী কাজের ওপর দারুণ ভাবে নির্ভর করছে। সংবাদে তত দেখা না গিয়েও আজকাল জ্যোতির্বিদ্যা, জেনেটিক্স, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক বিজ্ঞান দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী

বিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া নিজেদের আটপৌরে ঘরোয়া বিজ্ঞানের কাজের ভেতরেও যাঁরা বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে নিজের বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র খোঁজেন তাঁরাও কম কী?

তাঁরা সবাই অবশ্যই বিজ্ঞান মহাকাব্যের পাঠক এবং পরোক্ষ ভাবে 'লেখক'ও বটেন। বিজ্ঞান মহাকাব্যের নিজের পছন্দ করা সংস্করণে আত্মনিয়োগে নিজেদেরকে উদ্দীপ্ত রাখেন। মানবজাতির এই বিশাল প্রকল্পে যেভাবে যেটুকুই হোক জড়িত থাকাটি প্রত্যেককে যেন দ্রুত হাউই বাজির মত উচ্চতা দেয়। মহাকাব্যটির চরিত্রই এমন এ যেন প্রকৃতির অতি জটিল আচরণের প্রতি পুরো মানবজাতির একটি উপযুক্ত জবাব। এর জোরেই মানুষ তাকে পরীক্ষা করে, তাকে জানে, তাকে বদলাবারও চেষ্টা করে।

**বিজ্ঞান সমাজটি আজ বড়ঃ**

বিশ্বায়ন এখন এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে বিশ্ব-মানুষের সমস্যাগুলো আজ সর্বত্র প্রত্যেকের নিজের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি বিশ্ব-মানুষের আশা আকাঙ্খাগুলোও প্রত্যেকের আশা-আকাঙ্খা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি এগুনো, পিছানো এখন প্রত্যেক মানুষের কাছেই প্রাসঙ্গিক। সব আবিষ্কারকে সবাই স্বাগতম জানাতে পারেননা। কিছু আবিষ্কার অনিষ্ট ঘটিয়েছে এবং আশঙ্কার কালো ছায়াও বহন করে এনেছে, এখনো আনে। নিউক্লিয়ার অস্ত্র এখনো মানব জাতির ওপর ধ্বংস-সম্ভাবনার খাঁড়া হয়ে ঝুলছে। আজ এ মুহূর্তে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এই সম্ভাবনা অনেকটা বাস্তবের মতই দেখাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে যে ভাবে নীরবে নানা অভাবনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে তাও আশঙ্কার সৃষ্টি করছে। মানুষের জীবিকা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ওপর এটি সহজেই আঘাত হানতে পারে। এমনি আশঙ্কা আরো বহু ক্ষেত্রে আছে জেনেটিকালি পরিবর্তিত খাদ্য, মস্তিষ্কের ওষুধ, জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং (পৃথিবীর ভূতত্ত্বকে বদলে দেয়া) ইত্যাদি অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পেছনে আশঙ্কা-জনিত সন্দেহ লুকিয়ে রয়েছে। অবশ্য এর প্রত্যেকটিরই সম্ভাব্য অনেক বড় বড় উপকারও রয়েছে, আশঙ্কাটি উপকারকে ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ। তেমনটি যদি মনেও হয় তবুও বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোন লাভ নেই। বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা খুবই কঠিন, প্রকারান্তে বরং এর গবেষণা প্রকাশ্য ভুবন থেকে গোপন ভূবনে চলে যাবে, তখন এর ওপর কোন নিয়ন্ত্রণই রাখা সম্ভব হবেনা। এখানে নির্ভর করতে হবে সেই

আশাবাদী সত্যটির ওপর; বিজ্ঞান সমাজটি এখন অনেক বড়, ক্রমে আরো বড় হচ্ছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর মানবগোষ্ঠির বিজ্ঞান-মনস্কতাই সব কিছুকে নিরাপদ এবং কল্যাণমুখী রাখতে সক্ষম। এ নিয়ে পুরো বিজ্ঞান সমাজের সতর্কতা যত বেশি হবে ততই আশঙ্কাগুলো দূরে থাকবে।

এই কল্যাণধর্মিতার দিক থেকেও বিজ্ঞানকে মহাকাব্যিক বলে মনে হয়। যে কোন মহাকাব্যের যে রাজ্য তাতে নানা মানুষের নানা স্বার্থ থাকতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিবার্য একটি ভাগ্য তাকে নির্ধারিত কিছু ফলশ্রুতির দিকে নিয়ে যায়– বিখ্যাত মহাকাব্যগুলোর ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ফলশ্রুতিটি স্বর্গেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। কখনো সেই ফলশ্রুতি হয় সত্যের নৈতিক জয়, সুখ-শান্তির পৃথিবী, কিন্তু অন্য সময় হয় অভাবনীয় ট্রাজেডি– উভয়েই মহাকাব্যিক মাত্রার। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কিছু বিশাল অনিবার্যতা আছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যে মানুষ নিজেই সেগুলো আবিষ্কার করেছে। যেমন থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় নিয়ম মহাবিশ্বকে এক অনিবার্য তাপ-মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটি একটি মহাজাগতিক ট্র্যাজেডিই বটে। মানুষ নিজে যেন সে রকম ট্র্যাজেডি ডেকে না আনে সেটিই করণীয়, সে জন্য সব মানুষের সমঝোতা প্রয়োজন। মানব বিবর্তনে সব সময় প্রাকৃতিক নির্বাচন সমঝোতাকে নির্বাচিত করেছে, বিভেদকে নয়; কারণ সমঝোতাই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আবেগের বিবর্তন ভিত্তিক তত্ত্ব দেখিয়েছে যে সেই কারণেই ভালবাসা, বন্ধুত্ব, সমঝোতা এগুলো এত শক্তিশালী হয়ে মানুষের মধ্যে এসেছে। এমনকি রাগ, লজ্জা, অপরাধবোধ ইত্যাদি নেতিবাচক অনেক আবেগও এসেছে সমঝোতাকে অটুট রাখার স্বার্থে।

বিজ্ঞান সমাজ যত বড় হবে, সবার বিজ্ঞান-মনস্কতাটি যত বাড়বে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভেদবুদ্ধি তত কমে যাবে; বিশ্ব-সমঝোতাটি তত বেশি সম্ভব হবে। বিজ্ঞান তখন অনিবার্যভাবে একটি দিকেই যেতে পারবে তা হলো মানবকল্যাণের দিকে, এবং সেই সঙ্গে বিশ্বকল্যাণের দিকে। বিজ্ঞানের প্রবণতার মধ্যেই যে এটি আছে তা আধুনিক বিজ্ঞানের একেবারে গোড়াতে প্রথম বিজ্ঞান সমিতি স্থাপনের মধ্যেই দেখেছি যা বৃটেনের রয়্যাল সোসাইটি। সেটি ছিল ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। সেদিনের মুখ্য কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং কয়েকজন মুখ্য বিজ্ঞান-প্রেমিক ব্যক্তিত্ব একত্র হয়ে একটি ক্লাবের মত করে এটি গঠন করেছিলেন, পরে এটি পরিণত হয়েছিলো আজকের সমস্ত বিজ্ঞান সমিতির

আদর্শ স্থানীয়তে। এর মূলে ছিল দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের বিজ্ঞান-দর্শন– বিজ্ঞানকে হতে হবে এক্সপেরিমেন্ট নির্ভর এবং মানবকল্যাণে নিয়োজিত। সেদিন সেটি ছিল মাত্র কয়েকজন মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা। আজ পুরো মানব সমাজটিই বিজ্ঞান সমাজ হবার চেষ্টাটি খুবই সঙ্গত এবং খুবই সম্ভব।

সব মহাকাব্য যা করে

**মানুষকে বড় করেঃ**

কাব্যের সঙ্গে 'মহা' শব্দটি আমরা জুড়ে দিই কারণ মহাকাব্যের মধ্যে আমরা বৃহৎকে অনুভব করি, যা মানুষকে বড় করে। আমাদের আটপৌরে জীবনে বেশির ভাগ সময় আমরা দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ ও চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এসময় যদি সাহিত্য ও কাব্যের সাহচর্য পাই তা হলে সেটি আমাদেরকে অন্য রকম জীবনের সন্ধান দেয়। আর মহাকাব্য সেই অন্য রকম জীবনের স্বাদকে বড় ব্যাপ্তি দেয়– বড় দেশ, বড় ভালবাসা, বড় ত্যাগ, বড় যুদ্ধ, বড় নীতি ইত্যাদি নানা ভাবে। এসবে আপ্লুত হওয়া, এর কোন কোনটিকে আদর্শ মানা, জীবনে এদের অনুকরণ করার চেষ্টা আমাদেরকে সাধারণ থেকে অসাধারণের দিকে তুলে নেয়। বিজ্ঞান এ কাজগুলো দারুণ ভাবে করে, তাই আমরা বিজ্ঞানকে মহাকাব্য বলেছি, যদিও সাধারণ অর্থে বিজ্ঞান আর কাব্য ভিন্ন জিনিস। কিন্তু কাব্য না হয়েও বিজ্ঞানের মধ্যে যে 'কাব্য' আছে তা ইতোমধ্যে এই বইয়ে আমরা স্পষ্ট করেছি; আর যে বিজ্ঞান গুহাবাসী মানুষকে আজকের জায়গায় এনেছে সে যদি 'মহা' না হয় তা হলে মহা কোন্‌টি?

যে কোন মহাকাব্য আরো একটি কাজ করে, মনের আবেগকে এর মধ্যে এমন তুঙ্গে নিয়ে যায় যে বাইরে থেকেও পাঠকরা কাহিনীতে নিজেকে উপস্থিত মনে করতে পারে, পাত্র-পাত্রীদেরই একজন বনে যেতে পারে নিজের চিন্তায়। এজন্য আমরা নানা ভাবে মহাকাব্যের সান্নিধ্য পছন্দ করি– কখনো নিজে পড়ি, কখনো কাউকে সুর করে পড়তে শুনি, তখনো আবেগে আপ্লুত হই, এর কাব্যনাট্য উপভোগ করি, সুযোগ পেলেই এর কোন কাহিনী-অংশ থেকে উপমা টানি। এদিকটায়ও বিজ্ঞানের সঙ্গে মহাকাব্যের দারুণ মিল। বিজ্ঞান যখন নতুন তত্ত্ব দেয় তারও অনেক কিছুই অদ্ভুত কল্পনার জিনিস থাকে, কিন্তু একবার পরিচিত হয়ে গেলে আমাদের কাছে এগুলো স্বাভাবিক সত্য এবং বাস্তব বলেই মনে হয়, আমরা নিজেরাও এগুলোকে ভাষার মধ্যে বাস্তব জিনিস হিসেবেই

ব্যবহার করে যাই। নিজেদের পরম জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর ওর মধ্যে সহজে খুঁজে পাই। আর প্রযুক্তি ও প্রয়োগের মাধ্যমে ওই তত্ত্বকেই দেখা যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও ঘিরে রেখেছে। মহাকাব্যের স্থান-কাল-পাত্রের মতই এগুলো আমাদের আপন হয়ে যায়। অথচ আমাদের আটপৌরে বাস্তবতার সঙ্গে বিজ্ঞানের এসব কথিত বাস্তবতার যোজন ভরা পার্থক্য।

তবে সব মহাকাব্য আমাদেরকে বড় ও ভাবুক করে তোলা সত্ত্বেও অন্যগুলোর সঙ্গে বিজ্ঞান-মহাকাব্যের একটি আপাত পার্থক্য আছে বলে মনে হয় আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কবিতার আকর্ষণটি মনে হয় স্বাভাবিক ভাবে ঘটে– কষ্ট করে ধাপে ধাপে অনেক কিছু শেখার কাজ না করেও আমরা তাতে মজে যেতে পারি, তার রস আস্বাদন করতে পারি। এ যেন একটি সহজিয়া আকর্ষণ। হ্যাঁ কবিতাতেও অভ্যস্ত হবার ব্যাপার আছে, চর্চার ব্যাপার আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আরোহণ-প্রতিক্রিয়াটি একটু কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়, উভয়ের ক্ষেত্রেই আসলে আকর্ষণটি একই ভাবে স্বাভাবিক। উভয়েই আমাদের ডিএনএ'র মধ্যেই আছে। একজন নবজাত শিশুরও ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবণতা আছে আবার বিজ্ঞানের মৌলিক জিনিস সহজাত ভাবে জানতে দেখা যায়, যেমন তলায় কিছু না থাকলে পড়ে যাবার ব্যাপারটি আগে থেকে বুঝতে পারা। খুবই অল্প বয়সী শিশুর আচরণ দেখেই এটি প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য যে পরিবেশ ও শিক্ষা রীতি প্রয়োজন তার অভাবই অনেকের মধ্যে বিজ্ঞানে ভয় সৃষ্টি করেছে। কৌতূহল এবং আনন্দের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ ও শিক্ষার পরিবর্তন বিজ্ঞানকে দূরের জিনিস আর কাব্যকে কাছের জিনিস ভাবার প্রবণতাকে দূর করে দিতে পারে– উভয়েরই মহাকাব্যিক রূপটি স্পষ্ট করতে পারে।

**প্রয়োজন সংযুক্ত সংস্কৃতিরঃ**

১৯৫৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া একটি বক্তৃতায় বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সিপি স্নো সে সময় বৃটেনের 'দুই সংস্কৃতির' উপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। দুই সংস্কৃতি বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন বৃটেনের বিভক্ত সমাজকে একদিকে ধ্রুপদী ভাষা, সাহিত্য, আইন, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি মানবিক বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের সমাজ যারা রাজনীতি, প্রশাসন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি সব কিছুর দায়িত্বে রয়েছে; অন্যদিকে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ইত্যাদি বিজ্ঞান বিষয়ে

শিক্ষাপ্রাপ্তরা যাদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি দায়িত্বগুলো দেয়া আছে। পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি বলতেও ওই সাহিত্য ও মানবিকতা বিষয়ের মানুষদেরকেই মনে করা হতো, বিজ্ঞানের কাউকে নয়। এমনকি নিজেদেরকে পূর্ণাঙ্গ 'শিক্ষিত' বলে প্রমাণ করতেও বিজ্ঞান শিক্ষিতদেরকে সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিতেও পারদর্শিতার প্রমাণ দিতে হতো। কিন্তু উল্‌টোটির প্রয়োজন কখনো হতোনা। বিজ্ঞানে বিন্দুমাত্র কিছু না জেনেও নিজেদেরকে সর্ব পণ্ডিত বিবেচনা করতে কারো কোন অসুবিধা হতোনা। বিজ্ঞানকে 'শিক্ষিত' ও 'মানুষ' হবার জন্য যথেষ্ট মনে না করা, এমনকি প্রয়োজনীয়ও মনে না করা ছিল সেদিনের বৃটেনের জন্য বড় অশনি সংকেত– এমনটিই ছিল স্নোর অভিজ্ঞতা। এর কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্রুত বিশ্বের অগ্রগতির চাবিকাঠিতে পরিণত হচ্ছিলো, এবং বিভক্ত সমাজ নিয়ে তাঁর নিজের দেশের তাতে পিছিয়ে যাওয়া ছিল অনিবার্য।

স্নোর বক্তৃতার বড়সড় প্রতিক্রিয়া তখনই হয়েছিলো। যাঁরা তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করছিলেন তাঁদের মুখ্য একজন ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক এফ আর লীভিস। তিনি বলেছেন বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজনীয়, ওই কাজ যাঁরা করবেন তাঁরাই ওগুলো শিখবেন। বাকি মানুষের জন্য এগুলো অপ্রাসঙ্গিক কারণ মানুষ মাত্রেরই অন্তরাত্মার সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই; যে রকম সম্পর্ক আছে ধরা যাক্, শেক্সপীয়ারের নাটকের। বিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারে কিছু না জানার কারণেই তিনি এত বড় ভুল কথাটি বলতে পেরেছেন। স্নো বিজ্ঞানের সত্যিকার পরিচয়টি দিয়েছিলেন– এটি শুধু কিছু কারিগরি বিষয়ের সমাধান নয়, ওটি মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বিকাশ, পরিণতির বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে তার সঙ্গে আমাদেরকে যুক্ত করেছে, বিশ্ব চরাচরের অন্য সবকিছুর সঙ্গেও। এখন আমরা জানি বিজ্ঞান এত বৃহতের সঙ্গে যে আমাদেরকে যুক্ত করতে পারছে কারণ এর আকাঙ্খা আমাদের ভেতরেই রয়েছে। স্নো এজন্যই সংস্কৃতির বিভাজনের বিলুপ্তি কামনা করেছিলেন। বিজ্ঞানের মর্মকথার প্রতি এমন নির্লিপ্ততা এবং দেশের ভবিষ্যৎ রচনায় তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করার প্রবণতা আমাদেরও রয়েছে, এখনো রয়েছে।

বিজ্ঞান যদি সবার অন্তরাত্মার জিনিস হয় তা হলে সবাই এর শিক্ষার ও চর্চার সুযোগ পাওয়া উচিত। সেজন্য এর আকর্ষণগুলোকে বড় করে দেখতে

হবে, এর দুর্বোধ্যতাকে নয়। আর বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞান ও মানবিক শিক্ষার মধ্যে সংযুক্তিরও ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উভয়েই সমৃদ্ধ হতে পারে। এই সংযুক্ত সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত তরুণ তরুণীরা যে কোন বিষয়ে পারদর্শিতার দিকে যেতে পারবে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ ভাবে। প্রত্যেকটি অনুধাবনের একাধিক মাত্রা থাকে, যে কারণে বৈজ্ঞানিক ঘটনার মধ্যে চাইলেই কাব্যিক বা অন্য নান্দনিক অনুসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়, আর তা খুঁজে পেলে সামগ্রিক অনুধাবনটিই অনেক বাঙময় হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞান মহাকাব্যের যে নানা সংস্করণের কথা বলা হচ্ছে তার কোন কোনটিতে সাহিত্য থেকে, সাধারণ জীবন থেকে, চিত্র থেকে যথাযোগ্য উপমা বিজ্ঞানকে বুঝতে ম্যাজিকের মত কাজ করতে পারে। স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরিচয় অন্যদের দিতে গিয়ে এরকম বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁর সাধারণ তত্ত্বে ভর বা তার সঙ্গে অভিন্ন ত্বরনের উপস্থিতিতে স্থান ও কালে যে ভাঁজ পড়ে অত্যন্ত জটিল গণিতের সাহায্য ছাড়া সেটি বোঝা কঠিন। তাই তিনি বিজ্ঞানমনস্ক সবাইকে এটি বোঝাবার জন্য শিশু বিনোদন কেন্দ্রে টর্নাডো নামের যে চাকতিটি বাচ্চাদের নিয়ে বন বন করে ঘোরে তার উপমা দিয়েছেন, সেটি আমরা দেখেছি। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী মাপলে ও হিসেব করলে চাকতিটির পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত অর্থাৎ পাইয়ের মান যে বদলে যায় সেই মান সমতল কাগজে আঁকা বৃত্তে সম্ভব নয়, একমাত্র ভাঁজ পড়া কাগজে আঁকা বৃত্তে সম্ভব। এভাবে আইনস্টাইন স্কুলের ছাত্রকেও বুঝিয়ে দিতে পারলেন স্থানের মধ্যে ভাঁজ পড়ার অর্থ কী, আর কেনই বা এই ভাঁজ পড়ে। এরই নাম সরস বিজ্ঞান সাহিত্য, যা সবাই উপভোগ করতে পারে, তত্ত্বকে বুঝতে সবার কাজে লাগে, বিজ্ঞানীদের কাছেও।

বিজ্ঞান মহাকাব্য যে সংস্করণেই আসুক এতে সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস বা দর্শনের দিকগুলোকেও স্পষ্ট করলে সেটি শুধু সমৃদ্ধ হয়না, সহজবোধ্য এবং আরো উপভোগ্য হয়। অনেক বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক বিষয় অন্য মূর্তিমান মাত্রার চিত্রের সাহায্যে অদ্ভুত ভাবে দৃশ্যমান হতে পারে, যেমন আমরা ত্রিমাত্রিক বস্তুকে কাগজের দুই মাত্রায় আঁকতে পারি। প্রত্যেকটি আবিষ্কারের বা প্রত্যেকটি তত্ত্বের পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে যেই ইতিহাস একে যথাযথ পশ্চাদপটে স্থাপিত করে আরো স্পষ্ট করে তুলতে পারে। আর দর্শনের যে কাজ সবকিছুকে যুক্তি-বিচার করা, বিজ্ঞানের কাজকেও তা সেই নিরিখে বিচার করে। মনে হতে পারে এটি করে সে বিজ্ঞানের কাজে বাগড়া দিচ্ছে, কিন্তু আসলে

ব্যাপারটি তা নয়। দর্শন বিজ্ঞানের পেছনের বিজ্ঞানকে অর্থাৎ তার পদ্ধতিকে স্পষ্ট করে এর ওপর আস্থা বাড়ায়। যদি তাতে জ্ঞানগত কোন অপূর্ণতা থাকে তাও ধরা পড়ে।

পাঠক-লেখকের কথায় যদি ফিরে আসি বিজ্ঞানের বহুমাত্রিকতা এতে সবার অংশগ্রহণকে আরো সুযোগ করে দেয়। মূল যে বিজ্ঞান তার কোন অন্যথা কোথাও ঘটেনা, যেটি প্রতিষ্ঠিত তাকে অবিকৃত রাখতে হয়। তার সঙ্গে শুধু রঙধনুর নানা রঙের ছটা যোগ করা নানা সংস্করণে রংধনুর নানা রঙের। এর একমাত্র উদ্দেশ্য যথাযথ পাঠকের কাছে তার দ্যোতনা বাড়ানো– পাক্কা বিজ্ঞানীর জন্য একটি, ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি, বিজ্ঞান সাহিত্যে মুগ্ধদের জন্য একটি, স্বেচ্ছাসেবী বিজ্ঞানীদের জন্য অন্যটা। যাঁরা বিজ্ঞানকে দার্শনিকের মত কাটা-ছেরা করে দেখতে চান তাঁদের জন্য একটা। বাল্মিকীর রামায়ণকে নানা সংস্করণে এনে এর আবেদনকে অনেক অনেক বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্তিবাস যখন সহজ বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাংলার ঘরে ঘরে সুর করে আসর জমিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি তাতে বাল্মিকীর রামায়ণকে সংস্কৃত থেকে হুবহু অনুবাদ করেননি, রামায়ণের মর্মকথাকে সাধারণ পাঠকের হৃদয়ের কাছে নিয়ে এসেছেন। মহাকাব্যিক সব গুণ উভয়ের আছে– বাল্মিকীর রামায়ণেও আছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণেও আছে। এমনকি 'ছোটদের রামায়ণে'ও তা এক ভাবে আছে। এর সবই এই বিখ্যাত মহাকাব্যের নানা সংস্করণ। বিজ্ঞানেও এখন তা হচ্ছে বলে এরও মহাকাব্যিক রূপ সবার কাছে পৌঁছে যেতে পারছে।

এ কাব্যের শেষ নেই

**এ দিগন্ত ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছেঃ**

আমরা যত ওপরের দিকে উঠি পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতার কারণে দিগন্ত ততই প্রসারিত হতে দেখি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেন এভাবে হয়ে চলেছে। যখন কোন একটি নতুন বিজ্ঞানের কিছুটা জানছি, তখন তার ওপর ভিত্তি করে আরো কিছু জানার সুযোগ ঘটে যায় বিজ্ঞান চর্চায় আরো উপরে আরোহণের মাধ্যমে। এভাবে উর্ধ্ব গতি চলতেই থাকে, আর প্রত্যেকবার আমাদের বিশ্বজ্ঞানটিও ক্রমে প্রসারিত হতে থাকে। ওই নতুন দিগন্তের সীমানায় অনেক আবছা দৃশ্য আমাদের চোখে আসে যা আগে কখনো মোটেই দেখিনি। সেগুলোর অস্থিত্ব যে

আদৌ আছে তাও আমাদের জানা ছিলনা। ওই আবছা দৃশ্যকে স্পষ্ট দৃশ্যে পরিণত করার জন্য আমাদের আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। স্পষ্ট করতে হলে শুধু ওপরে উঠতে পারাটাই যথেষ্ট নয়, নতুন নতুন কৌশলে নতুন দিগন্তের কাছে গিয়ে সেখানে অনুসন্ধান চালাতে হয় ক্রমে আরো প্রসারিত ক্ষেত্রে। এভাবে বিজ্ঞান মহাকাব্যের পরিধি বাড়ে এবং তার বহুমাত্রিকতাও বাড়ে। এই দুই যখন ক্রমে বাড়তে থাকে তাতে কিন্তু কাহিনী লম্বা হবার ক্লান্তি বা বিরক্তি আসেনা মোটেই, কারণ যতই এটি ঘটবে ততই অদ্ভুত ভাবে এর মর্মকথাটি আরো স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হয়, প্রকৃতিকে আরো ভাল জানা হয়; কাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি তার জটিলতা না বাড়িয়ে বরং কমায়, বিশ্বনিয়মে আরো সুন্দর প্রতিসাম্য আনে যা বিশ্বকে আরো ছিমছাম মনোগ্রাহী করে তোলে। এটিই বিজ্ঞান মহাকাব্যের ওই অদ্ভুত ব্যতিক্রমী ধর্মগুলোর অন্যতম।

অতীতে বিজ্ঞানীদের কাছে এক এক সময় মনে হয়েছে সাম্প্রতিক বড় আবিষ্কার তাদেরকে সবকিছু জানাবার উপায় বাতলিয়ে দিয়েছে, বাকি সব জ্ঞানের চাবি তাঁরা পেয়ে গেছেন এখন শুধু বন্ধ দরজাগুলো ওটি দিয়ে খুলে গেলেই হলো। অর্থাৎ বিজ্ঞানে আর নতুন করে আবিষ্কারের কিছু রইলোনা এই ধারণার জন্ম হলো। তবে প্রত্যেকবারই এই ভুল ভেঙ্গেছে, কখনো ভুল ভাঙ্গতে সময় একটু বেশি লেগেছে, এই যা। এরিস্টোটলের পর সবার কাছে এমন মনে হয়েছিলো, কারণ তিনি সব বিজ্ঞানের শুধু নয় সব বিদ্যারও প্রায় শেষ কথা বলে দিয়েছেন। পাঁচ শ' বছর পর টলেমি তাঁর বিজ্ঞান ব্যাখ্যায়, বিশেষ করে বিশ্বছবির অংশগুলোতে যেখানে এরিস্টোটলের কথার সঙ্গে বাস্তব পর্যবেক্ষণের গরমিল হচ্ছিলো সেগুলোকে নানা গাণিতিক কৌশলে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে গুরুর তত্ত্ব বাস্তব সম্মত মনে হয়। কাজেই এরিস্টোটল-টলেমির বিজ্ঞান আরো দেড় হাজার বছর বিজ্ঞানের 'শেষ কথা' বলে বজায় থেকেছিলো, যার পেছনে অবশ্য খৃষ্ট ধর্মীয় জবরদস্তিও কম কাজ করেনি। শেষ পর্যন্ত কপারনিকাস- কেপলার- গ্যালিলিও-নিউটনের সৃষ্টি বিপ্লবে তার অনেক কিছুই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, সব কিছুকে বৈপ্লবিক ধারণা নিয়ে আবার শুরু করতে হয়েছে, এরপর বিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে গেছে। তখন আর একবার মনে হয়েছে পদার্থবিদ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যায় অন্তত আর কিছু করার নেই, নিউটনীয় বিজ্ঞানের ছাতার তলে থেকে শুধু নতুন নতুন গাণিতিক কৌশলে নতুন সমস্যা নিয়ে কাজ করলেই হবে। কিন্তু দু'শ বছরের মধ্যে সেই নিউটনীয় ছাতা ভুল প্রমাণিত হলো। বিংশ শতাব্দীর দুটি বৈপ্লবিক তত্ত্ব আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম

তত্ত্ব সব ওল্‌টে পাল্‌টে দিলো– পদার্থবিদ্যার ধ্যান-ধারণা আগাগোড়া বদলে গেলো আর তার ওপর ভিত্তি করে অসংখ্য রকমের নতুন আবিষ্কারের জোয়ার এলো।

তেমনি ভাবে অপেক্ষাকৃত সীমিত অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটছে। মহাবিশ্বের বিজ্ঞান, কণিকা তত্ত্ব, বিবর্তন তত্ত্ব, ডিএনএ জেনেটিক্স, ভূতত্ত্বে টেকটোনিক থিওরি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে এটি হয়েছে। এখন অনেকে ভুল করে মনে করেন থিওরি অফ এভরিথিং সফল হলে পদার্থবিদ্যার কাজ শেষ হয়ে যাবে। আসলে এটি হচ্ছে মহাবিশ্বে যে চারটি মৌলিক বলকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে দেখেছি এবং প্রত্যেকটির জন্য আলাদা তত্ত্ব দিয়েছে সেই নিউক্লিয়ার সবল বল, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল, নিউক্লিয়ার দুর্বল বল এবং মহাকর্ষ বলকে একীভূত তত্ত্বের অধীনে আনার চেষ্টা। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ চৌম্বক ও নিউক্লিয়ার দুর্বল বলকে তত্ত্বীয় ও পরীক্ষণ উভয় ক্ষেত্রে একীভূত করে একটি নতুন প্রতিসাম্য আনা গেছে। নিউক্লিয়ার সবল বলকেও তাত্ত্বিক ভাবে এর শামিল করতে পারায় আরো সুন্দর প্রতিসাম্যের সম্ভাবনা দেখা গেছে, যদিও পরীক্ষণে এর প্রতিষ্ঠা এখনো সম্ভব হয়নি। পরীক্ষণে একে দেখাতে গেলে কণিকা ত্বরকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের মত শক্তি সৃষ্টি করতে হবে; ও সময়েই এই তিন বলের এমনি যে প্রতিসাম্য বজায় ছিলো তাকে পুনসৃষ্টি করতে হবে। আর বাকি বলটি মহাকর্ষ বলের ব্যাপারটিতে সুনির্দিষ্ট করে কোন একটি তত্ত্বই দেয়া যায়নি। তবে পদার্থবিদরা আশাবাদী– এই থিওরি অব এভরিথিং শিগ্‌গির প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এভাবে সব বলকে এক প্রতিসাম্যে আনলেই পদার্থবিদ্যা শেষ হয়ে যাবার নয়।

কণিকা তত্ত্বের সুন্দর সার্বিক প্রতিসাম্য নিয়ে এসে যেই 'স্টান্ডার্ড মডেল' তাও ২০১২ সালে হিগ্‌স বোসন আবিষ্কারের মাধ্যমে সব দিক থেকে পাক্কা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে বড় বড় অক্ষরে 'সমাপ্ত' লিখে কণিকা তত্ত্বের ইতি টানবো সে সুযোগ নেই। ইতোমধ্যেই তা নতুন সমস্যা নিয়ে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার কণিকা ত্বরকের শরণাপন্ন হয়েছে যদিও সেই বিশাল শক্তিশালী যন্ত্রটি কিছুটা বিশ্রামে থেকে মেরামত ও উন্নয়ন ইত্যাদির কাজ চল্‌ছিলো। বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রেই 'সমাপ্ত' লেখা সাইনবোর্ড লাগাবার কোন অবকাশ নেই। সেই দিন খুব সম্ভব কখনো আসার নয়। জানার ক্ষেত্রে মানুষের শেষ তৃপ্তি কখনো ঘটবেনা। হয়তো সে তৃপ্তির সুযোগ রাখেনি মানব-মস্তিষ্ক

নিজেই। এই মস্তিষ্কের কাছে প্রকৃতি একটি অসীম ভাবে চলা 'রাশিয়ান পুতুলের' মত, একটি খুললেই তার ভেতর আরেকটি পাওয়া যায়, সেটি খুল্‌লে আর একটি, এমনি করে চল্‌তেই থাকে। মানুষের জানা আর প্রকৃতির আসল স্বরূপ এই দুইটির মধ্যে একটু ফারাক সে সব সময় থেকে যায় সে তো আমরা দেখেছিই। সব সময় আমাদের জানাটি পরবর্তী আসন্ন মানে যেতে থাকি, এই যাওয়া শেষ হয়ে গেলে তো আমরা যেন আমাদের মানব প্রকৃতিটিই হারিয়ে ফেল্‌বো, কাজেই এ মহাকাব্য চলবে, আর আমরা এর লেখক-পাঠকদেরকে সব সময় মুগ্ধ ভাবে ব্যস্ত রাখবে।

## সামনে কী?

সামনের দিনগুলোতে বিজ্ঞান কী রকম জগত সৃষ্টি করবে তা এখন কেউই বলতে পারবেনা। বিজ্ঞানের বিপ্লবগুলো কখনো বলে কয়ে আসেনি। বিজ্ঞানের সাধারণ আবিষ্কারগুলোর অনেকগুলিও হঠাৎ হঠাৎ সৃষ্টি হয় ঘটনাচক্রে অথবা বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কের হঠাৎ ঝড়ে। এর সঙ্গে নতুন যুক্ত হয়েছে আমাদেরকে ভীষণ ভাবে ব্যতিব্যস্ত করে নানা বড় অনিশ্চয়তা। পৃথিবীর ইতিহাসে জীবজগতকে প্রায় অংশে ধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর পারিবেশিক দুর্যোগ এসেছে পাঁচ সাত কোটি বছর পর পর ইতস্তত ভাবে। এর সবই মানুষের ও বিজ্ঞানের যুগ আসার আগেই ঘটেছে– বিজ্ঞানের কিছু করার ছিলনা। মানুষ দৃশ্যপটে আসার পর থেকে সব কিছু বদলে গেছে। এখন মানুষ নিজেই প্রতিনিয়ত পরিবেশ দুর্যোগ ঘটাচ্ছে, এবং বিজ্ঞান তা ঘটাতে তাকে সাহায্য করছে। এটি খুব দুর্ভাগ্যজনক, এর দরকার ছিলনা। একেবারে সাম্প্রতিক কালে এসে সে নিজেই নিজের অস্থিত্বকে এভাবে বিপন্ন করছে সেই সঙ্গে বাকি পৃথিবীরও। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র ধ্বংস (চোখের সামনে সবাই দুটিকেই দেখছে), এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রযুদ্ধের সম্ভাবনা (রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ যাকেও সামনে নিয়ে এসেছে)। যদি এগুলো সম্পর্কে সৃষ্টি হওয়া সচেতনতাগুলো টেকসই হয় তা হলে বিজ্ঞানকে সামনে কী করতে হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের বর্তমান প্রত্যাশাগুলো সামনে বদলাতে পারে। কারণ এগুলো কোন্‌দিকে যাবে আমরা আন্দাজ করতে পারছি বটে, কিন্তু নিশ্চিত করতে পারছিনা। এটি অনেকটাই নির্ভর করবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আচরণের ওপর। এখানে বিজ্ঞান সমাজের ভূমিকা অনেক বড়।

তাছাড়া বিজ্ঞানের স্বাভাবিক অগ্রগতিতেও সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক গুরুত্ব পাবে। কারণ বিজ্ঞান গবেষণা ক্রমে অসম্ভব ব্যয়বহুল হচ্ছে। সরকারী ভাবে এদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে হলে জনসমর্থনটি দরকার হবে। বাণিজ্যিক ভাবে তা পেতে হলেও মানুষের চাহিদার ব্যাপারটি চলে আসবে। সরকার ও বাণিজ্য উভয়েই মানুষকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করবে প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন, চমকপ্রদ জীবনযাত্রার আশ্বাস ইত্যাদির কথা বলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণই ঠিক করবে তাদের চাহিদা। উদাহরণ স্বরূপ থিওরি অফ এভরিথিং নিয়ে কাজ কেমন এগুবে, মহাশূন্যে নতুন আবাস খোঁজার অভিযান কোন্ দিকে যাবে, জিন থেরাপি দিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কতখানি বদলানো হবে, এ ধরনের পদক্ষেপের কোন্‌টি কেমন জনসমর্থন পাবে তা এখনই আঁচ করা মুশ্‌কিল। সেটি নির্ভর করবে মানুষের সামনে তাৎক্ষণিকভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন্ সমস্যা এসে হাজির হয় তার ওপর। অবশ্য এগুলো বাইরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার।

বিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু গতি-প্রকৃতি আছে; সামনে এটি কী করতে চাইবে তার প্রবণতা যা ঠিক করে। এখনকার ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনা অনুসরণ করবে এটিই প্রত্যাশিত। সেভাবে পরবর্তী বিজ্ঞানের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী সবাই নিজ নিজ মত করতেই পারে। বছরের পরে, দশকের পরে বিজ্ঞান সমাজ থেকে এগুলো নিয়মিত ভাবেই করা হয়ে থাকে। যেমন পদার্থবিদ্যায় উৎসাহীরা থিওরি অফ এভরিথিং এর অগ্রগতি দেখতে চান। মহাজাগতিক বিদ্যায় ডার্ক ম্যাটারের রহস্যটি শিগ্‌গির উদ্ভাবিত হবে এমন আশা আছে; মহাবিশ্বের অধিকাংশ ভর যেই রূপে আছে তা এখনো আমাদের কাছে অদৃশ্য, কারণ প্রোটন-নিউট্রন-ইলেকট্রনে তৈরি আমাদের জানা সাধারণ বস্তু এগুলো নয়, অন্য কোন রকম রহস্যময় বস্তু। ভূগর্ভের গভীরে তার উদ্ঘাটনের জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্র পাতা আছে, সেখানে পাতার কারণ হলো যাতে অন্য কণিকা এসে ডার্ক ম্যাটারের কণিকা বলে বিভ্রান্তি না ঘটাতে পারে। ওটি কী ধরনের হতে পারে তা নিয়ে নানা তত্ত্ব আছে– সেগুলোর ভিত্তিতেই উদ্ঘাটক তৈরি। ডার্ক এনার্জির বিষয়েও জানার অনেক বাকি।

প্রথমে ষাট ও সত্তরের দশকে মানুষ যাওয়ার মাধ্যমে এবং পরে অন্যান্য গবেষণা চালিয়ে চাঁদের খোঁজ খবর এক রকম হয়েছে– মাঝখানে দীর্ঘকাল এই সীমান্ত নীরব। মঙ্গল গ্রহে আমাদের পাঠানো রোবট অনুসন্ধানকারীরা বেশ ব্যস্ত

আছে, চাঁদে ও মঙ্গলে বরফের আকারে পানির সন্ধান পাওয়া গেছে। মঙ্গলের থেকে নানা রকম শিলা নিয়ে পরীক্ষাও ওখানে রোবট-ল্যাবে করা হয়েছে; সংগৃহীত শিলাগুলো যান্ত্রিক ভাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসার একটি পরিকল্পনা শিগ্‌গির বাস্তবায়িত হতে পারে। তারপর মঙ্গলে মানুষ পাঠাবার পরিকল্পনাও রয়েছে। সেই যাত্রায় বা তারপরের ঘন ঘন সেখানে আসা যাওয়ার জন্য চাঁদকে যাত্রাগুলোর ষ্টেশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে অনেক সুবিধা– বিশেষ করে পানি সহ স্থানীয়ভাবে চাঁদের সম্পদ ব্যবহার করেই যদি ওখানে থাকা যায় ও যাত্রার আরো রসদ পাওয়া যায়। সেটি করার জন্য চাঁদের বুকে বেশি দিন থেকে অনুসন্ধান সম্পন্ন করা হবে; কয়েকদিন আগে মানুষহীন যান চাঁদের চারিদিকে ঘুরে এসেছে দু'বছরের মধ্যে আবার বেশি সময়ের জন্য চাঁদে নামার রিহার্সেল হিসেবে। সৌর জগতের দূর গ্রহ ও উপগ্রহগুলোর কাছে দূরযান পাঠিয়ে সেগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর দিকেও মনোযোগ দেয়া হবে। মাত্র কয়েক মাস আগে একটি ছোট উল্কা পিণ্ডের গতি মহাশূন্যযানের আঘাতে আমরা ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। এটিও একটি নতুন দিগন্ত হতে পারে।

গত প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে ফিউশন প্রক্রিয়ার নিউক্লিয়ার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা বিজ্ঞানীরা করে এসেছেন। এর মৌলিক সমস্যাটিই থেকে যাচ্ছিলো– প্রক্রিয়াটি শুরু করতেই অনেক শক্তির দরকার, যতটা তার থেকে পাওয়া যাবে তার থেকে বেশি। তা ছাড়া ওই রকম উত্তাপে এর জ্বালানি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসকে কোন কিছুতে ধারণ করা কঠিন হবে। সেই থেকে মাঝে মাঝেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়েছে এমন দাবী এসেছে বিভিন্ন গবেষণা দল থেকে, কিন্তু সাফল্য টেকসই হয়নি। সদ্য এক পরীক্ষণে প্রথম বার খরচ করা শক্তির থেকে পাওয়া শক্তি বেশি হয়েছে বলে জানা গেছে, এতে সর্বত্র উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেছে। একই সঙ্গে দুঃসংবাদটি হলো এই সাফল্য যদি সুদূরপ্রসারী হয় তবুও সত্যি সত্যি এর থেকে বিদ্যুৎ কার্যকর ভাবে তৈরি করতে বর্তমান শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ সময় কেটে যাবে। তবে চেষ্টা যে অব্যাহত থাকবে তা নিসন্দেহ।

যথেষ্ট গতিতে এগিয়ে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা। তার সাম্প্রতিক সাফল্যগুলো চমকে দেয়ার মতো। এবার কোভিডের টিকা উদ্ভাবনে এটি বিজ্ঞানীদের অনেক কাজ নিজে দ্রুত সম্পাদন করে তার সক্ষমতা প্রমাণ

করেছে। বিজ্ঞানের আরো অনেক কাজ যে অত্যন্ত দ্রুত ও সক্ষমতার সঙ্গে করছে। যেমন জীবের সব কাজ চলে যে হাজার হাজার প্রোটিনের মাধ্যমে তার একটি দুটির গঠন উদ্ঘাটন করতে বিজ্ঞানীরা যেখানে গলদঘর্ম হয়েছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতোমধ্যে সব জীবের সব জানা প্রোটিনের গঠন বের করে ফেলেছে– তার সংখ্যা প্রায় দুই লাখের মত। বিজ্ঞান ছাড়াও ব্যবসা বাণিজ্য, উৎপাদন, জীবনযাত্রা সব কিছুর চেহারা যে এটি বদলে দিচ্ছে; বদলে দেবার প্রচণ্ড চাপ রয়েছে বড় বড় কোম্পানীগুলোর পক্ষ থেকে। এ নিয়ে নানা মহলে আনন্দ যেমন আছে আশঙ্কাও কম নেই।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতো বিমূর্ত গাণিতিক তত্ত্ব থেকে এসেছে ভবিষ্যতে কম্পিউটারের সংকট থেকে আমাদেরকে বাঁচানোর কোয়ান্টাম কম্পিউটার। যেহেতু কম্পিউটারের এতদিনকার প্রক্রিয়ার সামনের চাহিদা মিটবেনা, কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মত অভিনব প্রক্রিয়ায় যেতেই হবে, এখন একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় থাকলেও শিগ্‌গির এটিও হয়তো মানুষের হাতে হাতে চলে যাবে। কিছু কিছু জিন থেরাপিতে সম্প্রতি সুফল এসেছে। কত দ্রুত এটি এগুবে তা এখনো বোঝা যাচ্ছেনা, রোগ সৃষ্টিকারী জিনকে সুস্থ জিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেই জিন থেরাপি কাজ করে, কিন্তু এর আয়োজনটি জটিল, অনিশ্চয়তা এখনো বেশি। তবে সবার দৃঢ় বিশ্বাস জিন কারিগরি চিকিৎসাকে বদলাবে, বিশেষ করে প্রত্যেকের নিজস্ব চিকিৎসা তার নিজস্ব জিন-সমগ্র দ্বারাই নির্ধারিত করা যাবে। ব্যাকটেরিয়া পর্যায়ে কৃত্রিম ভাবে তৈরি ডিএনএ জুড়ে এক রকম কৃত্রিম ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টির দুঃসাহসী কাজও কিছু এগিয়েছে, কিন্তু সেটি এখনই কত উৎসাহ পাবে বলা যায়না। মানুষের সব জিনের কাজ ও তার মিউট্যাশনগুলা এখনো সব উদ্ঘাটিত হয়নি, একাজও চলবে।

মনোবিদ্যা এখন বিজ্ঞানের যথেষ্ট আয়ত্বে, মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানা ও মস্তিষ্ক স্ক্যান করে চিন্তার ছবি পাওয়া এর পথে বড় পদক্ষেপ। তারপরও এটি বিজ্ঞানের সামনে এখনো বড় চ্যালেঞ্জ, কঠিন মনোরোগগুলোও তাই। মনোবিদ্যাই হয়তো সামনে বিজ্ঞানে মানুষের সক্ষমতা প্রমাণের সব থেকে বড় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। বিজ্ঞান নিজেও যেই মস্তিষ্কের চিন্তার সৃষ্টি সেই মস্তিষ্কই কী ভাবে সেই চিন্তাকে সৃষ্টি করছে তা জানা যেন নিজেই নিজেকে জানার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব চেষ্টা। এটিই বোধ হয় একদিন হবে বিজ্ঞান মহাকাব্যের সব থেকে চমকপ্রদ অধ্যায়।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরষ্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরষ্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।